২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২১। [১ম সংখ্যা।

"প্রাণো বা অমৃতম্" শ্রুতিঃ

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক

মাসিক পত্র।

"বৈদ্যরাজ"

পণ্ডিত শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ, বাচস্পতি
সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল।

"আর্য্য ভৈষজ্য নিকেতন" ঢাকা।

বিষয় সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲] আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়, পাটুয়াটুলী, ঢাকা, [প্রতি সংখ্যা।০

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বিগত ইং ১৯১৪ সন ১৬ই এপ্রিল হইতে আগামী ৩১শে মে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সমবায় লিমিটেডের যে সকল অংশ বিক্রীত হইয়াছে বা হইবে, তাহার উপর বর্ত্তমান বর্ষের বিতরণ-যোগ্য লভ্যাংশের এক চতুর্থাংশ প্রাপ্য হইবে। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে অংশী শ্রেণীভুক্ত হইবার তালিকা আগামী জুন মাসে বন্ধ থাকিবে; সুতরাং উক্ত মাস মধ্যে অংশের বিক্রয় ও হস্তান্তর কার্য্য বর্ত্তমান বৎসরের নিমিত্তে বন্ধ থাকিবে। আগামী জুন মাসে যে যে অংশ বিক্রয় হইবে তাহা আগামী ১লা জুলাই যে বর্ষারম্ভ হইবে তন্মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু তাহা সম-মূল্যে অর্থাৎ প্রত্যেক অংশ ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যেই বিক্রীত হইবে। ইতি। ইং ১৯১৪ সন, তারিখ ২৫শে এপ্রিল।

সমবায় সৌধ।
করপোরেশনপ্লেস,
ধর্ম্মতলা, কলিকাতা

নিবেদক
শ্রীঅম্বিকাচরণ উকীল,
ধুরন্ধর।

প্রিণ্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার কর্ত্তা

মহর্ষি চরকাচার্য্য। *

* চিত্রের বিশেষ পরিচয় আগামী সংখ্যায় প্রদত্ত হইবে।
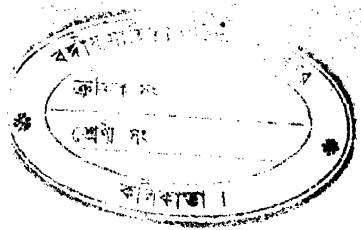
"প্রাণোবা অমৃতম্।" (শ্রুতি)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষ্ বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"
বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২১ { ১ম সংখ্যা।

বঙ্গ ভাষায় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন।*

বঙ্গ ভাষার দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, ইহা এক প্রকার অবিসংবাদিত। নানা স্থানে নানা ভাবে বঙ্গ ভাষার উৎকর্ষের প্রচেষ্টাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গ ভাষার গৌরবের কাহিনী বলিলে আজকাল অনেক বিষয়ই বলিবার আছে, আমরা আজ আর তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করিবনা, বঙ্গ জননীর সুপুত্রগণ তাহার পুণ্যকাহিনী শতকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত করিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন। আজ আমরা আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে বঙ্গভাষার সম্বন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

সকলেই বিদিত আছেন, আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত ভাষারই সম্পত্তি, সংস্কৃতকে ছাড়িয়া আয়ুর্ব্বেদ থাকিতে পারেনা। ডাক্তারী বলিলে যেমন পাশ্চাত্য ইংরেজী চিকিৎসাশাস্ত্র এবং হেকেমী শাস্ত্র বলিলে যেমন পারস্য বা

* কলিকাতা "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে" সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

উর্দ্দু ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝায় তেমনই আয়ুর্ব্বেদ বলিলেও লোকে সংস্কৃত দেবভাষায় লিখিত আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রকেই সহজে বুঝিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষেও আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে, অন্য কোন ভাষায় একখানীও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এমন কথা আজ ও কেহ বলিতে পারেন না। কেহ ২ হয়ত বলিবেন যে, বাঙ্গলায় কবিরাজী পুস্তকের অভাব কি এবং কত লোক তাহা পড়িয়া কবিরাজ হইতেছেন, কথাটা একদিকে কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও আজ আমরা যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে যাইতেছি, বস্তুতঃ সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের অভাব যে যথেষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বর্ত্তমানে অন্য ভাষায় লিখিত যে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ দেখিতে পাই, তৎসমুদয়ই মূলগ্রন্থের অনুবাদ বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অনুবাদিত গ্রন্থের দ্বারা ও দেশের কম উপকার হইয়াছে এমন বলা যায় না। কয়েক জন মাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নাম বাদ দিলে অধিকাংশ চিকিৎসকই যে বঙ্গ ভাষার মাত্র সাহায্য লইয়াই প্রভূত যশঃ ও অর্থ অর্জ্জন করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। ইহাও কম শ্লাঘার কথা নহে। যশঃপ্রতিপত্তির কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মূল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠ করিলে যে জ্ঞান জন্মে, ঠিক তাহার অনুবাদ গ্রন্থ পাঠে সেই জ্ঞান জন্মেনা বা জন্মিতে পারে না, যেহেতু উহা প্রতিমূর্ত্তি—ফটোগ্রাফ অর্থাৎ আলোক চিত্র অথবা তৈলচিত্র মাত্র। উহাতে প্রাণের সঞ্চার হয় না, ফটোর যে আবশ্যকতা, অনুবাদের প্রয়োজনও তদনুরূপ বলিতে হইবে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান যাইতেছে, যেমন শাস্ত্রে আছে "মরুভূরারোগ্য-দেশাণাম্" আরোগ্য প্রদ দেশের মধ্যে মরুভূমি শ্রেষ্ট। এই অনুবাদে আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ আমরা আরোগ্যের জন্য মরুভূমিতে যাইয়া কেহইত অগ্নিকণসম খাদ্য-পানীয় বিহীন উষ্ট্রমাত্রসেব্য বালুকাস্তৃত প্রান্তরে কখনও আবাস বা আশ্রয় লইতে যাই না। যাই কোথায়, না—যেখানে চন্দ্রোজ্জ্বল তুষারে আচ্ছন্ন, যেখানে রক্ত জমিয়া বরফ হওয়ার উপক্রম—সেস্থানে—হিমালয়ে, তিব্বতে, 'দার্জ্জিলিংএ, তবে কি

শাস্ত্রের ঐ কথাটা কেবল প্রলাপোক্তি মাত্র, না—তাহাও নহে। আঁর ও একটি কথা এই, অনেকে হয়ত বলিবেন, ওকথাটার সংস্কৃত বিশদ ব্যাখ্যা হইলেইত বাঙ্গালায় তাহাকে 'তর্জ্জমা' করিয়া লওয়া যায়, কোন গোলই থাকে না, অত কথারই বা দরকার কি? এ কথাটা ও আপাত দৃষ্টিতে অস্বীকার করার অবশ্য উপায় নাই, কিন্তু ইহাও সহজ পন্থা নহে। বস্তুতঃ সংস্কৃতের সংক্ষিপ্ত মূলগুলি পড়িয়া যেটুকু বোধগম্য হয়, তাহারই বাঙ্গালা অনুবাদে সেই জ্ঞান টুকু হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রায়ই ন্যায়-দর্শনাদির অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহারই সাহায্যে কুট বা গূঢ়ার্থ গুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া থাকে। ভূরি ২ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা যায়। তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি প্রকৃত অধ্যাপকের অল্পতা নিবন্ধন উপযুক্ত পঠন পাঠনও হয় না অথচ ইহার উপযুক্ত টীকাও নাই, যাহা দ্বারা বিদ্যার্থী সম্যক্ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, "মরুভূরারোগ্যদেশাণাম্" আরোগ্যকর দেশের মধ্যে মরুভূমি শ্রেষ্ঠ, "কুক্কুটো" বল্যাণাম্ বল জনক দ্রব্যের মধ্যে কুক্কুট প্রশস্ততর। এই যে শাস্ত্রীয় মহাব্যাখ্যান রহিয়াছে ইহার সমাধান কি? কেবল বাঙ্গালা অনুবাদে ইহার মর্ম্ম গৃহীত হয় কি? প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক প্রাণ আছে, সেই প্রাণের ভাষায় ভাব আকর্ষণ না করিতে পারিলে তাহা হৃদয়গ্রাহী স্বার্থসাধক হইতে পারে না। উহাতে মাত্র এই হয়—যেন তৃণগর্ভ মৃদাস্তৃত পুত্তলিকা বিশেষ—পুত্তলিকার যা' প্রয়োজন অনুবাদের প্রয়োজন আমরা তদপেক্ষা অধিক মনে করি না। আমাদের এখন বলিবার বিষয় এই, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে বঙ্গভাষায় এবং অন্যান্য ভাষায় প্রচার করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ভাবে গ্রথিত করিতে হইবে, উহাতে যেন সংস্কৃতের গন্ধ ও না থাকে, উহা যেন বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি হয়। সংস্কৃতের সাহায্য ব্যতীত যে কোন বঙ্গভাষা-ভাষী যেন উহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারে। চরক বা সুশ্রুতের অনুবাদ বাঙ্গালায় আছে, উহাত চরক সুশ্রুতের অনুবাদ, উহাদের কখনও

বাঙ্গালা আয়ুর্ব্বেদ বলা যায় না। সংস্কৃতাভিজ্ঞ চরক অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অসংস্কৃতজ্ঞ বঙ্গভাষাভাষী উহার অনুবাদ পড়িয়া তাহা কখনই পারে না। কেবল বাঙ্গালা বলিয়া নহে, সকল ভাষা সম্বন্ধেই এই যুক্তি সমান। ইংরেজীতে এবং অন্যান্য ভাষায় ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাহা দ্বারা যথেষ্ট কার্য্য হইবে, আশা করা যায় না। অন্যের কথা এখন ছাড়িয়া দেই, সম্প্রতি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধকগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যদি আয়ুর্ব্বেদকে বঙ্গভাষার এক সম্পত্তি করিয়া লইতে আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থন করিয়া বাঙ্গালায় যেটুকু গৃহীত হইতে পারে সেই টুকু মাত্র নিয়া এমন এক আয়ুর্ব্বেদীয় মহাগ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক, যাহা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের সকল জ্ঞান লাভ হইতে পারে, অথচ মূল গ্রন্থের সাহায্য মাত্র লইতে না হয়।

এই গ্রন্থের পরিভাষা, প্রকরণ প্রসঙ্গাদি বাঙ্গালার অনুরূপ সরল ও সুমধুর করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। ইহাতে ন্যায়, দর্শন, সাংখ্য পাতঞ্জলের অপেক্ষা রাখিলে চলিবেনা, ইহাতে মহাভারতের "ব্যাসকুটএর" মত যে, আয়ুর্ব্বেদে আর্ষকুটে কণ্টকিত রহিয়াছে তাহাও অতি নিপুণতার সহিত পরিহার করিতে হইবে, আর প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বিস্তৃত ও বিশদভাবে এবং বাহুল্যগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপ ও সরল করতঃ সকলের—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণও সহজে বুঝিতে পারেন এবং সকল ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া পৃথিবীময় আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ঘোষিত হইতে পারে, এমনটি করিতে হইবে অনেকে হয়ত বলিবেন বাঙ্গালার সাহায্যে সকলেই তবে কবিরাজ হউক, ইহাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, কিন্তু কথা সেরূপ নহে। কবিরাজ বা চিকিৎসক হওয়া কেবল সহজ নহে, যিনি হইতে পারেন হইবেন,—বেশ কথা, তবে এইরূপ করিলে সাধারণ লোকে আয়ুর্ব্বেদ কি জিনিস, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। ইহারই ফলে দেশমধ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার খরবেগে বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমাদের ভরসা। শাস্ত্রকারের ও ইহা অভিপ্রায় যে নিজ শরীর রক্ষা এবং স্বজনগণের রোগোপশমনের নিমিত্ত সকলেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে পারে (১)। (পর পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

কোন কোন আয়ুর্ব্বেদার্ণব নৌ-কর্ণধার ইহাতেও আপত্তি উঠাইতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকে অতি বিনীতভাবে ভরসা দিয়া বলিতে পারি, ইহাদ্বারা আয়ুর্ব্বেদের ইষ্ট ছাড়া অনিষ্টের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আয়ুর্ব্বেদের কেবল অনুবাদের দ্বারা যে অনিষ্টের আশঙ্কা দেখিয়া তাঁহারা আপত্তি উঠাইতে প্রয়াস পাইবেন, এস্থলে তাহার অংশত ও অসার কিংবা অনিষ্টজনক হইবেনা, যদি উপযুক্ত লোক ইহা গঠন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

আয়ুর্ব্বেদ যে শুধু রোগ চিকিৎসার শাস্ত্র নহে, ইহা যে মানবের নিত্য প্রয়োজনীয়—আহার বিহার, আচার, নীতি, স্বাস্থ্য পরমায়ু জ্ঞানের একমাত্র শাস্ত্র তাহাও অনেকেই অবগত আছেন। আমরা এবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবেও কোন ২ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

বঙ্গভাষার সাধকগণের নিকট এই নিবেদন—আঁহারা যে কোন ভাষা হইতে যাহাই গ্রহণ করুন না কেন তাঁহাকেই সাধক রামপ্রসাদের মত 'নকল' জিনিষেও 'আসলের' মত—জড় মৃণ্ময়ীমূর্ত্তিতেও রুধিরের অরুণ ধারায় প্রাণের প্রকাশ প্রণয়ন করিতে হইবে।

বঙ্গভাষাও আয়ুর্ব্বেদের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বঙ্গীয় কবিরাজবৃন্দের দূরে অবস্থান করিলে চলিবেনা। যেখানে যেখানে বঙ্গভাষার চর্চ্চা হইয়া থাকে সেখানেই বঙ্গীয় ভিষগ্‌বর্গের যোগদান এবং যথেষ্ট আয়ুর্ব্বেদগবেষণার ফল প্রদর্শন করিতে হইবে।

এদেশের অনেকেরই বিশ্বাস আছে আয়ুর্ব্বেদটা শুধু বাঙ্গালা দেশেরই সম্পত্তি, বাঙ্গালায়ই ইহার প্রাধান্য, কিন্তু এই ভ্রম অচিরেই দূরীকৃত হইবে। সমগ্র ভারতের নানাস্থান ব্যাপিয়া আয়ুর্ব্বেদের যে নবজাগারণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে নাজানি বঙ্গদেশই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে, যদি তাঁহারা এখনও আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত গবেষণায় নিযুক্ত না হন। বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যত্র কত প্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, সে সংবাদ কয়জন লইয়া থাকেন? হিন্দী

১। সচাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণরাজন্যবৈশ্যৈঃ। সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থকাম প্রতিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ। তত্রচ যদধ্যাত্মবিদাং ধর্ম্মপথস্থানাং ধর্ম্মপ্রকাশানাং বা মাতৃপিতৃভ্রাতৃবন্ধুগুরুজনস্য বা বিকারপ্রশমনে প্রযত্নবান্ ভবতি" ইত্যাদি। চরক সূত্রস্থান ৩০অঃ।

গুজ্‌রাটী প্রভৃতি ভাষায় অন্যান্য দেশে আয়ুর্ব্বেদের যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গালায় আজও আরম্ভ হয় নাই। এদেশীয় প্রাচীন চিকিৎসকগণের গৃহে যে সকল অমুদ্রিত গ্রন্থরাজি বিদ্যমান ছিল অনাদরে সে সমুদয় যেন একবারেই লোপ পাইয়াছে। প্রাচীনদের নিকট আমরা আজও যে সকল গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকি, সেই সমুদয় গ্রন্থের অস্তিত্ব এদেশে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু সেই সমুদয় গ্রন্থরাজির কতক কতক অন্যান্য দেশীয় ভিষক্‌কুলের চেষ্টার ফলেই আজ আমাদের প্রত্যক্ষগোচরে আসিতেছে। এই সকল প্রাচীন নবাবিষ্কৃত গ্রন্থসকল হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যেই বহুল প্রচার হইতেছে। এ সংবাদ এদেশের খুব কম লোকেই রাখেন। বঙ্গভাষায়ও এই সকল গ্রন্থের সারসঙ্কলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীর যেরূপ প্রবল স্রোত বহিতেছে, বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ প্রচারই তাহার অন্যতম কারণ, সংস্কৃত কয়জন লোক বুঝিতে পারে? প্রথম বাঙ্গালাভাষায়ই আয়ুর্ব্বেদকে দেশমধ্যে নবভাবে প্রচার করিয়া দেখাইতে হইবে, আয়ুর্ব্বেদ কি, এবং ইহাই যে সমগ্র চিকিৎসার মুল ক্ষেত্র।

আয়ুর্ব্বেদের প্রতি এক সম্প্রদায়ের আদৌ শ্রদ্ধা নাই, হউক তাহা ঋষি-প্রণীত বা অভ্রান্ত, এক সম্প্রদায় আবার এমন অন্ধভক্তি সম্পন্ন যে, আয়ুর্ব্বেদের নামে তাহারা যা' কিছু পান উদরস্থ করিতে উদ্যত, এই উভয় অবস্থার বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্ত আট কোটী বঙ্গবাসীর নিকট বাঙ্গালায় আয়ুর্ব্বেদকে সেইভাবে উপস্থিত করিতে হইবে, যেন কাহারও আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা না থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় মধ্যেও অনেকের এমন সকল ভ্রান্ত ধারণা, বদ্ধমূল রহিয়া গিয়াছে যে, যাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি তেমন ভক্তি বিশ্বাস শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থাকিতে পারেনা। এই কথাটি আমরা প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ পরিভাষার দু'একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যথা—

১। "মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা বসন্তয়োঃ।
ত্বক্‌কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্॥"

২। "শুষ্কং নবীন দ্রব্যস্তু যোজ্যং সকল কর্ম্মসু।
আর্দ্রঞ্চ দ্বিগুণং বিদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥"

অথবা

"দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে ঘৃত-গুড়-ক্ষৌদ্র-ধান্য-কৃষ্ণাবিড়ঙ্গতঃ।"

৩। "স্ত্রিয়শ্চতুষ্পাদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ।

* * * *

শৃগাল বর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বূকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ॥
কাশীরাজমতেনৈব ছাগমেব নপুংসকম্।
অভাবপ্রতীক্ষাদ্বা বৃদ্ধ বৈদ্যোপদেশতঃ।
বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্র মতং চরেৎ॥"

প্রথমতঃ বলা হইল, বনৌষধি দ্রব্যের প্রত্যঙ্গ গ্রহণ করিবার এই নিয়ম পালিতে হইবে—মূলভাগ শীত অথবা গ্রীষ্মকালে, পত্র সকল বর্ষা বা বসন্ত সময়ে কন্দ, বল্কল এবং ক্ষীর (আঠা) সমূহ শরৎকাল আসিলে এবং পুষ্প ও ফল যে ঋতুতে যাহার উৎপত্তি তৎকালে গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরিভাষা বিধির বিপরীত আচরণ করিলে শাস্ত্র অমান্য করা হইল বলিতে হইবে, কিন্তু এই শাস্ত্র বিধি গুলি কোন কোন স্থলে বড় জটিল। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও বিধি একপক্ষে অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। এই শাস্ত্রের মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা কেবল লোক সমাজে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করি। কার্য্যতঃ কি করা হয়? শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক, উহার স্থূলার্থ বা অনুবাদে অন্য প্রকার অর্থ হইয়া দাঁড়ায়। আজকাল শাস্ত্রের অনুবাদেরই লব্ধপ্রসর দেখা যায়। প্রকৃত শাস্ত্রার্থবাদী বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী যুক্তির আশ্রয় নিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রের অবস্থা অনেক স্থলে বিষম সমস্যাসঙ্কুল দেখিয়া এবং উদ্দেশ্য ও যুক্তি বিচার না করিয়া যাহাঁরা কেবল স্থূলার্থটি গ্রহণে কার্য্যে বিপত্তি ঘটান তাহাঁদের জন্যই ক্ষোভভরে প্রকৃত শাস্ত্রদর্শী বলিয়া গিয়াছেন :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কুর্য্যাৎ কার্য্য নির্ণয়ম্।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্ম (কার্য্য) হানিঃ প্রজায়তে॥"

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রের আদেশ অন্ধ ভাবে পালন করিলে চলিবে না; শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও যুক্তি বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইবে নতুবা অনর্থ ঘটিবে। যাহারা "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য" এই প্রকার শাস্ত্র ধর্ম্মই পালন করেন, যুক্তি বিজ্ঞান মানেন না তাঁহাদের ঔষধ সর্ব্বত্রে পূর্ণগুণ শালী হইতে পারে না; তাহার কারণ সকল উদ্ভিদ্ দ্রব্যের মূল শীত বা গ্রীষ্মকালে, ত্বক্ প্রভৃতি শরৎকালে, পত্র বর্ষা বা বসন্ত কালে গ্রহণ করিলে চলিতে পারে না, যেহেতু দেশ ও উদ্ভিদ্ ভেদে দ্রব্যের পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্বের বহু প্রভেদ ঘটে। শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় এবং বিশুদ্ধ ভৈষজ্য প্রস্তুত-কারীর প্রয়োজন—দ্রব্যসমুদয় পূর্ণবীর্য্য গ্রহণ করা, এই উদ্দেশ্য যথার্থ হইলে দেখা যায়, কোন কোন উদ্ভিদাঙ্গ সেই সেই সময়ে গ্রহণ করিলেও পূর্ণ বীর্য্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। যেমন কোন কোন বৃক্ষের পত্র বসন্তকালে শুষ্ক প্রায় হইয়া পতিত হয় অথবা কোমল কিশলয় মাত্র উদগত হইয়া থাকে। এখন জীর্ণ পত্রকেই গ্রহণ করি অথবা নবীন পল্লবের কবিত্ব মাখা মাধুরী মাত্র লইয়া (ঔষধ) দ্রব্যকে ভাবময় পদার্থ করিয়াই তুলিব ? আমাদের কথা এই প্রোক্ত পরিভাষাকে বাঙ্গালার ঠিক্ ঠিক্ অনুবাদ না করিয়া ইহা বলিলেই হয় যে, পত্রসকল প্রায় বসন্ত বা বর্ষার সময় পরিপুষ্ট ও পূর্ণ বীর্য্য হয় সুতরাং সেই পরিণত পত্র গ্রহণ করাই উচিত কখনও নূতন কোমল পত্র গৃহীত হইবেনা, যেহেতু উহা অল্পবীর্য্য ও অপরিণত। এই নিয়মটি আবার যেসকল পত্র শুষ্ক ও চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদের জন্যই বিশেষ কার্য্যকরী। যেমন তেজপত্র, তালীশ পত্র প্রভৃতি। যে সকল পত্রের রস গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের পরিপুষ্টাঙ্গ অথচ না তরুণ না বৃদ্ধ এমনটিই গ্রহণ করা উচিত। মূল ত্বক্ ক্ষীর কন্দ সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা করা অসঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় পরিভাষাটিতে দেখাযায় শুষ্ক ও নূতন দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। নূতন দ্রব্যের মধ্যে কেবল বাদ পড়িবে ঘৃত, মধু, গুড় ধনিয়া বা ধান্য, পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ। এখন দেখিতে হইবে এই সকল দ্রব্য কোন্ অবস্থায় কিরূপ নূতন বা পুরাণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং আর্দ্রদ্রব্যের গ্রহণ রীতিটিই বা কিরূপ ? এবিষয়েও বহু মতভেদ ও সংশয় লোকের মধ্যে

বদ্ধমূল রহিয়াছে। অনেক ভৈষজ্যবিৎ পণ্ডিতই এই পরিভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। হয়ত গুড় পুরাণ বলিয়া এমন জিনিস ব্যবহার করিবেন, যাহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষেই কোন গুণ বা উপযোগিত্ব থাকেনা। যে সকল দ্রব্য শুষ্ক দেওয়ার প্রয়োজন সেস্থলে সেই দ্রব্য শুষ্ক না পাইলে আর্দ্র লইবে, এরূপ বিধান রহিয়াছে। ধরুন, যেখানে শুণ্ঠি চুর্ণের ব্যবস্থা আছে, সেখানে অভাবে দ্বিগুণ আর্দ্র আদ্রকের (আদার) গুরুত্ব কতটুকু? এখানে এসকল বিষয় দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিয়া যাইতেছি। স্বতন্ত্র ভাবেও আমরা ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত। এখন আর অধিক কথায় প্রবন্ধ বাড়াইব না।

উদ্ধৃত তৃতীয় অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বলা হইয়াছে চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রী এবং পক্ষিজাতির পুংজাতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহার পরেই আছে,—শৃগালী, ময়ূরী এবং ছাগী স্বভাবতঃ বীর্য্যহীনা সুতরাং বিপরীতটি অর্থাৎ পুং গ্রহণ করিবে। বিহঙ্গে পুংশ্রেষ্ঠ বলিবার পরও ময়ূরীকে পুনর্ব্বার বীর্য্যহীনা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে পক্ষিজাতির বিধি-নিষেধাত্মক পরিভাষাটির প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইল। কার্য্যতঃও কেহই কিন্তু আহার বা ঔষধার্থে পক্ষীর স্ত্রী পুংবিচার করেনা। আর একটি কথা এই, বর্ত্তমানকালে যে সকল জীবজন্তু ঔষধার্থে প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে চতুষ্পদের একমাত্র ছাগ বা নপুংসক এবং পক্ষীজাতির হংস, ময়ুর, ধনেষ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র। চতুষ্পদের শৃগাল বা শৃগালীর ব্যবহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

"স্ত্রিয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ" হইলেও ছাগী বীর্য্যহীনা বলিয়া পরিত্যাজ্য। চতুষ্পদের পুংজাতিরও প্রতিষেধ সুতরাং ছাগ দেওয়া চলেনা, এখন উপায় কি? কাশীরাজ মহাশয় নপুংসকের ব্যবস্থা করিয়া সমস্যা দূর করিয়াছেন, এখন তাহাই প্রচলিত আছে। নপুংসকের আবার স্ত্রী পুং ভেদের সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। নপুংসকের অভাব হইলে বৃদ্ধ বৈদ্যের উপদেশ মত বন্ধ্যা ছাগীও লওয়ার বিধান দেখাযায়, কিন্তু ইহার ব্যবহার নাই। জীবজন্তুর বধ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কোন বিধান করেন নাই। লোকে কিন্তু নানা প্রবাদ বাক্য বলিয়া থাকে। সেদিন এবিষয়ে জনৈক ভিষগ্‌বন্ধুর সহিত এরূপ আলাপ

হইয়াছিল, ভিষগ্‌বর বলিয়াছিলেন, নপুংসকটা মাটিতে পুতিয়া মাড়াই সঙ্গত নতুবা তেমন গুণ হয় না। বলিলাম, সাধারণতঃ বলিদ্বারা বধ করাই কত মুষ্কিল আবার মাটিতে পুতিয়া, উহার গুরুত্বইবা কতটুকু? এই ত সেদিন চর্ব্বির লোভ দেখাইয়া বলিদেওয়ার লোকই অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তিনি বলেন চর্ব্বির প্রয়োজন নাই কি বলেন? বলিলাম, আপনারা চর্ব্বিগুলি কি করেন? উঃ—কেন উহাও মাংসাদির সহিত ক্বাথ করিয়া লওয়া হয়, পরিভাষায়ত চর্ম্ম রোম খুরাদিমাত্র বাদ দিতে বলিয়াছে। প্রঃ—বেশ তবে 'ভুরি' গুলিও লওয়া যায়? উঃ—যায় বটে তবে ব্যবহার নাই বলিয়াই ব্যবহার করিনা ইত্যাদি।

শাস্ত্রে বসন্তরোগ প্রতিষেধের জন্য হস্তে 'শিবাস্থি' বন্ধনের ব্যবস্থা আছে, এই শিবাস্থি কি শৃগালের অস্থি না হরিতকীর অস্থি আহা নির্ণয় করিতে অনেকেই, 'শিবনেত্র' হইয়া পড়েন। কেহ সন্দেহ বশে নিয়মটি শ্রদ্ধা করেন না, কেহ কেহ হরিতকীর অস্থি (আঠি) বন্ধন করিতে উপদেশ দেন। এইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় বহুবিষয়েই অনেকে যথেচ্ছভাবে চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল মূলের অনুবাদ ধরিয়া, অশাস্ত্রজ্ঞ অনেকেই শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া এবং শ্লোকমাত্রকেই শাস্ত্র মানিয়া সময় সময় বিপদ উপস্থিত করিয়া থাকে, ইহার ফলেই রোগীর প্রতি 'গো-খুর' এবং 'কণ্টক-অরির' ব্যবস্থার কথা শুনা যায়। অন্ততঃ এই অভাব দূরী করণের নিমিত্ত অচিরে এই সকলের বাঙ্গালায় সদ্‌ব্যাখ্যা বাহির হওয়া প্রয়োজন। শুধু এই সকল বিশৃঙ্খলার রহস্য ভেদ না করিতে পারিয়া অনেকেই শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়াও ফলতঃ শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে, তাই আয়ুর্ব্বেদের এই অধোগতি উপস্থিত হইয়াছে। যদিও আয়ুর্ব্বেদের ২।১ টা গৌরবের কথা তুলিয়া আমরা "বাহাদুরী" লইয়া থাকি কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের যে অতি শোচনীয় অবস্থা তাহা আমরা বুঝিয়া ও যেন বুঝিতেছিনা। আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উৎপত্তি হইলেও উহা এখন সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিবিধভাষায় হোমিওপ্যাথির গ্রন্থ প্রচার করিয়া লোকদিগকে বুঝিবার সুযোগ দেওয়াই তাহার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে। আজকাল বঙ্গদেশের প্রতিপল্লীতে এমনকি প্রতি ঘরে ঘরে যে

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আদর দেখা যায় এবং সামান্য লিখাপড়া জানা স্ত্রীলোকও যাহার সাহায্যে নিজ নিজ পরিবারে সহজ সাধ্য রোগ দূরীকরণে সক্ষম হইতেছেন, ইহাও কি বাঙ্গালায় হোমিওপ্যাথির উৎকৃষ্ট ২ গ্রন্থ প্রচারের ফল নহে? সকলেই জানেন এমন এক সময়ছিল যখন কবিরাজী সহজ চিকিৎসা দ্বারা পুরমহিলাগণও বিনা অর্থে অনেক রোগ দূর করিতে পারিতেন। আজকাল প্রতিবৎসর এক একটি পরিবারের কত অর্থ কেবল চিকিৎসার জন্যই ব্যয় হইতেছে।

আর একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই অদ্যকার প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। সেই বিষয়টি হয়েছে আয়ুর্ব্বেদের নিদান শিক্ষা। কি বাঙ্গালা 'নবীশ' কি দেবভাষাভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়িছাত্রগণ—বহুদিন ব্যাপিয়া তাহাদের এই নিদানের নিসর্গ-দুর্ব্বোধতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও তাহারা কার্য্যতঃ রোগ পরিচয়কালে যে সার্থকতা করে তাহা অনেকে বিদিত আছেন, ভবিষ্যতে যাহাঁরা বিশিষ্টরূপে রোগনির্ণয়ে সক্ষমও হইয়া থাকেন, তাহাঁদের যে অনেকে কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বহুদর্শিতারফলেই তাহা করিয়া থাকেন তাহাও নিশ্চিত। অনেক সময় দেখা যায় রোগীর রোগ নির্ণয় হউক আর নাই হউক সেদিকে লক্ষ্য নাই, শাস্ত্রের তুমুল যুদ্ধ চিকিৎসকদের মধ্যে বাধিয়া বসে। শাস্ত্রের জটিলতাই কি ইহার একটি কারণ নহে?

আয়ুর্ব্বেদীয় নিদানার্থে রোগের হেতু, পূর্ব্বলক্ষণ, ব্যক্ত লক্ষণ, উপশম, অভিবৃদ্ধি, রোগসংগঠন ('সম্প্রাপ্তি' অর্থাৎ দেহে কিভাবে হেতুর সাহায্যে রোগের উৎপত্তি ও প্রসর হয়) এবং অসাধ্য ও সাধ্য বা সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। ইহাই রোগ পরিচয়ের সর্ব্বস্ব উপাদান। এই নিদান গ্রন্থের উপযোগিতা যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে যে একটু অভিনবত্ব আছে, অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে সেটুকু প্রায় দেখা যায় না। সে যাহাই হউক, বক্তব্য বিষয় এই যে, রোগের হেতু ও লক্ষণগুলি বড় অস্পষ্ট ও অসমগ্র-গ্রথিত, ইহা আমরা বসন্তরোগের নিদানও লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কতকটা প্রদর্শন করিয়াছি (১)। শেষ কথা

(১) আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ প্রথমবর্ষ ফাল্গুন সংখ্যা "আয়ুর্ব্বেদে বসন্ত রোগের কথা" দ্রষ্টব্য।

এই:—রোগের হেতু-পরিচয়ের বিস্তৃতিই প্রথম আলোচ্য হওয়া উচিত। এই বিষয়টিতে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতিপত্তি শীঘ্রই অনেক বাড়িয়া উঠিবে। ইহার সাহায্যে সামান্য লিখাপড়া জানা লোক ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মর্ম্ম বুঝিবে,শুধু তাহাই নহে সাধারণে রোগের হেতুও লক্ষণাদি সহজে বুঝিতে পারিলে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইয়া স্বাস্থ্য পালনে সমর্থ হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ইহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে, ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অন্ধভক্তি ও ঔদাসীন্য অনেকটা কমিয়া আসিবে, তাহাও কম লাভের বিষয় নহে।

আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণ গৌরবে প্রতিভাত হউক, লোক সকল অকালমৃত্যু, অস্বাস্থ্য ও আধি-ব্যাধি বিরহিত হইয়া চির উৎসবময় জীবন অতিবাহিত করুক, বিশ্বেশ্বর বৈদ্যনাথের নিকট ইহাই আমাদের কামনা।

দেশীয় পথ্য।

পথ শব্দ ষ্য পথ্য। পথ শব্দের সাধারণ অর্থ উপায়। অতএব শরীর রক্ষণার্থে যে কোন প্রকারের আহার বা পানীয় ব্যবহার করা হয় তাহাই পথ্য সংজ্ঞার অন্তর্গত। কিন্তু সচরাচর চিকিৎসকগণ রুগ্নব্যক্তির রোগমুক্তি কল্পনায় যে সকল হিতকর দ্রব্যাদি যোজনা করেন, তাহাকেই পথ্য বলা হয়। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ রোগমুক্তি বিষয়ে সুপথ্যকে ঔষধাদি অপেক্ষাও অধিকতর উপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা:—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥ (চরকসংহিতা।)

কেবল সুপথ্যাশী হইয়া ঔষধের সাহায্য ভিন্নও রোগমুক্ত হইতে পারা যায়। কিন্তু সুপথ্যাশী না হইলে শত সহস্র ঔষধ প্রয়োগেও রোগারোগ্য অসম্ভব।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য জীবনীশক্তিবর্দ্ধক লঘুপাক বিদেশী মাংসরস, দুগ্ধ এবং দুগ্ধের সমান গুণবিশিষ্ট অন্যান্য পথ্যের অভাব নাই। এতদ্ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় সাগু বার্লি প্রভৃতি বিলাতী পথ্যই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পথ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ কি উপায় অবলম্বন করিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রাচীন পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত

পথ্যাদি, প্রচলিত সাগু বার্লি প্রভৃতি পথ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ, হীন কি উৎকৃষ্ট তৎসম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জ্বর, সকল রোগাপেক্ষা অধিকতর প্রাণক্ষয়কারী এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য। প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং নিধনকালে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ জ্বরের উৎপত্তির হেতু চিকিৎসা ও পথ্যাদি সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিয়াছেন। তরুণ জ্বরে যে পর্য্যন্ত জ্বরের উত্তাপাধিক্য, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, বিবমিষা, বমি, শরীর ও হৃদয়ের গুরুতা, মাথাধরা তন্দ্রা, আলস্য, নিদ্রাধিক্য, উদরে অপাক ও ক্ষুধার অভাব বর্ত্তমান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত জ্বরের গুরুত্ব বিবেচনায় দুই হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য। এই উপবাস শব্দে একেবারে পথ্য না করা বুঝাইবে না। অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহারই এই উপবাস শব্দের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা :—

প্রাণাঃ বিরোধিনা চৈব লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥
এতচ্চ লঙ্ঘনং কার্য্যং যথা ন তদ্ বলং।নঃ।

অর্থাৎ এইরূপভাবে উপবাস করিবে যাহাতে শরীরের বলহানি না হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বরিত ব্যক্তির অবস্থা বিবচনায় এই লঘুপথ্যের, বিলেপী, মণ্ড, যূষ প্রভৃতি কতিপয় প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত তরুণ জ্বরের সকল অবস্থাতেই বিলেপী, মণ্ড ও যূষ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে তরুণ জ্বরের আদি অবস্থায় বিলেপী প্রাথমিক পথ্য।

১। বিলেপী - যবের চাউল, মুগ কিংবা মসূর ডাইল—ইহাদের যে কোনও একটি দ্রব্য গ্রহণ করতঃ তাহার চতুর্গুণ জলসহ মাটির হাঁড়িতে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিয়া জলের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া জলীয় ভাগ গ্রহণ করিলেই বিলেপী প্রস্তুত হয়। যেমন যব ৫ তোলা ও জল ২০ তোলা একত্র সিদ্ধ করতঃ ৫ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলেই যবের বিলেপী প্রস্তুত হয়; এই বিলেপী পথ্যে যবাদির সারভাগ অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে গৃহীত হয়। কাযেই জ্বরিত ব্যক্তির প্রবল উদরাময় প্রভৃতির উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে যে অবস্থায় অন্য কোনরূপ পথ্য জীর্ণ হওয়ার সম্ভব থাকে না; তদবস্থায় অথবা বালক বৃদ্ধ ও পথ্য-

সেবনে একান্ত বীতস্পৃহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী পথ্য। এখন সকলেই মনে মনে চিন্তা করিতে পারেন যে, দীর্ঘকালোৎপন্ন যব প্রভৃতি দ্রব্যের শ্বেতসার—যাহা বার্লি প্রভৃতি রূপে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে তাহা, আর পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত যব প্রভৃতি স্থূল দ্রব্য হইতে কেবল জল ও অগ্নির সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে গৃহীত সারভাগ, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি লঘুপাক ও অধিকতর হিতকারী হইবে।

মণ্ড প্রস্তুত পদ্ধতি—যবের চাউল, খৈ, মুগ ও মসূরের ডাইল প্রভৃতির মধ্যে কোনও একটি গ্রহণ করতঃ তাহার চৌদ্দগুণ জলের সহিত জ্বাল দিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, পরে তাহা চটকাইয়া দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করতঃ ছাকিলেই গাঢ় মণ্ড প্রস্তুত হয়। পথ্যাদি প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদাই মাটির হাঁড়ি অথবা কালাই করা 'এনামেলের' পাত্রে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে* খৈ বা যবমণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীর প্রবৃত্তি অনুসারে মিশ্রি, লেবুর রস অথবা শুধুই লবণ ও লেবুর রস সংযোগে সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এই মণ্ড দাহ, পিপাসা ও বমন নিবারক এবং রোগীর জীবনীশক্তি রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপযোগী। মসূর, মুগ প্রভৃতির যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে এই নিয়মেই প্রস্তুত করিতে হয়। কেবল যূষ প্রস্তুত কালে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ দেওয়া আবশ্যক এবং ডাইলের দুর্গন্ধ অপনোদন জন্য আদা ও তেজপাতার সম্ভার দিতে পারা যায়।

মুগ ও মসূররে যূষের প্রতি আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। যে অবস্থায় রোগীর দুগ্ধ সেবন প্রয়োজন অথচ উপসর্গাদির হিসাবে দুগ্ধ সহ্য হওয়ার ভরসা করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে মুগ কিংবা মসূরের যূষ ব্যবহার করিবে। বর্ত্তমান যুগে খইর মণ্ডকে রোগীর পথ্য শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয় না, অনেকেই খৈর মণ্ডকে বিরেচক ও আমকারক বলিয়া মনে করেন। এমন কি, অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি খৈকে ময়দা ও আটার রুটি অপেক্ষা গুরুপাক মনে করিয়া রাত্রিতে দুধ খৈ ব্যবহার না করিয়া দুধ রুটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই

* দেশীয় পথ্য দেশীয় পাত্রে জ্বাল দিলেই ভাল হয়।

অন্ধবিশ্বাসের কোনও অনুকূল যুক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে বিজ্ঞানানুমোদিত স্বীকার করিলে খৈ ও খৈর মণ্ডকে লঘু ও সুপথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যথা—যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহু লাজামিতি মনীষিণঃ॥　　(ভাবপ্রকাশ)

যে ধান হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত হয় সেই সতুষ ধান্য ভাজিয়া ফুটাইয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে খৈ কহে।

লাজাঃ স্যুঃ মধুরা শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমলমূত্ররুক্ষা বল্যা পিত্ত কফচ্ছিদঃ॥
ছর্দ্দ্যতিসার দাহশ্চ মেহ মেদস্তৃষাপহা॥　　(ভাবপ্রকাশ)

শাস্ত্রীয় প্রমাণে পাওয়া গেল খৈ মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, অল্প মলমূত্রকারী; বমি, অতিসার, দাহ, পিপাসা, মেহ, মেদ ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশক।

এক্ষণে যাহাঁরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন, তাহাঁরা খৈ অথবা খৈর মণ্ডের প্রস্তুত পদ্ধতি চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, খৈ রুটি ও বিস্কুট হইতে অনেক লঘু; এবং খৈর মণ্ড বর্ত্তমান প্রচলিত সাগু বালি হইতে অনেকাংশে হিতকারী ও লঘুপাক পথ্য। যব অপেক্ষাও হৈমন্তিক ধান্য শীঘ্রপাকী। বৎসরাতীত হৈমন্তিক ধান্য অধিকতর লঘু। সেই বর্ষাতীত হৈমন্তিক ধান্যের এক মুষ্টি ধান্য ভাজিলে আয়তনে চারিমুষ্টি খৈ হয়। সেই খৈ চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিলে গম চূর্ণ (ময়দা) অপেক্ষা কতদূর লঘু হইল একটু চিন্তা করিলেই তাহা সহজে সকলেরই বোধগম্য হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিন বিহারী সেনগুপ্ত।

পল্লীচিকিৎসক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে,—সুরেন বাবু বৃক্ষছায়ায় হরিদা'র অপেক্ষায় পথ চাহিয়া আছেন, এমন সময় হরিনাথ দপ্তর হস্তে উপস্থিত হইলেন।

উপবেশনান্তর ২।১টি একথা সেকথার পর হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরেন বাবু, আজ কোন্ অধ্যায় আরম্ভ করিব ?"

সুরেন—যাহা তোমার অভিরুচি।

হরি—আজ মুখরোগ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যাই।

সু—আচ্ছা।

হরি—ঠোঁট ফাটা সম্বন্ধে পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়াছি, আবারও উহা বলি। রাত্রে শুইবার সময় বা'হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা নাভিতে ও গুহ্যদ্বারে তিনবার করিয়া সরিষার তৈল লাগাইয়া ঘুমাইবে; ইহাতে নিশ্চয়ই ঠোঁট ফাটা আরোগ্য হইবে।

শীতকালেই সাধারণতঃ ঠোঁট ফাটে। শিশিরের জলে, চলিত যাহাকে 'ওষ' বলে—মুখ ভিজাইলেও কিছুদিনে সারিয়া যায়; কেহ কেহ মাখন ও মাখিয়া থাকেন।

জিহ্বা ফাটিয়াও খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে শীত কালে মানুষের বড়ই কষ্ট উৎপাদন করে। আমরা উহাকে 'ফাকা' রোগ বলি।

সু—ওঃ, 'ফাকার' কষ্টের কথা মনে করিলেও ভয় হয়। এক এক জন খেতে বসে কি কান্নাটাই কাঁদে! ঝাল দ্রব্যের ত কথাই নাই; শুষ্ক দ্রব্য আহার করিতেও কষ্ট হয়।

হ—হরগৌরি সংক্রান্তির দিন, অথবা শনি কিম্বা মঙ্গল বারে, গাছের নীচে মাটীতে দাড়াইয়া, হাতে না ধরিয়া বৃক্ষস্থ একটী আম্র, বাকল ও আঠি প্রভৃতি সহ যত দূর পারা যায়, চিবাইয়া খাইলে আর ভবিষ্যতে 'ফাকা' রোগ হয় না। অন্ততঃ সম্বৎসর ভাল থাকা যায়।

একমুঠা সিদ্ধ চাউল ভালরূপ চর্ব্বন করিবে, যেমন ক্ষত স্থানে বেশ করিয়া লাগে—পরে এমন স্থানে ফেলিবে যেন কাকে উহা খায়।

কাকে খাইলেই ফাকা' সারিয়া যাইবে। ইহা অতীব প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। ইহারই নাম 'চাউলপড়া'। কেহ কেহ শনিবার কি মঙ্গলবার এইরূপ করিতে বলেন।

সু—কাকে যদি না খায়?

হ—খাবে না কেন? কাক ডকিলেই আসে। একজন হয়ত কা—কা—করিয়া ডাকিবেন, আর দেখিবেন কাক অমনি আসিবে; তখন কাকের সাক্ষাতে ঐ অবশিষ্ট চিবান 'ছাকা' টা থুথাইয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিলে কাক প্রায়ই উহা খাইয়া থাকে।

সু—'ফাকা' ব্যতীতও জিহ্বায় ক্ষত হয়, তাহাতে কি করা কর্ত্তব্য?

হ—সোহাগার খৈ ও মধু একত্রে মাড়িয়া ক্ষতস্থানে দিলেই আরোগ্য হয়।

সু—এই যে পান খাইতে অধিকচূণে, অথবা ছেলেপেলে অজ্ঞতা প্রযুক্ত চূণ খাইলে, মুখ পুড়িয়া যায়, তাহার প্রতিকারের কোনও পন্থা আছে কি?

হ—আছে; চূণ ভক্ষণ জনিত জিহ্বা বা মুখ পুড়িলে কতকটুকু চিনি মুখে ধারণ করিলেই, সারিয়া যায়।

তৈল অথবা কাঁজিদ্বারা কুল্লি করিলে চূণ-জনিত মুখ গহ্বরস্থ দগ্ধরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সু—সর্ষপ তৈলের বাতিতেও দেখেছি জানি কি করে?

হ—হাঁ—বাতির তৈলের কিছু উপরে মুখ রাখিয়া ক্রমান্বয়ে ঘন ঘন হাই তুলিতে (মুখে শ্বাস টানিতে) থাকে: ইহাতেও জ্বালার কথঞ্চিৎ শান্তি হয়।

শেফালি গাছের মূল চর্ব্বণ করিলে গলার মধ্যস্থ ক্ষত আরোগ্য হয়।

সু—আচ্ছা, ঠাকুদ্দা, দাঁত কড়্ মড়ির কোনও ঔষধ জান কি?

হ—হাঁ, দাদা,এ যে অফুড়ন্ত গোলা। ঘুমন্ত অবস্থায় যে দাঁত কিড়্মিড়্ করে, তাইত?

সু—হাঁ।

হ—কালবর্ণের ঘোড়ার লেজের সাত গাছা কেশ লইয়া তদ্দারা বেণী প্রস্তুত করিয়া গলায় দিলে উক্ত রোগ সারিয়া যায়।

কাকড়ার একখানি পা, গাভীর দুগ্ধসহ পাক করিয়া, দুধ ঘন হইলে, শয়নের পূর্ব্বে উহাদ্বারা পদদ্বয় লেপন করিলে দন্ত শব্দ দূর হয়।

সু—দাঁতের পোকার ঔষধ কি?

হ—সিজের শিকড়, ক্ষিরাইর মূল অথবা বড় পানার শিকর চিবাইয়া দন্ত সংলগ্ন করিয়া রাখিলে দাঁতের ক্রিমি পড়িয়া বা মরিয়া যাইয়া রোগ দূরীভূত হয়।

বটের আঠা দাঁতে দিলেও উক্ত রোগ সারে। বিচে কলার শিকড় অথবা কালি কেশুচ্চার শিকড় দাঁতে দিলে দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়।

রসূন আগুনে গরম করিয়া লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

সু—পোকায় কাটিলে, দাঁতের গোড়ায় নালী হইয়া যায়। তাহার ২।১টা ঔষধ বল না।

হ—তেঁতুল পাতা ও লবণ একত্রে বাটিয়া নালীতে লাগাইলে বা একত্রে উক্ত দ্রব্যদ্বয় চিবাইলে, দন্ত নালী আরোগ্য হয়।

রসূন, হিং ও আকন্দের আঠা একত্রে মিশাইয়া দাঁতের নালীতে পূরিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায় ও রোগ দূরীকৃত হয়।

সু—সান্নিকের যাতনাও বড়ই অসহ্য হইয়া থাকে; উহার ঔষধ কি বল?

হ—সান্নিকে মাঢ়ি ফোলে, দাঁত নড়ে, মুখে ঘা হয় ও অসহ্য যাতনা দেয়। ঠাণ্ডা জলটুকু পান করিতে পর্য্যন্ত দাঁত শির্ শির্ করিয়া উঠে ও রোগীকে প্রাণান্তকর কষ্ট দেয়।

সু—মাঢ়ি ফুলিলে কি করিতে হয়?

হ—কুমীরালতার কচি ডগা, সৈন্ধবলবণ সহ দাঁতের মাড়িতে টিপিয়া ধরিলে ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়।

এরণ্ডের কষ সৈন্ধবলবণ সহ মাঢ়িতে টিপিয়া ধরিলেও সারে।

সু—অসময়ে দন্তমূল শিথিল হইলে তাহার রক্ষার উপায় কি?

হ—কুমীরা পোকার বাসার মাটী দ্বারা দাঁত মাজিলে সান্নিকাদি দূর হইয়া দাঁতের গোড়া শক্ত হয়।

কাকড়ার গর্ত্তের উপরে তোলা মাটী দ্বারা দাঁত মাজিলেও সান্নিকের হাত হইতে মুক্ত থাকা যায়।

হিজলের মূল, বকুলছাল অথবা পিপুলমুল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে দাঁত পড়া নিবারিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

আচার্য্য গঙ্গাধরের জীবনী।

উপক্রমণিকা।

ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া হিতাহিত বিচারশক্তি লোপ প্রাপ্ত হইলে, যখন মানবের অসংযত চিত্তবৃত্তিতে ধর্ম্ম-গ্লানিকর নাস্তিকতা আসিয়া উপস্থিত হয়, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান তখন মানবদেহে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মপ্রাণতা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিতায় ভগবান যে প্রাতঃস্মরনায় আচার্য্য গঙ্গাধর-রূপে শাস্ত্রসংস্কার-জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কথায় কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। গঙ্গাধরকে কেবল "ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বসুর প্রধান সাধক ও সেবক" বা "কবিরাজচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায়" এবং "পণ্ডিত প্রবর" বিশেষণে বিশেষিত করিলে তাহাঁর প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন যেন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গঙ্গাধরকে নিরুপাধি করিয়া কেবলমাত্র "গঙ্গাধর" বা "আচার্য্য গঙ্গাধর" বলিলে বোধ হয় তাহাঁর সমস্ত প্রভাবই স্বীকৃত হইয়া যায়।

যেমন শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে বৈদিকধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছিল, গঙ্গাধরের অভ্যুদয় তেমনি, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, উপনিষদ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহকে দোষশূন্য করিয়া শিক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। গঙ্গাধর অম্বষ্ঠব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যে প্রতিভা বলে শাস্ত্রসংস্কার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাঁর গৌরবাখ্যানে সার্ব্বজাতিক অধিকার একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে জাতীয় মতদ্বৈধ কেবল সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক মাত্র। হইতে পারে কেহ কেহ দুই একখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সংস্কারকল্পে টীকা প্রণয়ন দ্বারা স্বজাতীয়গুরুত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গাধর সর্ব্বশাস্ত্রমন্থন করিয়া যে সকল অমৃতময় গ্রন্থরত্নে শিক্ষা ও ধর্ম্মপথ উজ্জ্বল ও সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন বাস্তবিকই উহা অতুলনীয়, তজ্জন্য তাহাঁর সার্ব্বজনিক সমাদর লাভ নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

বহুকাল গত হইল মুর্শিদাবাদের 'সৎসঙ্গ' নামক মাসিক পত্রে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, তাহাঁকে "ভারতের শেষ ঋষি" বলিয়া যে আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উহাই তাহাঁর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও তাহাঁর অনুরূপ বিশেষণ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র-ভাণ্ডারের বহু আবর্জ্জনা, তাহাঁর প্রতিভারূপ সম্মার্জ্জনী প্রভাবে নির্ম্মলীকৃত হইয়া যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার আবিষ্কার করিয়াছে, তদ্দ্বারা অননুভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবসম্পদ হৃদ্দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বিদ্বৎকুলের কি আনন্দ লহরীই না সৃষ্টি করিবে! যাহাঁদের জ্ঞানপিপাসা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনন্তের পথে ধাবমান, তাহাঁরা সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ী, নিত্যানন্দময়, গঙ্গাধরের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইলে, অচিরে এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় পথের সন্ধান লাভ করিয়া, জ্ঞানের চরমোৎকর্ষলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন। বাস্তবিক বলিতে কি গঙ্গাধর আমাদের পুণ্যশ্লোক বশিষ্ঠ ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের ন্যায় পুণ্যপথ অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান-মহিমার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে উহাতে ঈশ্বরের প্রেরণা শক্তির আরোপ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষতঃ একাধারে আর্ত্তের জীবনবন্ধু, ধার্ম্মিকের পথ প্রদর্শক, শিষ্যমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ গুরু, জ্ঞানের পূর্ণাবতার, স্বজাতির আশ্রয়গুরু, সংযমের দৃষ্টান্তস্থল আচার্য্য গঙ্গাধর তাৎকালিক কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই সমভাবে হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

এই মহাপুরুষের চরিতাখ্যান মাদৃশ ক্ষুদ্রবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জীবনী-লেখকের মসীলেখনীদ্বারা কতদূর অক্ষুণ্ণমহিমময় হইবে বলিতে পারি না, কারণ কূপমণ্ডূকের বিশাল জগতের কল্পনা যেমন তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর, আমার পক্ষে আচার্য্য গঙ্গাধরের জীবনী লিখিবার প্রয়াস ও তদপেক্ষা ন্যূনতর বলিয়া মনে হয় না।

প্রায় ২৮ বৎসর গত হইতে চলিল গঙ্গাধর স্বীয়কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহাঁর প্রিয়শিষ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন মহোদয় তাহাঁর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত করিয়া কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য জীবনীর উপাদান

রক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি "আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা"র ১৩১৯ শালের ফাল্গুন ও চৈত্রী পূর্ণিমা (৯ম ও ১০ম) সংখ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ আচার্য্য মহাশয় "গঙ্গাধর কবিরত্নের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েক পৃষ্ঠা প্রকাশ করিয়া শেষে ক্রমশঃ বসাইয়া আজ বৎসরাবধি নিচিন্ত হইয়া আছেন। যদিও এই দুইটী প্রবন্ধের উপাদান আমার অবশ্য অবলম্বনীয়। তথাপি গঙ্গাধরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি যদি কোন প্রত্যক্ষদর্শী দ্বারা বিবৃত হয়, তাহাও এই জীবনীর কলেবরবৃদ্ধিপক্ষে বিশিষ্ট উপদানরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। অপি চ আমার আশাও আত্মতুষ্টির একমাত্র সম্বল আচার্য্যগঙ্গাধরের পুস্তকাবলীর সাহায্যে যদি কোনরূপ উপাদান সংগৃহীত হয় তাহাও আমার কৃতকর্ম্মের সৌভাগ্যরূপে গ্রন্থের গুরুত্ববর্দ্ধনে নিয়োজিত হইবে। কারণ তদ্ভিন্ন তাহাঁর এমন কোন বর্ষাণুক্রমিক জীবনবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে না, যাহা দ্বারা তাহাঁর স্বরূপ জ্ঞান লাভ হইতে পারে।

আচার্য্য গঙ্গাধর জীবদ্দশায় যে সমস্ত ক্ষুদ্র পুস্তকাবলীর প্রচার দ্বারা তাৎকালিক পণ্ডিত, বিচারার্থী এবং অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমূহের দোষ খণ্ডন করিয়া স্বীয়মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, তথাপি যে গুলি প্রাপ্তব্য তাহার আংশিকমর্ম্ম সাধারণে প্রকাশ জন্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা নিতান্ত দোষাবহ হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি।

অনুসন্ধান করিলে গঙ্গাধরের শিষ্যগণকে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। প্রত্যুত বর্ত্তমানে তাহাঁর শিষ্যসংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িলেও শিষ্যানুশিষ্য প্রমুখাৎ তাহাঁদের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া একান্ত অসম্ভব নহে। শিষ্যগণ সকলেই গঙ্গাধরের মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসুক, কিন্তু তজ্জন্য কৃতশ্রম কেহই লেখনী পরিচালনার গুরুভার বহনে স্বীকৃত নহেন। বলিবার সময় গঙ্গাধরের পুণ্যশ্লোকতা সকলের মুখে সহস্র উৎসের সৃষ্টি করে, কিন্তু লিপিবদ্ধ করিতে অনেকেই নিতান্ত সময় হীন হইয়া পড়েন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভের বলবতী ইচ্ছার বশীভূত হইয়া স্বয়ং এই গুরুভার বহনে মনঃস্থির করিয়াছি। কারণ গঙ্গাধর যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দেশ ধন্য,

যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে কুল ধন্য। আশাকরি গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয়গণ আমার এই অকিঞ্চিৎকর লেখনী পরিচালনার দ্বারা দুর্দ্দমনীয় বাসনার চরিতার্থতা লাভ বিষয়ে মনোযোগ দান করিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াও তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে উদাসীনতা প্রযুক্ত জাতীয়তার গৌরব ক্ষুন্ন করিতেছি। কতদিনে যে আমরা জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইব, গুণের ও গুণীর আদর করিতে শিখিব ভবিতব্যতাই বলিতে সক্ষম।

অসহ্যপ্রতিভ গঙ্গাধরকে কেহ কেহ দুর্ম্মুখ বলিয়া নিন্দা করিয়া স্বীয় জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লোলুপ হইয়া থাকেন। বাস্তবিকতা রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার ন্যায় সত্যসন্ধীর পক্ষে এরূপ দুর্নাম নিতান্তই ভ্রমাত্মক বলিয়া উপেক্ষনীয়। কারণ অসত্য প্রিয়বাক্য যেমন সর্ব্বথা অনাদরনীয়, বিচারস্থলে মিথ্যাজুগুপ্সিত বাক্যের প্রতি গঙ্গাধরের কটূক্তি প্রয়োগ ও তদ্রূপ গ্রহণযোগ্য নহে। বিশেষতঃ একদেশদর্শিতা বিচারস্থলে পরস্পরের অন্ধতা সৃষ্টি করে। তখন উভয় পক্ষের রসনা-কণ্ডূয়ন একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া সংযমশূন্য বহু অবান্তর বাক্যের অবতারণা করে; সুতরাং উহা তখন দুর্ম্মুখতারূপ বিশেষণে বিশেষিত হয়। সত্য রক্ষা করিতে হইলেই বহু মিথ্যার সংঘর্ষে জয়ী হইতে হয়। গঙ্গাধর ও সেই জন্য অনেকের নিকট অনেক প্রকারের অনর্থক বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত কবিরাজ অন্নদা প্রসাদ আচার্য্য মহাশয় তাঁহার জীবনী লিখিতে যে রাজীব বাবুর পণ্ডিত সভায় কোন পণ্ডিতের কর্ণ মর্দ্দনের উপক্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীর মতে উহার সারমর্ম্ম এই যে—বিচারের পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল যে পরাজিত ঐরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। গঙ্গাধর পরাজিতের প্রতি মাত্র প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেলেন—"কেমন এখন কাণ মলিতে পারি?" ইত্যাদি। অন্নদা কবিরাজ মহাশয় অতিরঞ্জিত শ্রুতবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কি জন্য গঙ্গাধরের এই ঘৃণিত দোষের (?) কথা তাঁহার লিখিত জীবনী মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন

জানি না। বোধ হয় স্বজাতীয় গুরুত্ব তাঁহার এই অন্ধ বশ্বাসে প্রশ্রয় দান করিয়া থকিবে।

গঙ্গাধরের মুখ্য ছাত্রগণ মধ্যে অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের স্থান কিরূপ গণ্য ছিল, তাহা তাঁহার এই লেখনী পরিচালনেই উপলব্ধি হইতে পারে। গঙ্গাধরের এই 'ঘৃণিত দোষের' কথা তাঁহার মুখ্য ছাত্রগণ মধ্যে কেহই অবগত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। তবে এমন অনেক ছাত্র ছিল বা আছে যাহাঁরা গঙ্গাধরের বাটীতে গমনাগমন করিয়াই ছাত্রমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাধর তাহাঁদিগকে পাঠ দিতেন না, মুখ্য ছাত্রগণ পাঠ গ্রহণানন্তর গৌণদিগকে বলিয়াদিতেন। নামে তাহাঁরাও গঙ্গাধরের ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছেন।

অন্নদা কবিরাজ মহাশয় গঙ্গাধরের জীবনী লিখিবার উপাদান কিরূপে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাঁর এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করা উচিত ছিল যে—তিনি কাহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ জীবনী লেখা যে কি দয়িত্বপূর্ণ, কি গুরুতর কার্য্য, তাহা তাহাঁর পূর্ব্বে স্মরণ করা উচিত ছিল। এখনও যখন তাহাঁর বংশ বিদ্যমান, তখন অন্ততঃ গঙ্গাধরের আত্মীয় কুটুম্ব বা পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম ও তাহাঁদের প্রকৃত বাসস্থান নির্দ্দেশ যে তাহাঁর প্রথম কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তাহাঁর আদৌ দৃষ্টি নাই। এসকল বিষয়ে তিনি একরূপ অন্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি তিনি সহসা গঙ্গাধরের জীবনী লিখিতে কেন অগ্রসর হইলেন জানি না। ইহাপেক্ষা তাহাঁর অদূর-দর্শিতার পরিচয় আর কি হইতে পারে।

প্রথমতঃ অন্নদা কবিরাজ মহাশয় গঙ্গাধরের জন্ম শকাব্দা ও শালের সমতা রক্ষা করিতে কিরূপ গণনবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বস্তুতই উল্লেখ যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—"১২০৫ সালের (১৭২৩ শকাব্দা) ২৫ আষাঢ়..................গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।" ১২০৫ শাল কি ১৭২৩ শকাব্দা ? লেখনী ধারণের কি কোন সার্থকতাই নাই ? প্রথমেই এই ভ্রম তাহাঁর ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত বটে !

আর একস্থানে লিখিয়াছেন "গঙ্গাধর যশোহর জিলার অন্তর্গত মাগুড়া মহকুমার বাটোহার গ্রাম নিবাসী ৺গোবিন্দচন্দ্র সেনের দিগম্বরী নাম্নী

কন্যাকে বিবাহ করতঃ…………।” উহা যে নিতান্ত ভ্রম তাহা তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া কেমন করিয়া জানিবেন? অবশ্য দিগম্বরী দেবী যে গঙ্গাধরের পত্নী তাহা অবিসংবাদিত হইলেও “বাটাহার গ্রাম” এবং “৺গোবিন্দচন্দ্র সেন” একেবারে প্রমাদযুক্ত। উহা বাটাযোড় গ্রাম এবং ৺প্রেমনারায়ণ দাশের পৌত্র বা গঙ্গাধরের শ্যালক পুত্র শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্র দাশ মহাশয় এখনও দড়ি মাগুড়ায় বাস করিতেছেন। অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের আরও একটী বিদ্যার পরিচয় এই যে তিনি গঙ্গাধরের ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়ক্রম কালে তাহাঁর স্ত্রী বিয়োগ কল্পনা করিয়া তাহার অব্দ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন ‘১২৫৭’ শাল। কিন্তু গঙ্গাধরের জন্মের অব্দ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন “১২০৫ সনের ২৫শে আষাঢ়”। পাঠক মহোদয়গণ এই বৈষম্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া তাহাঁর লিখিত গঙ্গাধরের ঘৃণিত দোষের বিষয় বিচার করিবেন। এইরূপ প্রলাপোক্তিতে পাণ্ডিত্যাভিমানী কেহ কোনরূপ শাসন বাক্যে হতমান হইলে তাহাতেই কি বক্তা ‘ঘৃণিতদোষ’ বা ‘দুর্ম্মুখ’ ইত্যাদিরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইবে?

গঙ্গাধরের গ্রন্থাবলীর পরিচয় বা নামসমূহ প্রকাশ করিতে, উপক্রমণিকার কলেবর বহু বিস্তার লাভ করিবে, তজ্জন্য উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে তাহাঁর ৮৪ খানি গ্রন্থ হস্তগত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বহু গ্রন্থের অস্তিত্ব তাহাঁর গ্রন্থাবলীর অঙ্কে অসম্পূর্ণাবস্থায় বিরাজিত আছে। ধৈর্য্যশীল পাঠকমহোদয়গণ ক্রমশঃ সেগুলির পরিচয় পাইবেন।

গঙ্গাধরের বংশশ্রুতিতে লিখিত আছে, তাহাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺কামদেব রায় নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ভূষণা প্রদেশের কর আদায় কর্ম্মে তাহাঁকে যশোহর জিলার অন্তর্গত মাগুড়ায় ছাউনী করিয়া বহুদিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। অধিক দিন অবস্থিতি হেতু তথায় অবস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করার কালে ঐ স্থানই তাহাঁর উত্তর পুরুষগণের নিবাসভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কামদেব রায়ের বাসস্থান সেনহাটীর চন্দন মহলে ছিল। উক্ত বংশশ্রুতিতে লিখিত আছে যে—গঙ্গাধরের পূর্ব্ব পুরুষের অজ্ঞাত নামা কেহ বৈদ্যের

সমাজপতি ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাহাঁর সমাজ-পতিত্ব হরণ করিয়া স্বয়ং সমাজপতি হইয়াছিলেন। সেই অজ্ঞাত নামা পুরুষ হইতে গঙ্গাধরের পিতামহ ধনীরাম পর্য্যন্ত সেনহাটীর চন্দন মহলে বাস করিয়াছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষতা নিবন্ধন কামদেব রায় মাগুড়ায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেও মধ্যে মধ্যে তাহাঁকে মুর্শিদাবাদে যাইতে হইত। মুর্শিদাবাদের পরপারে ডাহাপাড়া নামক স্থানে নবাবসরকারের প্রদত্ত তাহাঁর বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট ছিল। অন্তিমকালে কামদেব রায় ডাহাপাড়ার বাসায় সপরিবারে অবস্থান করিয়া ভাগিরথীর পুণ্যসলিলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহাঁর একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ রায়ের শৈশবা-বস্থা নিবন্ধন, স্বামীশোক কাতরা তাহাঁর স্ত্রী শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে মাগুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালে সীতারামের উপদ্রব প্রবল হওয়ায় (যে সীতারামী সুখ লোকে বলিয়া থাকে) কিছুদিন পরে তাহাঁকে অগত্যা মাগুড়া পরিত্যাগ করিয়া চন্দনমহলে যাইয়া বাস করিতে হইয়াছিল। পরে রামকৃষ্ণের পুত্র ধনীরাম, চন্দনমহলের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মাগুড়ার বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সেই অবধি চন্দন মহলের বাস উঠিয়া মাগুড়ায় স্থায়ী বাসস্থান স্থাপিত হইল।

মাগুড়ায় গঙ্গাধরের সহিত গোলোক শিকদার নামক একব্যক্তির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উক্ত গোলোক শিকদারের সহিত তত্রস্থ প্রাণ নাথ মল্লিকের বিশেষ শত্রুতা ছিল। গোলোকশিকদার তত্রত্য নীলকুঠীতে কর্ম্ম করিতেন। একদিন রাত্রিকালে কর্ম্মান্তে গোলোকশিকদার বাড়ীতে আসিতেছিলেন, সেই সময় প্রাণনাথ মল্লিক পথিমধ্যে তাহাঁর প্রাণ নষ্ট করে, এবং গঙ্গাধরের সহিত গোলোক শিকদারের বন্ধুত্ব নিবন্ধন প্রাণনাথ মল্লিক গঙ্গাধরকে এই বলিয়া শাসন করে যে "তোমাকেও একদিন খুন করিব"। গঙ্গাধরের সেই সময় মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতাও পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়া ছিলেন। গঙ্গাধর এই শাসন বাক্যে ভীত হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধান্তে মাগুড়ার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি গঙ্গাধরের তাদৃশ ঐকান্তিকতা না থাকিলেও তদ্বিষয় একেবারে 'নিরক্ষর' ছিলেন না বা ঔদাসীন্য দেখাইতেন না। তৎকালে মুর্শিদাবাদে জ্যোতির্ব্বিদ বহু পণ্ডিতের সমাগম ছিল। দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর দাতৃত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের, সর্ব্বশাস্ত্রের পণ্ডিত-মণ্ডলী তথায় নিত্য গমনাগমন করিতেন। এক সময়ে কাশী নিবাসী কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ তাহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর তাহাঁর সহিত আলাপপূর্ব্বক কয়েকটী জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে জ্যোতিৰ্ব্বিদ্প্রবর তাহা সুচিন্তিতভাবে গঙ্গাধরকে উপদেশ করেন এবং শেষে বলেন যে "বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া বহুজ্যোতির্ব্বিদের সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ কথা কাহারও মুখে ত শুনিই নাই, এমন কি আমিও এরূপ জিজ্ঞাসা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই"। ইহাতে গঙ্গাধরের জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাব কতদূর প্রবল ছিল উহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। তাহার স্বহস্ত লিখিত জন্ম কুণ্ডলী কীটদষ্টাবস্থায় যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭২০।২।২৪।৬।৫০ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরাষাঢ়স্য পঞ্চ-বিংশতি দিবসে (শু)ক্রবারে কৃষ্ণ-পক্ষীয়াষ্টম্যাং তিথৌ দিবা। ৬। ৫০ (ষট্ দ)ণ্ড পঞ্চাশৎপল গতে শুভ সিংহলগ্নে (শ্রীগঙ্গাধরর) াযস্যজ ( ) স্যয়ং পত্রিকা।

( ) ৬	৭	১	৭
( ) ২৭	২৪	৪৯	২৭
( ) ১৮	৪৬	১৫	৪৪
( ) ২৫	৩৬	৪	২৬

পরাহেঃ—

শু ৪ বৃ।৪ রবু শ	বৃ ৩	চ২ ৭ ২২৪
লং		কে ১৭

নক্ষত্রমানং ৬৫। ৪৩ ভুক্তদং ২৮। ৭ ভোগ্যদং ৩৭.৩৬ ভুক্ত শুক্রের দশা ৭,৫।২৮।৪ ( ) ভোগ্য-দশা ১৩। ৬। ১। ১০।৫৮

রবের্দশা	৬।০
চন্দ্রস্যদশা	১৫।
কুজস্যদশা	৮।
বুধস্য	১৭।
শনেঃ	১০
৬৯। ৬। ১। ১। ৪৮	

পত্র খানির যে যে অংশ কীটদষ্ট হইয়াছে তাহা ( ) বন্ধনী মধ্যে নিজমন্তব্য সহ প্রকটিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা উহা মনোনীত করিয়া লইবেন।

গঙ্গাধরের বংশাবলীর পরিচয় তাঁহার স্বকৃত শিখণ্ডীপ্রাদুর্ভাব নাম্নী আখ্যায়িকা কাব্যে কর্ত্তৃবংশ প্রশংসাক্রমে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইতেছে।

"ইহ খল্বাসীদ্বৈদ্যকুলোৎপন্নো রঘুদেবরায়ো বিশদ-গুণকীর্ত্তির্ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ইব, স্বধর্ম্মনিরতো মহর্ষিরিব, সুশীলঃ প্রহ্লাদ ইব, দধীচিরিব দাতা, দিবোদাশ ইব দয়াবান্, রাঘব রাম ইব ধীরোদাত্তঃ। স্বদারনিরতো বশিষ্ঠ ইব বাগ্মী বাচস্পতিরিব। তস্য চ পুত্রাস্ত্রয়ো বভূবুঃ। কামদেবো বামদেবঃ কৃষ্ণরামশ্চ যো লৌকিক ভাষয়া কানুরাম ইতি প্রখ্যাতঃ। তত্র কামদেব ইব কামদেবো রায়ঃ কীর্ত্তিমান্ ভূষণাখ্য প্রদেশাধিপতেঃ করাদানাদিষধ্যক্ষঃ। সোঽপি পিতৃবদ্ধর্ম্মাত্মা স্বধর্ম্মনিরতোঽনুশীলো দাতা দয়াবান্ ধীরোদাত্তঃ স্বদার নিরতো বাগ্মী চ। তস্য চৈক এব পুত্রোঽজায়ত রামকৃষ্ণ রায়ঃ। স চাল্পবয়াঃ পুত্রমেকং ধনিরামরায়ং জনয়িত্বা দিবং যযৌ দেহং মুক্ত্বা। স চ বালো বাল্যে পিতৃহীনোঽপি দৈববলেন স্বপ্রভাবাদ্বহূন্ পরিবারান্ ভৃত্যান্ ভৃত্বা দুহিতরমেকামগ্রে জনয়িত্বা কৃষ্ণপ্রিয়েতি নামধেয়ং তস্যাশ্চকার। তদনুচৈকং পুত্রং জনয়িত্বা ভবানীপ্রসাদ ইতি নামধেয়মস্য বিদধৌ। ততঃ স্বকীর্ত্তিং প্রকাশ্য দিবং দেহং বিমুচ্য জগাম। তস্যাসাবাত্মজঃ স্বগুণ বলেন ভৃত্যান্ পোষয়ন্ প্রাগেকং পুত্রং জনয়ামাস। স চ পুত্রঃ ষষ্ঠদিনমাসাদ্য দেহং বিহায় দিবং যযৌ। ততশ্চ পুত্রমেকং জনয়ামাস। তস্য চ নামধেয়ং গঙ্গাধর ইতি প্রখ্যাতং বিদধে গুপ্তং চ মৃত্যুঞ্জয় ইতি। ততো দ্বে দুহিতরৌ যমকতয়াঽজীজনৎ। তয়োঃ পূর্ব্বজায়াদুহিতুর্নামধেয়ং ভগবতীতি ততোঽনুজায়াঃ পার্ব্বতীত্যকার্ষীৎ। অথৈকমপি পুত্রমজীজনৎ। তস্য নামধেয়ং হরচন্দ্র ইত্যকার্ষীদথাপরং পুত্রমজীজনত্তস্য নামধেয়মীশ্বর-চন্দ্র ইত্যকার্ষীৎ। ত্রয়শ্চৈতে পুত্রাঃ সুশীলাঃ কালানুরূপধর্ম্মশীলা বিদ্যাবন্তশ্চ সাধুশীলাঃ। দ্বে চ দুহিতরৌ গুণবত্যৌ সাধুশীলে প্রিয়ংবদে। তত্র ভারতীব ভগবতী পার্ব্বতীব পার্ব্বতী। সর্ব্বকনিষ্ঠশ্চেশ্বরচন্দ্রোঽপীশ্বরস্য চন্দ্র ইব হরচন্দ্রশ্চ হরস্য চন্দ্র ইব। গঙ্গাধরো জ্যায়ান্ সর্ব্বেষু শ্রেয়ান্। য এনামাখ্যায়িকাং বিরচয়িতুমুপক্রমমাণঃ·············প্রণমতি চ স্বাভীষ্টদেবতাং তামিতি।"

সাধারণের সুখবোধার্থ বংশলতা প্রদত্ত হইল।
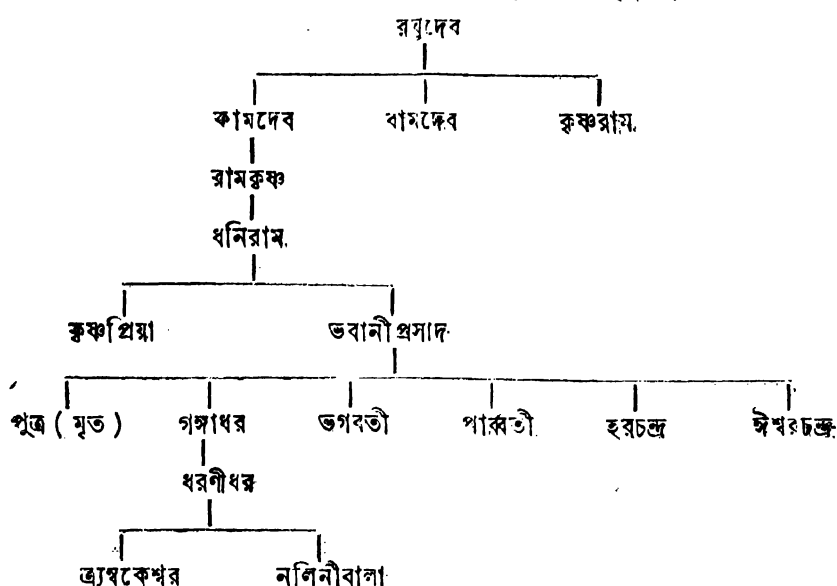
কর্তৃবংশ প্রশংসায় গঙ্গাধর পর্য্যন্ত উল্লিখিত নামের পরবর্ত্তী পুরুষের নাম গুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে সন্নিবিষ্ট হইল। বর্ত্তমানে ত্র্যম্বকেশ্বর এই বংশের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

আমি গঙ্গাধরের একমাত্র পৌত্র, বংশের প্রদীপ। আমার প্রতি তাহাঁর যে স্নেহ, যে প্রীতি ছিল তাহার শতাংশের একাংশও যদি এই জীবনী প্রকাশে তাহাঁর এই হতভাগ্য কুল ধূমকেতু পৌত্র প্রতিদান করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য তাহাঁরই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া এই গুরুতর অসীম সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাঠক মহোদয়গণ সহৃদয়তা গুণে এই নির্গুণ বিদ্যাসম্পদ্‌পরিশূন্য গঙ্গাধরের বংশঘোষকের প্রতি ক্ষমাবান্ হইয়া আচার্য্য গঙ্গাধরের স্বরূপ অবগত হইলে নিতান্ত অনুগৃহীত হইব।

আমার পিতামহ বলিয়া আচার্য্য গঙ্গাধরকে আমি যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাহাতে চ্যুতধৈর্য্য পাঠক মহোদয়গণের অনেকেই কুঞ্চিত কটাক্ষে হাস্যাস্পদের বিষয়ীভূত করিয়া, আমার উপর নির্লজ্জতার বহু কারণের আরোপ করিবেন, কিন্তু তাহাঁদের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা যেন আমি চিরদিন তাহাঁদের নিকট উপেক্ষিত নির্য্যাতিত হইয়াও পরম করুণাময় জগদীশ্বরের শ্রীপদে স্থিরমতি হইয়া গঙ্গাধরের পুস্তকাবলী প্রচার পূর্ব্বক তাহাঁর মহিমা ঘোষণা করিতে করিতে কালসাগরে বিলীন হই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি গঙ্গাধরের পৌত্র এবং আমিই তাঁহার জীবনী প্রকাশে কৃতপ্রযত্ন বিধায় সাধারণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই উপক্রমণিকার অনেক স্থলে আমি স্বীয় নাম ব্যবহার এবং আত্ম পরিচয় দান করিয়া কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎত্রুটী ক্ষমা করিয়া বাধিত করিবেন। আরও একটী বিশেষ প্রার্থনা এই সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এই জীবনী পাঠে কথঞ্চিৎ আত্ম চরিতার্থতা লাভ করিলে আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ আশাতীত সফলতা লাভে সমর্থ হইবে। অলমতিপল্লবিতেন। *

কলিকাতা।
১১০ আপার সার্কুলার রোড।
১৩২১। শুভ নববর্ষ।

শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়।

বৈদ্যক গ্রন্থ বিবরণী।

১। বৈদ্যকরহস্য।

বিদ্যাপতি এইগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পিতার নাম বংশীধর। ইনি গৌড়বর্য্য (গৌড়দেশের রাজা ?) ছানতি (?) রায়ের আদেশে ১৭৩৮ সংবতের পৌষমাসের শুক্লদ্বিতীয়া তিথিতে এই বৈদ্যরহস্য গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতির গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক যোগসমূহই প্রকটিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের গুরু বা অভীষ্টদেব "অর্জ্জুন ঈশ্বর", সর্ব্বারম্ভে বিদ্যাপতি তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বৈদ্যরহস্যে জ্বর প্রভৃতি সকল রোগের চিকিৎসাবিধি উপনিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, ভাবমিশ্র, লোলিম্বরাজ ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা গ্রন্থোক্ত একটি যোগ এস্থলে সমুদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সাবুন শুষ্ক টঙ্ক ২, কাচায়া সিন্দূর টঙ্ক ১, কলীচূণা টঙ্ক ১২, তদৌষধত্রয়ং ঘৃষ্যাঙ্গুল্যা যাবন্নখকাপিশ্যং ভবতি তাবন্মর্দ্দয়েৎ। ততো রূক্ষেষু কচেষু গাঢ়মঙ্গুল্যা ঘর্ষণপূর্ব্বং লিম্পেৎ। ঘটিকার্দ্ধিংস্থাপয়িত্বা তৈলামলকাভ্যাং স্নায়াৎ। শণসদৃশকেশোঽপি ভ্রমরসদৃশো ভবতি। ইতি শাঙ্করী কৃতিঃ।

* আগামী সংখ্যায় গঙ্গাধরের জীবনী এবং প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইবে। সঃ।

যাহাঁরা পলিতকচের বিনিময়ে ভ্রমর কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ লাভ করিতে সমুৎসুক, তাহাঁরা গ্রন্থকারের এই প্রয়োগটি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

আমরা এই ঔষধটিতে দেখিতে পাইতেছি, গ্রন্থকারের সময়ে "সাবুন" (সাবান) ব্যবহৃত হইত।

গ্রন্থকার একস্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ;—

"ফিরঙ্গ দেশজং রোগং দুস্তরঞ্চ ব্যাপোহতি।"

ইহাতে অবগত হইতে পারা যায়, বিদ্যাপতির সময়ে "ফিরঙ্গ" রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাবই সংঘটিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমথুরামোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি।

প্রাপ্তিস্বীকার ও গ্রন্থ পরিচয়।

"প্রত্যক্ষ শারীরম" (প্রথমভাগ) "বৈদ্যাবতংস" কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, এম এ, এল-এম-এস বিরচিত। কলিকাতা ৬৫নং বিডনষ্ট্রীট "বিশ্বনাথ নিকেতন" হইতে তদীয় শিষ্য পণ্ডিত শ্রীনাথুরাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা এই পুস্তকখানা সাদরোপহার প্রাপ্ত হইয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছি। সুষুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ জগতের যে পূর্ব্বাহ্নকাল উপস্থিত এই গ্রন্থখানা তাহারই সূচনা করিয়াদিতেছে, ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বিবিধ শাস্ত্রপারাবার পারদৃশ-প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ মনীষী গণনাথ প্রত্যক্ষ শারীর নামক এই পুস্তকখানা রচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর তথা আয়ুর্ব্বেদ জিজ্ঞাসুর যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা যিনি এই পুস্তকখানা একবার পাঠ করিবেন তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই শারীর বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই রীতিটী এদেশে আয়ুর্ব্বেদের দিক্‌দিয়া একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। শারীর বিদ্যার প্রতি অনাদরের ফলে শারীর শাস্ত্রের ও প্রভূত অবনতি ঘটিয়াছে, ইহা কম ক্ষোভের বিষয় নহে। সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি গ্রন্থে শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা রহিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা বর্ত্তমান কালে বহুত্রই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত এবং স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্তাদি দোষ-বিজৃম্ভিত। শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীনকালে যে বিশদ আলোচনার পন্থা ছিল এবং পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত এতদ্দেশীয় শারীরতত্ত্বই যে নানাভাবে

অন্য দেশে গিয়া উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বহুকাল শবচ্ছেদ প্রথা রহিত, রাষ্ট্রবিপ্লব, গ্রন্থকর্ত্তৃগণের তাদৃশ মনোযোগের অভাব এবং প্রক্ষিপ্তাদি নানাকারণেই শারীর শাস্ত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল। শারীর বিজ্ঞানের যে কত উন্নতি হইতে পারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দিন দিনই তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি যে এই শারীর বিদ্যার উৎকর্ষের ফলেই হইয়াছে তাহাও অবধারিত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ও অবাধ উন্নতি করিতে হইলে ও এই শারীর বিদ্যার দিকদিয়াই করিতে হইবে। কবিরাজ গণনাথ এই পুস্তকখানা রচনা করিয়া বস্তুতই এক আশার আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন। গণনাথের বিশেষ পরিচয় আমাদের না দিলেও হইবে। এই পুস্তকের বিশদ আলোচনায় ও আমাদের স্থান নাই। সংক্ষেপে পুস্তকখানার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

প্রত্যক্ষ শারীর তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডমাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, পুস্তকের ভাষা যে আগাগোড়া সংস্কৃত তাহা বলাই বাহুল্য। অক্ষর দেবনাগর, মুদ্রণ পরিপাটি এবং কাগজ 'মলাট' প্রভৃতি ও উত্তম। আকার রয়েল অষ্টাংশিত, উপোদঘাত সহ প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৫৲ টাকা সাধারণ পুস্তকের তুলনায় মূল্য কিছু বেশী বোধ হইতে পারে কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বে ব্যয়ের তুলনায় এই মূল্য কিছু মাত্র অধিক বলা যায় না। উৎকৃষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল্য সকল দেশেই অধিক। এরূপ মূল্যাধিক্যের অনেক কারণও না আছে এমন নহে।

গ্রন্থখানীর প্রথমে ৭৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী অত্যুপাদেয় উপোদ্‌ঘাত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার চারিটি অংশে এই সকল বিষয় অতি নিপুণতা ও বহু গবেষণার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথমাংশে—আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি, বিভাগ উন্নতি ও সংস্কারের উপায়াদি বর্ণিত। দ্বিতীয়াংশে—আদিকালের অবস্থা, গ্রন্থাদির বিবরণ ও কিরূপে ইহা সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে সে সমুদয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৃতীয়াংশে—আয়ুর্ব্বেদের অপরাহ্ণ কাল ধরিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের সুচিন্তিত সন্দর্ভ সন্নিবেশ করিয়াছেন। কিরূপে তন্ত্রসংহিতাদির বিলোপ ঘটিয়াছে এবং দৃশ্যমান দৃঢ়বল, বাগভট, মাধব, বৃন্দ, ডল্লন, চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, অরুণ দত্ত, শার্ঙ্গধর, শিবদাস, ভাবমিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থরাজির কালাদি নির্ণয় এই অংশের বিচার দক্ষতার পরিচায়ক। চতুর্থাংশে—বৈদ্যক শাস্ত্রে যে শারীরেরই প্রাধান্য ও পূর্ব্ব প্রয়োজনিতা,—বিবিধশাস্ত্র হইতে প্রমাণ পরিচয়াদি উদ্ধার এবং ইহার দশাবিপর্য্যয়ের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই উপোদ্‌ঘাত ভাগ সকলেরই সুপাঠ্য। ইহাও সুললিত সংস্কৃতভাষায় লিখিত এবং একখানি রীতিমত গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের অধুনা ও পুরাতন অবস্থাগুলির সুস্পষ্ট ছায়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে বলা যায়।

এখন মূল পুস্তক খানার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। গ্রন্থকার শারীর শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদের শারীরভাগ গভীর আলোচনা করতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া চিত্রাদির সাহায্যে বিষয় গুলি অতি সুন্দর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, পণ্ডিত গণনাথ সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনায় সিদ্ধ হস্ত। রচনা যথাসম্ভব সুমধুর ও প্রাঞ্জল। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সে কালের ঋষি'দের গ্রন্থই পড়িতেছি। গ্রন্থকার স্থানে ২ স্বকৃত সরলটীকাও সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থের মুখপত্রে মানবদেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক ত্রিবর্ণরঞ্জিত এক মনোরম চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্র খানায় মস্তিষ্ক হইতে উরু ভাগ পর্য্যন্ত অভ্যন্তরিক প্রধান সমস্ত যন্ত্র গুলিই এরূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, একটি বালককে ও সহজে বুঝান যাইতে পারে। ফুসফুস, হৃদয়, আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা ও অন্ত্রাদির অবস্থান ও পরিচয় পার্শ্বভাগেই প্রতি অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেখান হইয়াছে। অনেক কবিরাজেরই শারীর তত্ত্বে সামান্যমাত্রও জ্ঞান নাই, একদিন একজন কবিরাজ নাভিদেশে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'আমাশয়' নির্দ্দেশ করিয়াছিল, ইহা একদিকে যেমন লজ্জার বিষয়, তেমনি অনিষ্ট জনক। নানা ভাবেই আয়ুর্ব্বেদের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, এহেন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য যাঁহারা যে ভাবে যাহা করিতেছেন, তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মুখ পত্রের চিত্র ব্যতীত কেবল এই প্রথম খণ্ডেই আর ৬৫ খানী উপাদেয় ও অতি প্রয়োজনীয় চিত্র আছে। চিত্রের ব্যাখ্যান গুলিও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য পূর্ণ ও সুখবোধক। বিষয় নির্ব্বাচন ও অতি সুন্দর হইয়াছে।

এদেশে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়াদি স্থাপিত হইলে এই পুস্তক খানাই আদর্শ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যেক চিকিৎসক; চিকিৎসাবিদ্যার্থী ছাত্র ও প্রত্যেক সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে এই পুস্তক খানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তক খানা পড়িলে সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং আমাদের সহিত একমত হইয়া বলিবেন আয়ুর্ব্বেদ আবার জাগিবে।

সর্ব্বত্রই আমরা এই পুস্তকের সমাদর দেখিতে পাইবে। শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব সে আশাও করিতে পারি। গণনাথ শুধু এই একখানামাত্র গ্রন্থ লিখিয়াই নিবৃত্ত রহেন নাই "সিদ্ধান্ত নিদানম্" নামে আর একখানা সচিত্র নিদান গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহার আদর্শপত্রমাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সমুদয় গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইলে যথাসময়ে তাহারও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আয়ুর্ব্বেদ জগতের প্রথিত ও প্রামাণিক গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে ভাবমিশ্র প্রণীত ভাব প্রকাশকেই শেষমূলগ্রন্থ ধরা যায়, উহা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে, সে আজ তিনশত বৎসরের ও উপরের কথা, তারপর এই বিংশ শতাব্দীর যুগে পাশ্চাত্য নব নব বিজ্ঞান রাশির পূর্ণ অভ্যুদয়ের মধ্যে প্রাচ্য জগতে আবার সেই ঋষি প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? সকলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন সাদরে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করুন। সুধীবর্গ প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

আচার্য্য গঙ্গাধর।

"প্রাণেশ্বরী অনুক্রম" (প্রভৃতি)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ { ২য় সংখ্যা।

আয়ু-রক্ষা।

ধনের চেষ্টা, প্রাণরক্ষার চেষ্টা ও পরলোক রক্ষার চেষ্টা, মানবের এই তিনটী চেষ্টা করণীয়। তিস্রৈষণীয় অধ্যায়ে মহর্ষি চরক একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। এই তিন চেষ্টার মধ্যে প্রাণরক্ষার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান, যেহেতু প্রাণ না থাকিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। যতদিন আয়ু থাকে তত দিন প্রাণও থাকে, আয়ু নিঃশেষ হইলেই প্রাণও বহির্গত হয়, সুতরাং আয়ুর্ব্বৃদ্ধির চেষ্টাতেই প্রাণরক্ষার চেষ্টা নিষ্পাদিত। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, এই চারিটীর সংযুক্ত অবস্থার নাম আয়ু।

শাব্দিকগণ বলেন—"আয়ুর্জীবিত কালো না," জীবিত কালের নাম আয়ু। জীবিতকালই বল আর জীবিত অবস্থাই বল, ফলিতার্থ ঠিক এক।

এই আয়ুরক্ষার জন্য বা আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কার, ইহা দেখাইবার জন্যই চরকে সর্ব্বপ্রথমে দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায়ের অবতারণা।

দীর্ঘজীবন লাভ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বপ্রথমে ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করিয়াছিলেন। "তেনায়ুরমিতং লেভে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, সেই আয়ুর্ব্বেদে অভিজ্ঞতা লাভ ও আয়ুর্ব্বেদীয় নিয়ম প্রতিপালন করিয়াই মহর্ষিগণ অমিত আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘায়ু লাভই আয়ুর্ব্বেদ কল্পতরুর পরম প্রার্থনীয় চরমফল। আরোগ্য ও স্বাস্থ্য না থাকিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় না, রোগ নিবারণ ও স্বাস্থ্যলাভ তাহার আনুষঙ্গিক ফল। সুখে থাকিতে, বাঁচিয়া থাকিতে মানব মাত্রেরই ঐকান্তিকী ইচ্ছা, কিন্তু কিসে সুখ হয়, কিসে দেহ মন সুস্থ থাকে, কোন্ পথে গেলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, সে পথ আমাদের অনেকের নিকটেই অপরিচিত, সুতরাং আজ আমরা বন্ধু বান্ধবগণকে দীর্ঘজীবন পথের বিষয় দুই একটী কথা বলিতেছি।

আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানামবিধারণম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ সাহসানাঞ্চ বর্জনম্॥

আহার্য্যবস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে ভোজন করা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও দুঃসাহস বর্জন, আয়ুর্বৃদ্ধির মূলকারণ।

আহার একটী মহাযজ্ঞস্বরূপ, যেরূপ, যজ্ঞে আহূতি দান করিলে অগ্নিদেব আহূতি গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতির মধ্যে যাহার যে ভাগ তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন, সেইরূপ জঠরানলে আহূতি দান করিলে পাচকাগ্নি, আহার্য্য বস্তুর সারভাগ রস, রক্ত, মাংস, মজ্জাদির মধ্যে যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকে। এইরূপে আহার্য্য বস্তু দ্বারা শারীরিক ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ভস্মে ঘৃতাহূতি দানে কোনও ফল হয় না, পরন্তু ভস্মাচ্ছাদিত যে একটু মন্দাগ্নি থাকে তাহাও ঐ ঘৃতাহূতিতে নিঃশেষ হইয়া যায়, সেইরূপ জঠরানল উদ্দীপ্ত না থাকিলে অজীর্ণে অক্ষুধায় আবার উদরে আহূতির বোঝা পড়িলে, পরিপাকাভাবে ফল তো কিছু হয়ই না, বিশেষতঃ যে একটু মৃদু অগ্নি বিদ্যমান থাকে তাহাও একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন "অজীর্ণে

ভোজনং বিষম্,”—অজীর্ণ সমস্ত রোগের ও আয়ুঃক্ষয়ের মূলকারণ, আয়ুর্ব্বেদ অধ্যশনকে (পূর্ব্ব আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজনকে) শত শত স্থানে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইলে ভোজন করিয়া কখনও স্বাস্থ্যভঙ্গ ও আয়ুঃক্ষয় করিবে না। মলমূত্রাদির বেগধারণে নানারূপ ভীষণ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে মৃত্যু বা মৃত্যুবৎ যাতনা উপভোগ করিতে হয়। চরকে—ন বেগান্ ধারণীয় অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে। দীর্ঘায়ুলাভে ও স্বাস্থ্যলাভে ইচ্ছা থাকিলে কখনও মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না।

“নবেগান্ ধারয়েদ্ধীমান্ মলাদীনাং জিজীবিষুঃ” এখানে আয়ুর্ব্বেদ ভয় দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, কেহ যদি বাঁচিতে ইচ্ছা করে তবে সে কখনও মলাদির বেগধারণ করিবে না। আমরা কিন্তু এতই অসতর্ক ও এতই অপরিণামদর্শী যে, ভয় দেখাইলেও ভয় করি না। সভা সমিতিতে ও যাত্রাগান প্রভৃতিতে আমরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অনেক সময় মলমূত্রাদির বেগধারণ করিতেছি। ক্ষুধাতৃষ্ণাদির বেগও আমরা অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া ধারণ করিতেছি। ফলও তাহার হাতে হাতে ফলিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আয়ুর্ব্বেদীয় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সুস্থ সবল দেহে প্রায় শত বৎসর জীবনধারণ করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য্য ক্ষীণকায় হইয়া অষ্ট প্রহর ব্যাধিকষ্ট উপভোগ করতঃ ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০ কি ৬০ বর্ষেই জীবনলীলা সম্বরণ করিতেছি।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ—‘ব্রহ্মচর্য্য’। চরক এক স্থানে বলিয়াছেন, “ব্রহ্মচর্য্য মায়ুষ্যাণাম্,”—আয়ুবর্দ্ধক যত কিছু আছে, ব্রহ্মচর্য্য তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

চরক স্থানান্তরে—আহার, নিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য, এই তিনটীকেই তুল্যরূপে জীবন রক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।”—ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠায় কায়িক মানসিক শক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য কর্ত্তব্য “শুক্রধারণ,” পবিত্র আহার বিহার তাহার অনুকূলক মাত্র। এইজন্য শিবসংহিতা বলিয়াছেন,

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"—বিন্দুপাতে অর্থাৎ শুক্রপাতে মৃত্যু আর শুক্রধারণে জীবন লাভ হয়। অঙ্কুরিত বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি বাহির হইবার সময় তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া রস বাহির করিলে সে বৃক্ষ তখনই মরিয়া যায়, না মরিলেও সে আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না, ক্রমেই শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। সেইরূপ প্রথম বয়সে দেহমনের পুষ্টিলাভের সময়, সমস্ত ধাতুর সারভূত শুক্রের ক্ষয় হইলে সে কখনও স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য যে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের প্রধান কারণ, আমাদের দেশে তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ আর্য্য বিধবাগণ রহিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যাহাঁরা সধবা অবস্থায় নানারোগে আক্রান্ত, একদিন স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই, কোন চিকিৎসায়ই কোন ফলোদয় হয় নাই, তাহাঁদের মধ্যে অনেকেই বৈধব্য দশায় মাত্র শাকভাত খাইয়াও সুস্থ সবল দেহে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতেছেন। আমাদের দেশে লোকে সাধারণ কথায় বলে, 'বিধবার মৃত্যু নাই,' কথাটা বড় মিথ্যা নয়, ব্রহ্মচর্য্যকে যমও যেন ভয় করিয়া চলে।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ শিক্ষার সময়, চরিত্র গঠনের সময়, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। তাহাঁরা পাঠদ্দশায় শুক্রধারণ করিয়া পবিত্র আহার বিহারে কালযাপন করিতেন। এক বেলা মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। বেশ বিলাসিতার নামগন্ধ ছিল না, কুচিন্তা কুভাবনা কখনও তাহাঁদের অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। তজ্জন্য তাহাঁরা অসাধারণ মানসিক শক্তিলাভ করিয়া সুস্থ সবল দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন।

অধুনা শিক্ষার সময়, চরিত্র গঠনের সময়, ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে ম্লেচ্ছ-চর্য্যের অভ্যাস আরম্ভ হইতেছে। আহার বিহারে কিছুমাত্র পবিত্রতা রক্ষা হয় না, বেশ বিলাসিতার মাত্রা দিন দিন শতগুণ বৃদ্ধি পাইতেছে, শুক্রধারণ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। এখন ছাত্রাবস্থায় অনেকেই ৫।৭টী পর্য্যন্ত পুত্রকন্যার মুখ দর্শন করিয়া থাকেন।

যাহাঁরা বিবাহবাজারে বিক্রীত হইয়া পড়ার খরচ চালাইতে থাকেন তাহাঁদের মধ্যে ছাত্রাবস্থায় পুত্রকন্যার সংখ্যা আরও অধিক দেখিতেছি।

এদিকে ছাত্রজীবনে নীতিশিক্ষা নাই, সামাজিক শাসন নাই, ধর্ম্মালোচনা নাই, অভিভাবকগণের সে পক্ষে দৃষ্টিপাতও নাই, তাহাঁদের দৃষ্টি পাশের দিকে, ছেলে পাশ হইলেই কার্য্য সিদ্ধি।

এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে মুক্তক্ষেত্রে যথেচ্ছরূপে বিচরণ করিতে থাকেন। চারিদিকে বাই খেমটা থিয়েটার প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভনের সীমা সংখ্যা নাই সর্ব্বদা অবারিত দ্বার, সুতরাং অনেকে মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কুৎসিত স্থানে কিংবা অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

এই কুক্রিয়ার ফলে অনেক স্থানেই আমরা অল্পবয়সে ইন্দ্রিয় শিথিলতা, স্বপ্নদোষ, মস্তক ঘূর্ণন, ক্ষুধামান্দ্য, হৃৎকম্প, স্মরণশক্তির লোপ, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি দেখিতেছি। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রমেহ উপদংশেরও ক্রমে ক্রমে প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুইটী রোগ ক্রমে সংক্রামিত হইয়া এক এক বংশকে অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত করিতেছে। শুক্রধারণের অভাবে নানা ভাবে নানা দিক দিয়া আমাদের আয়ু, স্বাস্থ্য, বলবীর্য্য ক্ষয় পাইতেছে।

আমাদের দেশে যত দিন ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা লাভ না হইবে, ছাত্রজীবনে নীতিশিক্ষা না হইবে, ততদিন আমরা কিছুতেই দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিব না। দীর্ঘায়ু লাভের চতুর্থ কারণ—"অহিংসা"। এই অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে জগতে কেহই তাহাঁর হিংসা করিতে পারে না। আর্য্যমহর্ষিগণ সিংহ ব্যাঘ্র ভুজঙ্গাদি সেবিত ভীষণ কাননে অরক্ষিত ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তাহাঁদের হৃদয়ে হিংসাবৃত্তি ছিল না বলিয়া কোন জন্তুই তাহাঁদের হিংসা করিতে পারিত না।

জীবনী শক্তি সত্ত্বেও অনেকে অনেক সময় শত্রুহস্তে সাংঘাতিকরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। যিনি কাহারও হিংসা করেন না, জগতে তাহাঁর শত্রু নাই, সুতরাং অকালে সাংঘাতিক রূপে তাহাঁর জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় না। এইভাবে অহিংসা দ্বারা সাংঘাতিক মৃত্যু জয় করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় বটে।

দীর্ঘায়ু লাভের পঞ্চম কারণ—দুঃসাহসের পরিবর্জ্জন। যাহারা যুদ্ধ

বিগ্রহাদি দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী, প্রায়ই তাহাদিগকে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। আমি যদি তেতালার উপর হইতে নীচের দিকে পড়ি, তবে এখনই আমার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে, আর তাহা না করিলে আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিব।

মহর্ষি চরক জনপদধ্বংসনীয়াধ্যায়ে এইরূপে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "তস্মাদ্ধিতাহার বিহার মূলমায়ুঃ।"—মানবের আয়ু হিতাহার বিহারমূলক। আমরা যদি আয়ুবর্দ্ধক স্বাস্থ্যকর আহার বিহার করি, সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বন করি, দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর না হই, তবে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারি, অন্যথায় শীঘ্র শীঘ্রই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। নিজের পুরুষকারের উপরেই প্রায় আয়ুর বলাবল প্রতিষ্ঠিত। যে যেরূপ কার্য্য করিবে সে সেইরূপ ফললাভ করিবে, দীর্ঘায়ুলাভের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না।

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে,' এই বিশ্বাস করিয়া জীবন মরণে যাঁহারা কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম।

শাস্ত্র বলেন, "দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ।"—অদৃষ্ট, পুরুষকার ও উপযুক্ত কাল, এই তিনটী কার্য্যফল প্রকাশের কারণ। কেবল অদৃষ্ট-বলে কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। যেখানে প্রতিকূল অদৃষ্ট প্রধান, সেখানে পুরুষকার মহাপ্রবল না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, অন্যত্র প্রবল পুরুষকার দেখাইতে পারিলে দৈবকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া পুরুষকার কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। আয়ু থাকে বাঁচিব, না থাকে মরিব, এই কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় নিয়ম রক্ষা করিয়া হিতাহার বিহারে রত থাকিতে হইবে, আর্য্য মহর্ষিদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে, নচেৎ আমরা কিছুতেই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিব না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

দেশীয় পথ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্বরিত ব্যক্তিকে একমাত্র দ্রব্য বিবিধ প্রণালীতে বিলেপী, মণ্ড ও যূষাদিরূপে পরিণত করিয়া পথ্যরূপে যে কেবলমাত্র লঘুপাকের অনুরোধেই ব্যবহার করান হয় এমত নহে। পক্ষান্তরে ঐ সকল দ্রব্যের প্রস্তুত ভেদে উহাদের জ্বর নাশক ও রস পরিপাচক গুণও বর্ত্তিয়া থাকে। পথ্যদ্রব্য যেরূপ প্রস্তুত প্রণালী ভেদে বিলেপী, মণ্ড, যবাগূ ও অন্ন এই চারিভাগে বিভক্ত, সেইরূপ তাহাদের কার্য্যভেদে সকল প্রকার দ্রব্যই দ্রব্যান্তর সংযোগে পাচন, লেখন, তর্পণ, ও বৃংহণ এই চারিভাগে বিভক্ত হয়।

পাচন যথা—পচত্যাংনবহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ যৎ তদ্ধি পাচনম্।

যাহাতে অপক্ক রসেয় পরিপাক হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয় তাহাকে পাচন কহে।

লেখন—ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চযৎ।

লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ।

যাহাতে ধাতু, মল অথবা দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রসধাতুর শুষ্কতা সম্পাদন করে তাহাকে লেখন বলা যায়।

অপরিপাচিত রসধাতুর অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়া এবং মন্দীভূত অগ্নিই জ্বর রোগের প্রধান কারণ। সেই রসধাতুর পরিপাক ও অগ্নিসন্দীপন করণোদ্দেশ্যে পাচন ও লেখন পথ্যাদিই সর্ব্বথা প্রযুজ্য।

যব স্বভাবতই লেখন গুণযুক্ত, খৈ অত্যন্ত লঘু ও রুক্ষ বলিয়া পাচন ও লেখন হইয়া থাকে। কাজেই তরুণজ্বররোগীর পক্ষে যব কিংবা খৈএর মণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ হিতকর।

জ্বর নিরামত্বে পরিণত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিলেপী, মণ্ড, যূষাদি এবং পাচন ও লেখন পথ্যের পরিবর্ত্তে তর্পণ পথ্যের প্রয়োজন হয়।

জ্বরের আমত্ব নিরামত্ব নির্ব্বাচন করা এই প্রবন্ধের বিষয়ান্তর্গত না হইলেও অবস্থানুযায়ী পথ্য নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক মনে করিয়া, প্রবন্ধ বিস্তারের আশঙ্কা ত্যাগ করিতে হইল। জ্বরিত ব্যক্তির ক্ষুধার উদ্রেক, কর্ম্মসামর্থ্য, শরীরের লঘুতা ও জ্বরের মৃদুতাই নিরামজ্বরের সাধারণ লক্ষণ। প্রায়শঃ বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম, কিংবা বাতশ্লেষ্মজ্বরে আট দিনের পর জ্বর নিরামত্বে পরিণত হয়। সন্নিপাত কিংবা ত্রিদোষজ্বরে অষ্টাহ অতীত হইলেও আম বা পচ্যমান অবস্থা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়; এরূপ ক্ষেত্রে দিন গণনার হিসাবে জ্বরের আমত্ব ও পচ্যমানত্ব বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া, নিরাম জ্বরের পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ লক্ষিত হইলে তর্পণ পথ্য যোজনা করিবে। কদাচিৎ সন্নিপাত বা ত্রিদোষজ জ্বরের নিরাম লক্ষণ লক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বেই অতিমাত্র বলক্ষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদবস্থায় অষ্টাহ অতিক্রম করিয়া বলকারক তর্পণ গুণসম্পন্ন মাংসরস প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। যথা—

বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ংক্রিয়াক্রমঃ।

তর্পণ পথ্য।

তৃপধাতু + অনট = তর্পণ। তৃপধাতুর অর্থ তৃপ্তি; অভাবের পূর্ণতাই তৃপ্তি, সুতরাং শরীরের অভাব পূরণকারক আহার্য্যকে তর্পণ কহে। মদ্যজনিত রোগে, মদ্যসেবীকে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত জ্বরে, গ্রীষ্মকালে, পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বর্ত্তমান থাকিলেই কেবল তর্পণ পথ্য যোজনা করা যাইতে পারে।

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্ত কফাধিকে
ঊর্দ্ধগে রক্ত পিত্তেচ যবাগূরহিতা জ্বরে।
তত্র তর্পণমেবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধু শর্করম্॥

খৈচূর্ণ জ্বাল না দিয়া জলের সহিত দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করতঃ জ্বরনাশক দাড়িম কিস্‌মিস্ প্রভৃতি ফলের রস মিলিত করতঃ মধু ও শর্করা যোগে অবলেহের মত করিয়া সেবন করিলে বিশিষ্ট তর্পণ যোগ হয়। এই পথ্য লঘুপাক, বলকারক, দাহ, পিপাসা ও বমননিবারক।

পঞ্চমুষ্টি।

যবের চাউল ১০ তোলা, কুলত্থ কলাই ১০ তোলা, মুগ ১০ তোলা কুল শুঁঠি ১০ তোলা, আমলকী ১০ তোলা, এই পাঁচ দ্রব্য পরিষ্কাররূপে ধুইয়া /৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ এক সের অবশিষ্ট থাকিতে অবতরণ করতঃ কাপড়ে ছাঁকিবে। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োজনানুযায়ী লেবুর রস ও মিছরি সংযোগ করিয়া সেবন করিবে।

এই পথ্য মধ্যজ্বরে বা জীর্ণ ও বিষম জ্বরের বিশেষ হিতকারী পথ্য। শ্বাস কাস ক্ষয় এবং গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার উপকারক। ইহাকে পঞ্চ-মুষ্টিযোগ বলে। প্রত্যেক জিনিষ মুষ্টি পরিমাণ গ্রহণ করিবার বিধান থাকা হেতু ইহার নাম মুষ্টিযোগ। উল্লিখিত দ্রব্যাদির প্রত্যেক পদ এক মুষ্টি করিয়া গ্রহণ করতঃ দ্রব্য সমষ্টি পরিমাণ করিয়া তাহার ষোলগুণ জলে জ্বাল দিয়া তাহার একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুযায়ী সেবন করা যাইতে পারে। রোগীর কফাধিক্য বা অগ্নিমান্দ্য বর্ত্তমান থাকিলে এই পাঁচ দ্রব্যের সঙ্গে একভাগ শুণ্ঠী ও এক ভাগ ধনিয়া মিলিত করিয়া তদুপযুক্ত জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া জ্বাল দিলেই সপ্তমুষ্টিযোগ হইল। এই পথ্য পূর্ব্ববৎ গুণকারী ও অগ্নিসন্দীপক। রুগ্নব্যক্তির ক্ষুধার পরিমাণের হিসাবে এই পথ্য অর্দ্ধ পরিমাণেও প্রস্তুত করিতে পারেন। রোগীকে অপেক্ষাকৃত গাঢ় পথ্য দেওয়া আবশ্যক মনে করিলে কাপড়ে ছাকিবার সময় একটু চট্‌কাইলেই গাঢ় হইবে।

জ্বরিত ব্যক্তির বমন, বিবমিষা, কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং পথ্যাদিতে অরুচি বর্ত্তমান থাকিলে অঞ্জলি পরিমিত খৈ, তৎসহ ১ তোলা কিসমিস একত্র করিয়া পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী জলের সহিত জ্বাল দিয়া কাপড় ছাকা করতঃ লেবু বা বেদানার রস ও সৈন্ধব সংযোগে সেবন করিতে পারেন। এই পথ্য তর্পণ ও লঘুপাক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক ; এমন কি বিদেশাগত 'হর্লিক্‌স মিল্ক' (Harlicks milk) প্রভৃতি প্রশংসিত পথ্য হইতে এই পথ্যের কার্য্যকারিতা কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ সুখ সেব্য।

কচি নারিকেল, যাহাকে চলিত ভাষায় ডাবের লেওয়া বলে, সেই লেওয়া নারিকেলের সহিত লাজ চূর্ণ মিলিত করতঃ চিনি বা মিশ্রি সহ অবলেহন

করিয়া সেবন করিলে পিত্ত জ্বরের প্রবল বমি, দাহ ও পিপাসার উপশম হয়।

পিত্ত জ্বরে ইহাই শ্রেষ্ঠ তর্পণ। কচি নারিকেল, জ্বরিত ব্যক্তিকে পথ্য দিতে কোন ভয়ের কারণ নাই যথা—

"বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং নির্হন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্।"

"দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরপিয়ালৈঃ সপরুষকৈঃ।
তর্পণার্থস্তু দাতব্যং তর্পণং জ্বরনাশনম্॥"

কিসমিস, দাড়িম, খেজুর, পিয়াল ও পরুষফল এই সকল ও জ্বরনাশক। জ্বররোগীর বলাধিষ্ঠান জন্য বাত পিত্তজ্বর বা পচ্যমান বা নিরাম অবস্থায় তর্পণার্থ প্রযোজ্য তর্পণকারকদ্রব্যের মধ্যে মাংসরস সর্ব্বপ্রধান। বাতজ্বর ভিন্ন অন্যান্য জ্বরের জীর্ণাবস্থায় দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে মাংসরস হিতকারী। বাতজ্বরের রোগী একান্ত দুর্ব্বল হইলে তরুণাবস্থাতে মাংসরস পান করিতে পারেন। যথা—

শ্রমোপবাসানিলজে হিতং নিত্যং রসৌদনম্।

শ্রম জনিত অথবা উপবাস জনিত কি। বাতজ্বরের নূতন কি পুরাতন সকল অবস্থাতেই মাংসরসের সহিত অন্ন হিতকারী।

সময় সময় সন্নিপাত বা সন্ততাদি বিষমজ্বরাক্রান্ত রোগীর জ্বরের জীর্ণাবস্থার পূর্ব্বেই বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই সময় বলরক্ষার অনুরোধে পচ্যমান অবস্থায় মাংস রস দেওয়া যায়। কিন্তু মাংস রস জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতগণের সর্ব্ববাদী সম্মত পথ্য নহে। যথা—

গুরূষ্ণত্বান্নশংসন্তি জ্বরে কেচিৎ চিকিৎসকাঃ।

মাংসের গুরুত্ব ও উষ্ণত্ব গুণ থাকাতে কোন কোন চিকিৎসক মাংস রসের বিরোধী। এই বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে ও শিক্ষিত বহুদর্শী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক কোনও বিষয়ে একান্ত পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে, সুতরাং কালবিৎ চিকিৎসক আবশ্যক অনুযায়ী মাংস রস ব্যবস্থা করিবেন।

আহারের প্রণালী ভেদে ভোজ্য পদার্থ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চারিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পেয় পদার্থ, প্রস্তুতপ্রণালীভেদে স্বরস, ক্বাথ, শীতকষায় ও ফাণ্টকষায় এই চারিভাগে বিভক্ত। এই চারি প্রকার পেয়

পদার্থ উত্তরোত্তর লঘুপাক অর্থাৎ স্বরস হইতে ক্বাথ, ক্বাথ হইতে শীত কষায় এবং শীত কষায় হইতে ফাণ্ট লঘুপাক। যথা—স্বরসস্ত গুরুত্বাচ্চ পলমর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।

কোনও বস্তুর স্বরস পান করিতে হইলে একবারে চারি তোলার অধিক পান করিবে না। কালবক, তিত্তিরি ও কুক্কুট মাংস জ্বরিত ব্যক্তির উপযুক্ত। অবস্থাভেদে বা প্রয়োজন অনুসারে "কপোতঃসর্ব্বমাংসানাং তুল্যোগুণকরঃ স্মৃতঃ" এই বাক্যানুবলে কপোত মাংস ও দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ছাগাদি মাংসের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না।

সদ্যহত কুক্কুটাদির মাংস ষোলগুণ জলে জ্বাল দিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাকিবে। যেমন চারি তোলা মাংস, ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া আদা তেজপাতা, দ্বারা সম্ভার দিবে। পরে পুনরায় মোটা কাপড়ে ছাকিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীর বল ও ক্ষুধার অবস্থানুসারে অল্পে অল্পে সেবন করিবে কিন্তু একবারে ৮ তোলার অধিক সেবন করিবে না। এই মাংসের সহিত মাংস রসের এক অষ্টমাংশ দাড়িম্বরস মিলিত করিলে বিশেষ হিতকর হয়।

প্রকারান্তর—পলানি দ্বাদশপ্রস্থে যনেহথ তন্মুকেতু ষট্।
মাসংস্থ বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে॥

৯৬ তোলা পরিমিত পরিষ্কৃত মাংস চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাকিবে। তৎপর সেই জল আদা ও তেজপাতা দ্বারা সম্ভার দিয়া পুনরায় কাপড়ে ছাকিবে; ইহাকে ঘন মাংসরস কহে।

৭২ তোলা মাংস চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী রস প্রস্তুত করিলে তাহাকে অচ্ছরস কহে।

৮ তোলা পরিমিত মাংস /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রস গ্রহণ করিলে তাহাকে অচ্ছতর রস কহে জ্বরিত কিংবা জ্বরমুক্ত ব্যক্তি বল, অগ্নি, বয়স ও ব্যাধির প্রকোপ অনুযায়ী এই তিন প্রকার মাংস রসই ব্যবহার করিতে পারেন।

পেয়া পদার্থের মধ্যে ফাণ্টরস সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। সুতরাং জ্বরিত ব্যক্তি-

নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। ১৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ কুট্টিত মাংস একটি বৃহৎ পাত্রে রাখিবে; তাহাতে ৩২ তোলা উষ্ণ জল নিক্ষেপ করতঃ শীতল হওয়া পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করতঃ কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। ইহাকে মাংসের ফাণ্ট কষায় কহে। ইহা লঘুপাক ও বল কারক। এই মাংস রস অল্পে অল্পে পান করিবে। কিন্তু ১৬ তোলার অধিক পান করিবে না। মাংস ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদির ফাণ্টকষায় প্রস্তুত করিতে হইলে ৩২ তোলা উষ্ণ জলে ৮ তোলা দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন করিতে হয়। যথা—

জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যংপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মর্দ্দয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ ॥
ষড্‌ভিঃ পলৈশ্চতুর্ভির্বা সলিলাৎশীতফাণ্টয়োঃ।
আপ্লুতং ভেষজপলং রসাখ্যায়াং পলদ্বয়ম্ ॥

কোনও দ্রব্যের শীত কষায় প্রস্তুত করিতে হইলে ৮ আট তোলা পরিমাণ পরিস্কৃত ও কুট্টিত দ্রব্য ৪৮ তোলা পরিমিত জলে মৃৎপাত্রে সন্ধ্যার সময় রাখিয়া দিতে হয়। প্রত্যুষে ঐ জল কাপড়ে ছাকিয়া লইলেই সেই দ্রব্যের শীত কষায় প্রস্তুত হইল।

বাসি হইলে মাংস ও তণ্ডুলাদির শীত কষায় পান কবিবার বিধান নাই যথা—

ব্রীহি প্রাণ্যঙ্গয়োঃ ক্বাথংব্যুসিতং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ চিকিৎসক নিম্ন লিখিত উপায়ে মাংস রস গ্রহণ করেন। পরিষ্কৃত কুট্টিত মাংস দ্বারা একটি চীনা বৈয়মের বার আনা অংশ পূরণ করতঃ বৈয়মের মুখ বন্ধ করিবে। বৈয়মের মুখ ও ছিপির সংযোগ স্থান একটু ময়দা দ্বারা বন্ধ করিলে ভাল হয়। তৎপর একটি জলপূর্ণ লৌহ কটাহে মাংসের বৈয়মটি এমন ভাবে বসাইবে যেন বৈয়মের গলদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত থাকে। সেই কটাহ ৪ ঘণ্টা কাল মৃদু অগ্নিতে জাল দিলে মাংসের সার ভাগ দ্রবীভূত অবস্থায় পরিণত হয়। জল হইতে বৈয়ম উত্তোলন করতঃ মাংস কাপড়ে ছাকিয়া দ্রব-ভাগ গ্রহণ করিলেই বিশুদ্ধ মাংস রস প্রস্তুত হইল। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে

এই প্রণালীতে গৃহীত মাংসরসকে মাংসের স্বরস সংজ্ঞার অন্তর্গত করা যায়। সুবিস্তীর্ণ সূদশাস্ত্রে এই প্রণালীতে মাংসরস গ্রহণ করিবার পদ্ধতি আছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ আচার্য্যগণ পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার অনুরোধে সুবিস্তীর্ণ সূদশাস্ত্রের যে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এইরূপে মাংসরস গ্রহণ করিবার বিধান দেখা যায় না। এমতাবস্থায় মাংসরস প্রস্তুত করিবার শাস্ত্রসম্মত নানা প্রকার বিশুদ্ধ উপায় বর্ত্তমান থাকিতে এই প্রণালী অবলম্বন করা কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষে কতদূর কর্ত্তব্য বলিতে পারি না।

আমরা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারি প্রভূত পরিমাণ জলের সঙ্গে জ্বাল দিয়া সেই জলের সহিত মাংসের সার ভাগ পান করা অপেক্ষা জল বিবর্জ্জিত কেবল মাত্র উষ্ণতায় নিপীড়িত সার ভাগ পান করা অধিকতর উষ্ণবীর্য্য ও গুরুতর হইবে। এমতাবস্থায় জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুযায়ী মাংসের ক্বাথ, ঘন রস, অচ্ছ, অচ্ছতররস, ফাণ্টরস প্রভৃতি লঘুপাক মাংসরস উপেক্ষা করিয়া আধুনিক প্রণালীতে বৈয়মে প্রস্তুতি মাংসরস পান করা সঙ্গত বোধ হয় না। কেননা মাংসের উষ্ণত্ব ও গুরুত্ব গুণ অধিক বলিয়া জ্বরিত ব্যক্তির সর্ব্ববাদী সম্মত পথ্য নহে। পক্ষান্তরে বিদেশাগত বহু-কালোৎপন্ন Essence of chicken প্রভৃতির মাংস রস যাহা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে তাহা সুস্থব্যক্তির পক্ষেও পানোপ-যোগী বলিয়া বোধ হয় না। যথা—

ব্রীহি প্রাণ্যঙ্গয়োঃ ক্বাথংব্যুসিতং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিন বিহারী সেনগুপ্ত।

পল্লীচিকিৎসক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেখুন, সুরেন বাবু, আমার যখন যৌবনকাল, সে সময় হঠাৎ রাত্রিতে আমার ১টা বুদ্ধিদন্ত বেদনাযুক্ত হয়; বেদনা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। আমি ভাবিলাম, আপদটা পড়িয়া গেলেই গোল চুকিয়া যায়। যেম্‌নি ভাবনা, তেম্‌নি কাজ, জোড়ে বেশ করিয়া একবার ঝাকিয়া দিলাম। হায়রে! সে কথা মনে হইলে এখনও আমার গাত্রকম্প উপস্থিত হয়। বৈকালে কায়ক্লেশে খাইতে বসিলাম—এক গ্রাস ভাত খাইতেই হঠাৎ দাঁতে দাঁতে ঘা লাগিয়া গেল—আমি একেবারে অজ্ঞান ছিলাম—ছিলাম ভাল; কিন্তু জ্ঞান হইলে পর রাত্রিটা যে কি ভাবে কাটাইলাম, বলিতে পারি না। আমার এক আত্মীয় 'ক্রিয়োজোট' নামক একটা ডাক্তারি ঔষধ আনিয়া পুনঃ পুনঃ দাতে দিতে লাগিল—যখন ঔষধ দেওয়া হয় তখন একটু আরাম লাগে সত্য, কিন্তু আবার যেই সেই। ২ দিন ঐভাবেই কাটিল। পরে দেখি দাঁতের গোড়া পাকিয়া পূঁয পড়িতেছে; দাঁতটীতেও একটা ফাটা দাগ রহিয়াছে; আর উহা হইতে কি যেন এক প্রকার আঠা আঠা পদার্থ বাহির হইতেছে—আমি দাঁতটী ফেলিতে উদ্যত, কিন্তু হাত ছোঁয়ায়,—কার সাধ্য! আমার এক প্রবীণ আত্মীয় বুঝাইলেন যে উহা বুদ্ধি দন্ত, উহা পড়ে না,—পড়িলে আর হয় না। আমি হতাশ হইলাম। অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি, হঠাৎ আপনা আপনি মনে পড়িল, নিমের ছাল ও পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা কুলি করি না কেন? তাহাই করিলাম—বাস্তবিক ২।৩ দিনে উহার সাহায্যেই আরোগ্য হইলাম এবং যেন নবজীবন লাভ করিলাম। অনেক রোগীকে ইহা দ্বারাই আরোগ্য করিয়াছি। দিনে ৪।৫ বার (আবশ্যক মতে) কুল্লি করিয়াছি।

বকুল বীজ পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণজল সহ মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়। হীরাকস্ ঘৃতে পাক করিয়া দাঁতে দিলে দাঁতের বেদনা সারে।

সুরেন—আচ্ছা যাহার সান্নিক কখনও হয় নাই, তাহার চিরমুক্ত থাকিবার উপায় আছে কি ?

হ—আছে। বাহ্য বা প্রস্রাব ত্যাগ কালীন যদি কোনও প্রকারে থুথু ফেলা না হয়, তবে কখনও সান্নিক আসিবে না। আর মধ্যমা অঙ্গুলি ভিন্ন কখনও অন্য কোন আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজিবে না। ইহাই সান্নিকের উত্তম প্রতিবন্ধক।

সু—ইটের সাহায্যেও তো সান্নিকের অসহ্য বেদনার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কেমন ?

হ—হাঁ, একখণ্ড ইষ্টক অগ্নিতে খুব পোড়াইয়া গরম করিতে হয়। পরে উত্তপ্ত জলে উহা ছাড়িয়া দিলে যখন দেখা যায় যে, আর জলের কোনও পোটা (বুদ্‌বুদ) উঠেনা, তখন উহা জল হইতে তুলিয়া একখণ্ড পাতলা ফ্লানেল দ্বারা মোড়াইয়া তাহা দ্বারা বেদনাযুক্ত দাঁতসংলগ্ন গালে স্বেদ দিলেই ঐ বেদনা অচিরে লোপ পায় এবং রোগী বড়ই আরাম বোধ করে।

সু—আজকাল বাজারে দন্তমঞ্জনের ছড়াছড়ি, এখন সহজ লভ্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত একটী মঞ্জনের কথা বল না।

হ—ফুলখড়ি ২ ভাগ, গোলমরিচ, দারুচিনি, প্রত্যেকের ১ ভাগ, লবঙ্গ ১ ভাগ, সুপারি ভস্ম ১ ভাগ, চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইয়া লইতে হয়। উহার সহিত কিছু কর্পূর যোগ করিয়া লইবেন।

সু—বালুকাদ্বারা দাঁত মাজিলে কি হয় ?

হ—দাঁত ক্ষয় পায় ও দাঁতের কড়া (দাঁতের গোড়ার প্রস্তরবৎ শক্ত পদার্থ বিশেষ) পড়িয়া দাঁত শিথিল করিয়া ফেলে।

সু—কই মন্ত্রতন্ত্র ২।১টা বলিলে না।

হ—এই বলিতেছি, শুনুন।

"অন্তরসা দন্তরসা গুধ্যান সিধ্যানে কয়, স্বরূপে কয় দন্তরসা ভাল হয় ; জান্যা যে না কয়, স্ববংশে নির্ব্বংশ হয়।"

এই মন্ত্রে কিছু আঁটালে মাটি অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দারাই দাঁত মাজিতে হয়।

কেহ কেহ নিম্নোক্ত মন্ত্রেও মাটী অভিমন্ত্রিত করিয়া লয়—যথা—

"অন্তরসা দন্তরসা আভূতে ভাবুতে কয়, দন্তরসা নষ্ট হয়।"

'অভিমন্ত্রিত'—কথাটার অর্থ মনে আছেত ?

সু—হাঁ—আছে।

হ—মন্ত্র ভিন্ন কবচ দ্বারাও এক প্রকার চিকিৎসা আছে, জানেন ত ?

সু—তাবিজ কবচেও চিকিৎসা দেখা যায় ?

হ—তাবিজের দ্বারা দুই উপায়ে চিকিৎসা চলে।

সু—সে কেমন ?

হ—একপ্রকারে কোনও গাছ গাছড়ার শিকড় প্রভৃতি দ্বারা এবং অন্য প্রকারে ভোজপাতে (ভূর্জ্জপত্র, বেণে দোকানে পাওয়া যায়) গোরোচনা ও আল্‌তা দ্বারা মন্ত্র বা কোনও ঘর-আকা—বীজলেখা লিখিয়া তাবিজে ভরিয়া নিয়মমত কণ্ঠে, বাহুতে বা কোমরে ধারণ করিতে হয়।

সু—ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিলে ভাল হয় না কি ?

হ—যখন বলিতে বসিয়াছি তখন সবটারই কিছু কিছু বলিয়া যাইব।

হ—উপরোক্ত কবচ ভোজ পাতে আল্‌তা ও গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া তাবিজে ভরিয়া রোগীর গলায় দিতে হয়। কবচ মাত্রই ব্যবহারান্তে প্রত্যহ স্নানকালে তাহা ধুইয়া সেই জল তিনবার খাইতে হয়। উল্লেখ না থাকিলে রূপার তাবিজ—তামার কোড়া, বা তামার তাবিজ—রূপার কোড়া লাগিবে।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তাবিজে কবচ ভরিয়া ধূপ বা অন্য কিছু দিয়া মুখ বন্ধ করিতে হয়, যেন কোনওরূপে জল প্রবেশ করিতে না পায়। আগুনের আঁচে যেন কবচ না পড়ে, কারণ উহাতে উহার 'গুণ' নষ্ট হইয়া যায়। ঋতুমতী স্ত্রীলোককে তিন রাত্রির পূর্ব্বে ছুইলেও উহা নষ্ট হইয়া যায়। অশুচি স্থানে কবচ সহ যাইতে নাই। ঋতুমতী স্ত্রী সংস্পর্শ বা অশুচি স্থানে গমন করিলে যে দোষ হয় উহার নাম সাধারণতঃ 'ছুঁট পাওয়া' বলে। ছুঁট্ পাইলে যেরূপে উহা অভিষিক্ত করিলে দোষ সংশোধিত হয়, তাহার নিয়ম এই:—"পাঁচগাছা দূর্ব্বা, ৫টী আমন ধান,

তুলসীপাতা, কাঁচাদুধ, ও গঙ্গাজল অভাবে ব্যবহার্য্য জল একটি পিত্তলের, পাত্রে রাখিয়া উহাতে তাবিজটি বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ২।৪ দণ্ড বেলা থাকিতে—যাহাকে আমরা 'ভাটী বেলা' বলি—এই অভিষেক করাইতে হয়। প্রথম ব্যবহার করিতেও এইরূপে সংশোধন আবশ্যক। শোধন করিবার দিন শনিবার কি মঙ্গলবার হওয়া আবশ্যক।

সু—সান্নিকেরও এরূপ আছে কি?

হ—আছে; ইহাও গলায় ব্যবহার করিতে হয়।

হ—মুখের ঘায়ের একটা ঔষধ বলিয়াই এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতে চাই।

সু—সে তোমার ইচ্ছা।

হ—তামাক পাতা, বাসকপাতা ও কাপিলার ছাল সম পরিমাণে লইয়া তামাকের ন্যায় কাটিয়া রাব দিয়া মাখিয়া লইতে হয়। এইরূপ প্রস্তুত তামাকের ধূম পানে মুখের ঘাঁ আরোগ্য হয়।

আজ এপর্য্যন্তই শেষ, এখন তবে আসি।

সু—কা'ল একটু সকালে আসিও, মনে থাকে যেন।

হ—আসিব, ভুলিব না। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

আচার্য্য গঙ্গাধরের জীবনী।

শকাব্দা ১৭২০ বৈদ্যাব্দ ১২০৫ শালের আষাঢ়ের পঞ্চবিংশতি দিবসে, শুক্রবারে, কৃষ্ণাষ্টমীতে যশোহরের অন্তর্গত মাগুড়া গ্রামে, "ভারতের শেষ ঋষি" আচার্য্য গঙ্গাধর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ভবানী-প্রসাদ রায়, মাতার নাম অভয়া দেবী।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহাঁদের কুলপুরোহিত গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী গঙ্গাধরের বিদ্যারম্ভ করান। প্রাথমিক শিক্ষায় দশমবর্ষ অতীত হইলে, *

* শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ আচার্য্য কবিরত্নের মতে গঙ্গাধর দশমবর্ষ পর্য্যন্ত গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গঙ্গাধরের মেধা ও স্বভাব চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভবানীপ্রসাদকে বলিলেন "গঙ্গাধর বিখ্যাত কবিরাজ ও পণ্ডিত হইবে।" গোপীকান্তের সুলক্ষণ পরীক্ষায় যে বিশেষ শক্তি ছিল বলা বাহুল্য।

ভবানীপ্রসাদের ভাগিনেয়, গঙ্গাধরের পিতৃস্বস্রেয় নন্দকুমার সেনের নিকট গঙ্গাধর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। নন্দকুমার সেন তখন নাটোর রাজবাটীর সহকারী রাজচিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি কার্য্যব্যপদেশে কিয়দ্দিন মাগুড়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং উপযুক্ত ভ্রাতা গঙ্গাধরের অধ্যয়ন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গঙ্গাধরের অধ্যয়নকুশলতায় তাঁহার অধ্যাপনাচিকীর্ষাও নিতান্ত বলবতী হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের অধ্যাপকতায় অধ্যাপকের যে আনন্দ নন্দকুমার সেন তাহা অধিক দিন উপভোগ করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহাকে নাটোর গমনে বাধ্য হইতে হইল। সুতরাং ভ্রাতার অধ্যয়নভার উক্ত প্রদেশের তাৎকালিক একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পণ্ডিত মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করিলেন।

উক্ত মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধের অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করিয়া, গঙ্গাধর যশোহরের অন্তর্গত বারইখালি গ্রাম নিবাসী রামরত্ন চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট অভিধান, কাব্য, বাদার্থ এবং নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই বারইখালির চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালীন রামরত্ন চূড়ামণি মহাশয় গঙ্গাধরের বিদ্যাবত্তার অসামান্য প্রতিভা দর্শনে অন্যান্য ছাত্রদিগের অধ্যয়নভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর এই সহাধ্যায়ী ছাত্রদিগকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। কিসে তাহাদের মনস্তুষ্টি হইবে তাহাই চিন্তা করিতেন। এই সময়ে ছাত্রদিগের সুখবোধের জন্য তিনি মুগ্ধবোধের একখানি স্বতন্ত্র টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বারইখালি হইতে মাগুড়া অল্প ব্যবধান থাকায় মাতা ও মাতামহীর অনুরোধে গঙ্গাধরকে অনধ্যায়ের সময় বাটী যাইতে হইত। কিছুদিন তিনি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছাত্র গণের উৎসাহ ও প্রীতিবর্দ্ধন মানসে এই বাটী যাইবার পথে মুখে মুখে শ্লোকরচনা করিয়া বাটীতে যাইয়া উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। অনধ্যায়ের পরদিন চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সেই শ্লোক গুলি সতীর্থগণকে উপহার দিতেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে কেবল মাত্র কবিতা লিখিয়া অনধ্যায়ের দীর্ঘসময় অতিবাহিত করাও শেষে তাঁহার ক্ষতিজনক বিবেচিত হইল। স্থির করিলেন—ব্যাকরণের স্ত্রীত্য, কারক ও সমাসের টীকা লিখিবেন, তাহাতে লিখিবারও অভ্যাস থাকিবে, ছাত্রদিগের অধ্যয়নেও সুবিধা হইবে। এই হইতেই গঙ্গাধরের মুগ্ধবোধের টীকা লিখিবার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই টীকা লিখিবার কথা কেহ জানিতে না পারে, তজ্জন্য কবিতা রচনায় ও বিরত হইলেন না। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর হইবে। বারইখালির চতুষ্পাঠীতেই গঙ্গাধর মুগ্ধবোধের স্ত্রীত্য, কারক, সমাসের একখানি স্বতন্ত্র টীকা প্রস্তুত করিলেন।

বারইখালির চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাধর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের জন্য পিতৃসন্নিধানে নাটোর গমন করেন। ভবানীপ্রসাদ তখন নাটোরের রাজবৈদ্য ছিলেন। পুত্র গঙ্গাধরের অলৌকিক শক্তি তাঁহার অবিদিত ছিলনা। ভাগিনেয় নন্দকুমারের নিকট গঙ্গাধরের অধ্যয়ন কুশলতার বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। সুতরাং পুত্রের উপযুক্ত অধ্যাপক মনোনয়নে, নন্দকুমারের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বহু পরামর্শের পর স্থিরীকৃত হইল—নাটোরের সন্নিকটবর্ত্তী বৈদ্য-বেলঘরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রামকান্ত সেন মহাশয়ের অধ্যাপনা অনন্য-সুলভ, সুতরাং গঙ্গাধর উক্ত সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন, তাহাই স্থির হইল। বিশেষতঃ নাটোর হইতে বৈদ্যবেল-ঘরিয়ার ব্যবধান অল্প হওয়ায় গঙ্গাধরের একটী বিশেষ সুবিধার কারণ হইয়াছিল। ত্রয়োদশী হইতে প্রতিপদ পর্য্যন্ত তিনি পিতার নিকটে আসিয়া এই অনধ্যায়ের সময় মুগ্ধবোধের স্বকৃতটীকার সংশোধনে অতিবাহিত করিতে পারিতেন।

রামকান্ত সেন মহাশয়ের সূক্ষ্মদৃষ্টি গঙ্গাধরের উপর পতিত হইলে তিনি বুঝিলেন গঙ্গাধর প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র। বিশেষতঃ গঙ্গাধর অনধীত গ্রন্থ এরূপ ভাবে পড়াইতে পারিতেন, যেন উহা তাঁহার বহুদিনের অধীত বলিয়া মনে হইত। এই সময় রামকান্ত সেন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একটী ছাত্র ছিল।

পরমানন্দ চক্রবর্ত্তির মেধা গঙ্গাধরের ন্যায় প্রখর ছিলনা। গঙ্গাধর অল্পদিনেই পরমানন্দের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। তাহাতে রামকান্ত সেন মহাশয় একদিন পরমানন্দকে বলিয়া ছিলেন "দেখ পরমানন্দ, গঙ্গাধর তোমার পরে আসিয়া কতদূর অগ্রবর্ত্তী হইল, তুমি কতদিনে পাঠ শেষ করিবে?। এই কথায় পরমানন্দ বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাধরের অসাধারণ ধীশক্তি আলোচনা করিয়া একদিন পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাধরের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। গঙ্গাধরের তখন পাঠ্যাবস্থা। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি গুরুর বিনানুমতিতে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন! গঙ্গাধর বলিলেন "আমার পাঠ শেষ হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া তোমাকে আমি স্বতন্ত্রভাবে পড়াইতে পারি।" পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাধরের এইবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার পাঠ সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তরকালে গঙ্গাধরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এক্ষণে রাজসাহীর প্রধান চিকিৎসকরূপে অবস্থান করিতেছেন।

গঙ্গাধরের পাঠ্যাবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব স্বীকৃত হইলেও মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন তৎকালে নিতান্ত বিরল ছিল। বিশেষতঃ পঠনোপযোগী আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক সমূহের একত্র সমাবেশ ও তখন অসম্ভব বলিয়া ছাত্রগণ অধ্যাপকের পুস্তকই একমাত্র উপজীব্য বোধে প্রত্যেকেই উহা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া লইত। গঙ্গাধর প্রত্যহ পুঁথির দশ পৃষ্ঠা লিখিতেন, দশপৃষ্ঠার পাঠ লইতেন এবং দশপৃষ্ঠা অভ্যাস করিতেন। এই নিয়মে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াও তিনি অবশিষ্ট সময় অধ্যাপকের ছাত্রগণকে পাঠ বলিয়া দিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গঙ্গাধর অনধ্যায়ের সময় স্বীয় টীকার সংশোধনে ব্যয় করিতেন। এই ভাবে মুগ্ধবোধের টীকা সংশোধিত হইলে, গঙ্গাধরের পিতা ভবানী প্রসাদ উহা দোষশূন্য হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে নাটোর রাজধানীতে তখন পণ্ডিতসমাগমের সময় উপস্থিত হইল। 'বার্ষিক' গ্রহণের

জন্য দলে দলে পণ্ডিতমণ্ডলীর আগমন হইতে লাগিল। একদিন ভবানীপ্রসাদ তাৎকালিক মুখ্য পণ্ডিতগণকে সাগ্রহে বাসায় আহ্বান করিয়া গঙ্গাধরের মুগ্ধবোধ টীকাখানি তাহাঁদিগের নিকট উপস্থিত করিলেন। একজন প্রাচীন পণ্ডিত, টীকাখানির বহুস্থান আলোচনা করিয়া বলিলেন "কবিরাজ মহাশয়, ইহা অতি প্রাচীন টীকা, কোথায় পাইলেন? এ টীকার প্রচার নাই" ভবানীপ্রসাদ সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন "ইহা আমার বালক পুত্র গঙ্গাধরের রচিত।"

বালকের রচিত টীকা শুনিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী গঙ্গাধরকে দেখিতে চাহিলেন। গঙ্গাধর পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইলে সকলেই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গঙ্গাধরের ন্যায় বালকের পক্ষে এইরূপ একখানি টীকা রচনা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। জনৈক পণ্ডিত গঙ্গাধরকে নিকটস্থ করিয়া কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গঙ্গাধর তাহাঁর প্রত্যেক প্রশ্নেরই গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিলে সকলেই ভূয়সী প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে বহু পণ্ডিতের দৃষ্টিতে টীকার যে স্থলে যে অভিমত ব্যক্ত হইত ভবানী প্রসাদ সেই সেই স্থলে উহা লিখিয়া রাখিতেন। ইহাতে টীকাখানি দৃষ্টিপূত হইয়া নিতান্ত উপাদেয় হইয়া পড়িল।

গঙ্গাধর যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খানি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, তাহার কাল নিরূপণে এই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ আছে।

রসাগ্নিশৈলেন্দুমিতে শকাব্দে শিবং শিবেশং শিবদং শিবায়।
ব্যালেখিষং ব্যাকরণং প্রণম্য গঙ্গাধরো বৈদ্যকুলোদ্ভবোঽহম্ ॥

এই শ্লোকে ১৭৩৬ শকাব্দার অববোধ হয়। সুতরাং গঙ্গাধরের জন্ম শকাব্দা হইতে উহা ষোড়শবর্ষ মাত্র। কিন্তু ইহা তাহাঁর লিখিবার কাল। ইহার পূর্ব্বেই যে তিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। তাহাঁর লিখিত বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ও উক্ত শকাব্দার কাল নির্ণীত হয়।

ভয়ঙ্করীং তাং চ দিগম্বরীং তামভিপ্রণম্যেশ হরিদেব সর্ব্বান্।

পরমানন্দ চক্রবর্ত্তির মেধা গঙ্গাধরের ন্যায় প্রখর ছিলনা। গঙ্গাধর অল্পদিনেই পরমানন্দের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। তাহাতে রামকান্ত সেন মহাশয় একদিন পরমানন্দকে বলিয়া ছিলেন “দেখ পরমানন্দ,” গঙ্গাধর তোমার পরে আসিয়া কতদূর অগ্রবর্ত্তী হইল, তুমি কতদিনে পাঠ শেষ করিবে ?। এই কথায় পরমানন্দ বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাধরের অসাধারণ ধীশক্তি আলোচনা করিয়া একদিন পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাধরের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। গঙ্গাধরের তখন পাঠ্যাবস্থা। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি গুরুর বিনানুমতিতে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন! গঙ্গাধর বলিলেন “আমার পাঠ শেষ হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া তোমাকে আমি স্বতন্ত্রভাবে পড়াইতে পারি।” পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাধরের এইবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার পাঠ সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তরকালে গঙ্গাধরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এক্ষণে রাজসাহীর প্রধান চিকিৎসকরূপে অবস্থান করিতেছেন।

গঙ্গাধরের পাঠ্যাবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব স্বীকৃত হইলেও মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন তৎকালে নিতান্ত বিরল ছিল। বিশেষতঃ পঠনোপযোগী আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক সমূহের একত্র সমাবেশ ও তখন অসম্ভব বলিয়া ছাত্রগণ অধ্যাপকের পুস্তকই একমাত্র উপজীব্য বোধে প্রত্যেকেই উহা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া লইত। গঙ্গাধর প্রত্যহ পুঁথির দশ পৃষ্ঠা লিখিতেন, দশপৃষ্ঠার পাঠ লইতেন এবং দশপৃষ্ঠা অভ্যাস করিতেন। এই নিয়মে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াও তিনি অবশিষ্ট সময় অধ্যাপকের ছাত্রগণকে পাঠ বলিয়া দিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গঙ্গাধর অনধ্যায়ের সময় স্বীয় টীকার সংশোধনে ব্যয় করিতেন। এই ভাবে মুগ্ধবোধের টীকা সংশোধিত হইলে, গঙ্গাধরের পিতা ভবানী প্রসাদ উহা দোষশূন্য হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে নাটোর রাজধানীতে তখন পণ্ডিতসমাগমের সময় উপস্থিত হইল। ‘বার্ষিক’ গ্রহণের

জন্য দলে দলে পণ্ডিতমণ্ডলীর আগমন হইতে লাগিল। একদিন ভবানীপ্রসাদ তাৎকালিক মুখ্য পণ্ডিতগণকে সাগ্রহে বাসায় আহ্বান করিয়া গঙ্গাধরের মুগ্ধবোধ টীকাখানি তাহাঁদিগের নিকট উপস্থিত করিলেন। একজন প্রাচীন পণ্ডিত, টীকাখানির বহুস্থান আলোচনা করিয়া বলিলেন "কবিরাজ মহাশয়, ইহা অতি প্রাচীন টীকা, কোথায় পাইলেন? এ টীকার প্রচার নাই" ভবানীপ্রসাদ সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন "ইহা আমার বালক পুত্র গঙ্গাধরের রচিত।"

বালকের রচিত টীকা শুনিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী গঙ্গাধরকে দেখিতে চাহিলেন। গঙ্গাধর পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইলে সকলেই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গঙ্গাধরের ন্যায় বালকের পক্ষে এইরূপ একখানি টীকা রচনা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। জনৈক পণ্ডিত গঙ্গাধরকে নিকটস্থ করিয়া কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গঙ্গাধর তাহাঁর প্রত্যেক প্রশ্নেরই গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিলে সকলেই ভূয়সী প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে বহু পণ্ডিতের দৃষ্টিতে টীকার যে স্থলে যে অভিমত ব্যক্ত হইত ভবানী প্রসাদ সেই সেই স্থলে উহা লিখিয়া রাখিতেন। ইহাতে টীকাখানি দৃষ্টিপূত হইয়া নিতান্ত উপাদেয় হইয়া পড়িল।

গঙ্গাধর যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খানি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, তাহার কাল নিরূপণে এই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ আছে।

রসাগ্নিশৈলেন্দুমিতে শকাব্দে শিবং শিবেশং শিবদং শিবায়।
ব্যালেখিষং ব্যাকরণং প্রণম্য গঙ্গাধরো বৈদ্যকুলোদ্ভবোঽহম্॥

এই শ্লোকে ১৭৩৬ শকাব্দার অববোধ হয়। সুতরাং গঙ্গাধরের জন্ম শকাব্দা হইতে উহা ষোড়শবর্ষ মাত্র। কিন্তু ইহা তাহাঁর লিখিবার কাল। ইহার পূর্ব্বেই যে তিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। তাহাঁর লিখিত বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ও উক্ত শকাব্দার কাল নির্ণীত হয়।

ভয়ঙ্করীং তাং চ দিগম্বরীং তামস্তিপ্রণম্যেশ হরিদেব সর্ব্বান্।

রসাগ্নিশৈলেন্দুমিলিতে হি পুস্তিঃ শ্রীকালিকামাশু ময়া লিলিখ্যে॥

গঙ্গাধরের সারমঞ্জরী লিখিবার কাল এইরূপ লিখিত আছে—

পদে স্বয়ং তস্য সুখেন নত্বা পাঠাল্লিলেখত্বরিতংহি পুস্তিম্।
যঃ শৈলেশ শৈলসুতেশ ঈশঃ শৈলানলাখেন্দুযুতে শকেঽহম্॥

এই শ্লোকের শকাব্দা ১৭৩৭ হইতেছে। ইহা ব্যাকরণ পাঠের পরবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। গঙ্গাধরের কাব্য পাঠের সময় নির্ণয় করিতে হইলে এই সময়ই ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ সমস্ত পুস্তকে লিখিবার কাল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে যে "আচার্য্য গঙ্গাধরের পুস্তকাবলীর সাহায্যে যদি কোনরূপ উপাদান সংগৃহীত হয় তাহাও...... গ্রন্থের গুরুত্ব বর্দ্ধনে নিয়োজিত হইবে।" এই জন্য এই সমস্ত শ্লোক সাহায্যে তাহাঁর পঠন কাল অনুমান করিয়া লওয়া হইতেছে। †

রামকান্ত সেন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে নিদান, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ শেষ হইলে অধ্যাপক গঙ্গাধরকে চরকসংহিতা পাঠের অনুমতি করেন। তৎকালে চরকসংহিতার সমগ্র অংশ এক স্থানে পাওয়া যাইত না এবং উহা পড়াইবার অধ্যাপক ও বিরল ছিল। রামকান্ত সেন মহাশয়ের নিকট চরকসংহিতার সমগ্র অংশ ছিল না। যতদূর ছিল তাহাই গঙ্গাধর লিখিয়া লইলেন এবং অন্যান্য অংশের জন্য বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক অতিকষ্টে সমগ্র গ্রন্থ লাভ করিয়া উহা পাঠ করিলেন। এই সময়ে তাহাঁকে গুরুতর পরিশ্রম সহকারে পুঁথির ১০ পাতা লিখিতে ও ১০ পাতা পাঠ লইতে হইত।

গঙ্গাধরের লিখিত মাধব নিদানের লিখিবার কাল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মাধবপদ সরসীরুহ পাংশুধূসরপিঙ্গলবিগ্রহকালিঃ।
মাধবপদ সরসীরুহপাংশুধূসরপিঙ্গল বিগ্রহকালিঃ॥
অহং যুগলবারিধিক্ষিতিধরেন্দুমানে শকে
লিলেখ নিখিলজ্বর প্রভৃতিরুগ্বিনিশ্চায়কম্।

† গঙ্গাধরের পুস্তকাবলী অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই সমস্ত শ্লোক সংগৃহীত হইতেছে। অনুসন্ধানের ক্রমহীনতা হেতু কোন কোন পুস্তক অগ্রদৃষ্ট না হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িবে তজ্জন্য ক্রমভঙ্গ দোষ অপরিহার্য্য হইতে পারে, পাঠকগণের নিকট উহা মার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইলে সুখী হইব। লেখক।

গুরোরহনি মাধবে পরিসমাপ্য ত্রিংশন্মিতে
প্রপঠ্য বিধুবারিধিক্ষিতিভূদিন্দুমানে মধৌ ॥
শ্রীগঙ্গাধরদাশশ্য নামধেয়েঽভিধায়িতঃ।
পুস্তকস্যাস্য কর্ত্তা যং স্বামিত্বেনান্যথা নচ ॥

এই শ্লোকে মাধব নিদানের লিখিবার কাল ১৭৪২ শকাব্দা এবং পাঠ পরিসমাপ্তির কাল ১৭৪১শকাব্দার ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং গঙ্গাধর একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাধবনিদান সমাপ্ত করেন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, গঙ্গাধর ষোড়শবর্ষ মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি এবং বাদার্থ ন্যায় প্রভৃতি অষ্টাদশ বর্ষ মধ্যে সমাপ্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। নিদানের টীকা ব্যাখ্যা মধুকোষ লিখিয়া গ্রন্থশেষে তাহার যে সুন্দর অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎসহ কালপরিমাণ উদ্ধৃত হইল--

শুক্তিমুক্তাবলীগুম্ফে গুরুণা যন্ন গুম্ফিতম্।
ময়া সমগ্রমগ্রন্থি তদিদাবা শুদ্ধিমুক্তয়া ॥
গুণনিধিগুরুবন্ধে দাম্নিবাঙ্মালতীনাম্
পরমপরিমলশ্রীধাম্নি লব্ধাবলম্বম্।
স্ফুরতি রচনকন্দং মন্দসৌরভ্যলেশো-
দ্বহনমপি মদীয়ং কিঞ্চিদেতৎ কদাচিৎ ॥
নত্বা শ্রীপুরুষোত্তমাঙ্ঘ্রিজলজদ্বন্দ্বং বিমোদপ্রদম্
শ্রীগঙ্গাধরবৈদ্য এত্য সহসাঽভীতং লিলেখ স্বয়ম্।
ক্ষৌণীবারিধিশৈলভূমিমিলিতে মানে শকে মাধবে
গ্রন্থং রোগবিনিশ্চয়ায়বিবৃতিং স্বীয়াং তু বারে গুরোঃ ॥

এই গ্রন্থের লিপিকাল ও ১৭৪১ শকাব্দার বৈশাখ মাসের বৃহস্পতি-বার লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মাধব নিদানের লিপিকালের সহিত ইহার কেবল "ত্রিংশন্মিতে" র পার্থক্য অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, দুইখানি পুস্তকই একত্র লিখিত হইয়াছিল। সমাপ্তিও বোধ হয় একই দিনে হইয়াছিল। কারণ নিদান অপেক্ষা মধুকোষ বৃহত্তর, যদি মধুকোষের লিপিকাল হইতে নিদানের কাল অল্প হইয়া ৩০ শে বৈশাখ হয় তবে মধুকোষ জ্যৈষ্ঠমাসে শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু মধুকোষ ও বৈশাখের বৃহস্পতিবারে শেষ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়।

বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ।

২। বৈদ্যকসংগ্রহ।

গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র, অন্য কোন ও পরিচয় গ্রন্থে নাই। ইহাতে নানারোগের চূর্ণ, ক্বাথ, তৈল, ঘৃত এবং রস ঘটিত ঔষধ সমূহের উপযোগ-বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে আত্রেয়, চরক, শ্রীবৎস, অমৃতমালা, রসার্ণব ও রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। যোগচিন্তামণি।

হর্ষকীর্ত্তি সুরি এই গ্রন্থের প্রণেতা।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে তীর্থকর ও শ্রীজিনের নামোল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে তিনি জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহা প্রমাণীকৃত হয়। গ্রন্থকারের গুরুর নাম, "শ্রীচন্দ্রকীর্ত্তি"। হর্ষকীর্ত্তি,"সূরীশ্বরপ্রবরসংঘের" "শিরোঽবতংস" স্বরূপ ছিলেন। "তপাগচ্ছীয়ভট্টারক শ্রীহর্ষকীর্ত্তি সূরি' ১৭৫৮ সংবতে বৈদ্যকসারোদ্ধার, যোগচিন্তামণি বা সারসংগ্রহ নামক এই গ্রন্থ আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট, সুশ্রুত, অশ্বিনীকুমার, হারীত, ভৃগু, ভেড়, বৃন্দ, মাধবকর কৃত নিদানও কর্ম্মবিপাক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সারোদ্ধার করিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যোগচিন্তামণি গ্রন্থে সাতটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে রোগ-প্রশমন উপযোগী নানাযোগ প্রকটিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে নানা প্রকার পাক, দ্বিতীয়ে চূর্ণ, তৃতীয়ে গুটিকা, চতুর্থে ক্বাথ, পঞ্চমে ঘৃত, ও ষষ্ঠে তৈল-বিষয়ক যোগ সমূহ আছে। সপ্তম অর্থাৎ মিশ্রকাধ্যায়ে গুগ্‌গুলু, শংখদ্রাবক, গন্ধক, শিলাজতু, স্বর্ণ. তাম্র, বঙ্গ, লৌহ, মাক্ষিক ও মণ্ডূরাদি ধাতু, এবং রস প্রভৃতির শোধনাদি, আসব, অরিষ্ট, প্রলেপ, "মল্লিম" (মলম), রক্তস্রাবন, নস্য, বিরেক, বমন, স্বেদ. গণ্ডূষ, ধূপ, তক্রপানবিধি ও নানা যোগ, কায়চিকিৎসাবিধি, বন্ধ্যাদোষ প্রতীকার, কর্ম্মবিপাক, জ্বর প্রভৃতি রোগের সংখ্যা নির্দ্দেশ, নাড়ী, মূত্র, নেত্র ও মুখ পরীক্ষা, দোষের রাজা (প্রাধান্য নির্দ্দেশ) প্রভৃতি বিষয় প্রকটিত হইয়াছে।

সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের পাঠ প্রসিদ্ধ ও সুখবোধ হইয়া থাকে, বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহারই আদর করিয়া থাকেন, এইজন্য গ্রন্থকার সাধু বিনির্দ্দিষ্ট সেই পুরাতন পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

"শ্রীজিনঃ স শ্রিয়েহস্তু বঃ" এই মঙ্গলাচরণ দ্বারা হর্ষকীর্ত্তি জৈনসম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তিনি প্রচলিত আর্য্যধর্ম্মের বিসংবাদী ছিলেন না, গ্রন্থ মধ্যে তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের "জন্মান্তর" ও "কর্ম্মফল" এই উভয়ের প্রতিই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, ইহাও এই গ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

"জন্মান্তরকৃতং পাপং ব্যাধিরূপেণ বাধতে।
তচ্ছান্তিরৌষধৈর্দানৈর্জপহোমসুরার্চ্চনৈঃ॥
দেবংগুরুং ধর্ময়তাংপাপংকর্ম্ম প্রকুর্ব্বতাং।
যে ভবন্তি মহারোগাস্তেত্বসাধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
* * * *
সাধ্বীংভার্য্যাঞ্চ যো মর্ত্ত্যঃ পরিত্যজন্তি কামতঃ।
গ্রহণীরোগসংযুক্তঃ সদা ভবতি মানবঃ॥
শিবসংকল্প সক্তেন জপেদষ্টোত্তরং শতং॥
* * * *
অগ্নিমান্দ্যংভবেত্তস্য যস্ত্রেতাগ্নিবিনাশকঃ।
গোমাংসখাদকোবাপি মন্দাগ্নির্জায়তে নরঃ।
* * * *
কৃতঘ্নো জায়তে কফবান্ শ্বাসকাসবান্।
* * * *
সংপূজ্য দেবান্ স্বগুরূংশ্চ নত্বা
বস্ত্রাদি ভোজ্যৈঃ পরিতোষয়িত্বা।
আরাধয়িত্বা বিধিনাম্বিকাং চ।
ততঃ পিবেচ্ছুদ্ধ ফলং ঘৃতং চ।
হরিবংশপুরাণঞ্চ শৃণুয়াৎস্বস্ত্রিয়াসহ।
মঙ্গলস্য ব্রতংকুর্য্যাদ্ যথোক্তংরুদ্রযামলে॥
অথবা পয়ো (?) ব্রতং কুর্য্যাদ্‌যথাভাগবতেতথা।
পার্শ্বনাথস্যাম্বিকায়া দশম্যাংব্রতমাচরেৎ॥

হর্ষকীর্ত্তি কিঞ্চিদধিক দুইশতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সময়েও হিন্দু আচার হইতেই জনসাধারণের এক সাম্প্রদায়িকতা ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না; সেই সাম্প্রদায়িকতাও শাক্ত বা বৈষ্ণবের মত পার্থক্যানুরূপই প্রতীতি হয়।

"পার্শ্বনাথস্যাম্বিকায়া দশম্যাং ব্রতমাচরেৎ।"

ইহা দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে সম্প্রদায়বিশেষ হইলেও জৈন প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ হিন্দু হইতে ক্রমে বিভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইয়া পড়িতেছেন, ইহা দেশের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

৪। বৈদ্যামৃত।

বৈদ্যামৃত, ভিষক্ মোরেশ্বর কর্ত্তৃক প্রণীত। মোরেশ্বরের পিতার নাম বৈদ্য শ্রীমাণিক্য ভট্ট। মহস্কদনগর তাঁহার আবাস স্থান। এই গ্রন্থ ১৫০৫ সংবৎসরে বিরচিত হইয়াছিল;—

"যতেঃ শরাকাশশরেন্দুযুক্তে সংবৎসরে··· ··· ··· ··· ··· ···
বৈদ্যামৃতং নাম দধান এষ গ্রন্থঃ স্মরারেঃ কৃপয়া সমাপ্তঃ।"

মোরেশ্বর অতিশয় শঙ্করভক্ত ছিলেন। তিনি চিকিৎসক দিগকে, অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র বিশ্বপতি শঙ্করকেই কেবল কর্ম্মফল সমর্পণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন;

ভো ভো বৈদ্যসুতাঃ শৃণুধ্বমধুনা সৌভাগ্যদং কীর্ত্তিদং।
পাপক্ষালনমত্র তন্ত্র চ হিতং মাস্মংমদীয়ং বচঃ॥
যূয়ং সন্মনসা চিকিৎসিতবিধৌ হিত্বা দুরাশাংদশাং।
ভো ভো বিশ্বপতে স্বমর্পণমিদং ভূয়াদিতি ধ্যায়তাং॥"

এই গ্রন্থে অতিসংক্ষেপে সকল রোগেরই চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৪ অলঙ্কার বা অধ্যায় আছে। গ্রন্থমধ্যে পরাশর, ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, ও চরক প্রভৃতির নাম অভিহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার অতিবিনীত ভাবে নিজ দোষের পরিহার কামনা করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ,
কবিচিন্তামণি, কবিরাজ।

চিকিৎসা কৌশল।

বাহু বিভ্রাট

কোন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পরিবারস্থ একটী মহিলা (গৃহ স্বামীর পুত্র বধূ) গৃহ কার্য্য করিবার সময় বাম হস্ত দ্বারা উপর হইতে কোন জিনিষ নামাইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া ছিলেন। দৈবাৎ স্কন্ধমূলস্থ বাহু-সন্ধির বিপর্য্যয় ঘটাতে তিনি সেই হাত খানা কিছুতেই আর নামাইতে পারিলেন না। অগত্যা কিছু দিন তাঁহাকে দুর্ভাগ্য বশতঃ উর্দ্ধ বাহু সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতে হইয়াছিল। এরূপভাবে উর্দ্ধবাহু থাকিতে বাধ্য হওয়া বিশেষতঃ ভদ্র পুরমহিলার পক্ষে কতদূর যন্ত্রণাদায়ক তাহা বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, গৃহস্বামী পরিচিত অপরিচিত অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহারা বিধিমত চেষ্টাও যথেষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইলনা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্' তিনি বামহাত খানা উর্দ্ধে উঠাইয়া অতি কষ্টে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৃহ স্বামীর দূর সম্পর্কিত একজন আত্মীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত দূরে ছিলেন বলিয়া কয়েক দিন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বিশেষতঃ তিনি ভাল চিকিৎসক হইলেও নিতান্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহাকে পাওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মদ্যপায়ী মাতাল হইলে ও তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য বেশ ছিল। মদ্যের অস্বাভাবিক মত্ততা তাঁহাকে কখনও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। যাহা হউক, গৃহস্বামী লোক পাঠাইয়া পত্রদ্বারা সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে জানাইলেন এবং তিনি অবিলম্বে আসিয়া যাহাতে এ বিপদ হইতে রক্ষা করেন, সে বিষয়ে যথেস্ট অনুরোধ ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র বাহককে চিকিৎসক বলিয়া দিলেন যে "আমি যাইতেছি, তুমি কর্ত্তাকে বলিও আমার একটু বিলম্ব হইবে এবং ওখানে যেন আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হয়"। যথাসময়ে চিকিৎসক উপস্থিত হইলেন। আহার্য্য প্রস্তুত। গৃহ স্বামী ও তাহার অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়গণ সকলে একস্থানেই আহারে বসিলেন। উপস্থিত মত গল্প গুজবে সকলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে রত আছেন, এমন সময় চিকিৎসক বলিলেন,

যে রোগীকে আমি দেখিতে আসিয়াছি, তাঁহাকে বলুন আমাকে কিছু অন্ন দিয়া যান। ভাল হাতে তিনি সম্ভবতঃ আনিতে পারিবেন, তখন অপর হস্ত খানার অবস্থাও আমি কতকটা বুঝিতে পারিব। গৃহ স্বামীর অনুমতি ক্রমে অগত্যা বেচারাকে আসিতে হইল, তিনি ডা'ন হাতে অন্নের থালা ধরিয়া আনিলেন এবং অন্ন সমেত থালা খানা ভুমিতে রাখিয়া চিকিৎসকের পাত্রে অন্ন দিলেন। থালা পুনরায় ডান হাতে লইয়া তিনি যেমন চলিয়া যাওয়ার জন্য ফিরিয়াছেন, অমনি চিকিৎসক ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার আঁচল ধরিয়া ফস্ করিয়া আকর্ষণ করতঃ তাহার দেহের ঊর্দ্ধভাগ (মস্তক) হঠাৎ অনাবৃত করিয়া দিলেন। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন একি! একি! দারুণ নারীসুলভ লজ্জার দায়ে শিথিলবসন ধারণে সন্ত্রস্তা কুলবধূর দক্ষিণ হস্তে ভাতের থালা থাকায় অগত্যা অভ্যাস বশতঃ বাম হস্ত খানা ঊর্দ্ধ হইতে যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে আসিয়া তাঁহার উত্তমদেহ হইতে পতনোম্মুখ শিথিল বসন ধরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অনাবৃত্ত দেহ আবৃত করিল এবং রমণী থালা হস্তে সহজভাবে চলিয়া গেলেন। চিকিৎসক বলিলেন, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কায সহজেই সিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি আরও বলিলেন যে, আপনারা হয়ত আমার এবম্বিধ ব্যবহারে বিশেষ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসকের কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াই এইরূপ উপায় আমাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অন্য সকল রকম চেষ্টা যখন বিফল হইয়াছে তখন এরূপ করা ব্যতীত হাত খানা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার পক্ষে উপায়ও ছিলনা। আপনাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহারাদি করিবার এবং রোগিণীকে ভাত দিবার আছিলায় এখানে আনিবার অন্য কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; সম্ভবতঃ ইহা আপনারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার মাতৃস্বরূপিণী এই রমণীকে এরূপ ভাবে সর্ব্বসমক্ষেও ভীষণ লজ্জার দায়ে ফেলিয়া লোকতঃ আমি নিশ্চয়ই অন্যায় করিয়াছি সেজন্য আপনাদের নিকট আমি বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আশাকরি আপনারা কেহই সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

(প্রেরিত) শ্রীঃ—

দ্রব্য পরিচয়।

(প্রেরিত)

পরমশ্রদ্ধেয়—

শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সম্মান পুরঃসর বিনীত নিবেদন এই—

আপনারা "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" প্রচারিত করিয়া ভারতীয় এক অতি উপাদেয় লুপ্তপ্রায় রত্নের পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প ও তদনুরূপ যত্নপর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সাতিশয় আশ্বস্ত ও পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। বিশেষতঃ এযাবৎ প্রকাশিত বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি দৃষ্টে ভবদীয় উদ্দেশ্যসাধন অতীব আশাপ্রদ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। বঙ্গীয় উদীয়মান কৃতবিদ্য কবিরাজ মহাশয়গণ ও অপরাপর কৃতি-গণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া অধিকতর আশ্বস্ত হইয়াছি। ভগবান আপনাদের শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজসমূহ ভারতবাসীর পক্ষে যে সম্যক্ উপযোগী তাহা সহস্র শিরসিস্বীকার্য্য। সুনির্ব্বাচিতরূপে প্রযুক্ত হইলে "চক্রদত্তোক্ত" বনৌষধিবর্গ মন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া রুগ্নকে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করে। প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন, আয়ুর্ব্বেদ স্রস্টা ঋষিগণপ্রদর্শিত প্রণালীতে ঔষধোত্তোলন, ও যথাবিধি প্রয়োগই দুরূহ ব্যাপার।

বর্ত্তমান সময়ে ধাতব ঔষধাবলী সর্ব্বত্র সুসংশোধিত ও সুজারিত হয়না। সুতরাং এবম্বিধ ঔষধাদি প্রয়োগে বিষময় ফল প্রসূত হয়। অতএব স্বভাবজ ঔষধসমূহ যথাযথ নির্ব্বাচিত ও যথাবিধি ব্যবহৃত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। ঈদৃশানুষ্ঠান স্বল্পব্যয়সাধ্য ও আশানুরূপ ফলপ্রদ।

এতদুদ্দেশ্য সম্পাদনে নৈসর্গিক ভেষজাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদানে ও সংগ্রহার্থ ভৈষজ্যোদ্যানাদি সংস্থাপনে যত্নপর হওয়া সুধীগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঔষধ সমূহের যেরূপ পরিচয় জানিও গোরক্ষকাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যতদূর শিক্ষা করিতে পারি, তৎসমুদয় আয়ুর্ব্বেদ বিকাশে ক্রমশঃ প্রেরণে কৃতসংকল্প রহিলাম। ভারতীয় সর্ব্বজনহিতৈষী মনস্বিদিগকে ও এদিকে সবিনয় আকর্ষণ করিতেছি। আশাকরি,

তাহাঁরা স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফল, ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতে কৃতসংকল্প হইবেন।

আমরা পাড়াগাঁয়ের সামান্যলোক আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব আয়ুর্ব্বেদ বিকাশে সামান্য বর্ণ লিপি প্রেরণ ধৃষ্টতা বা বাতুলতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবেকিনা একটী কথা আছে "সামান্য কিছু নগণ্য নয়,, এবং "তৃণ হতে ও কার্য্য হয় যদি যত্নে রাখে,, বিশেষতঃ কোন বিষয় বিশেষে মানসিক স্বাভাবিক আবেগকে বাধাদিয়া রাখা যায়না; সে তখন নিন্দা প্রসংসার ধার ধারেনা। একমাত্র ইহাই মাদৃশ ক্ষুদ্রধীর লিখনি ধারণের অন্যতম কারণ।

বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণের পরিচয় জন্য অদ্য একটী ঔষধের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—থানকুনি-মণ্ডুকপর্ণী, ভেকী, মণ্ডূকী, মূলপর্ণী, মণ্ডূক-পর্ণিকা, এ অঞ্চলে কেহ ২ ইহাকে ইন্দুরকাণী ও বলে; সাধারণতঃ এখানে ইহাকে "আদামননী" বলে। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ইহা মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, লঘুপাক, সারক, কাসনাশক। পাতা বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠ, উপদংশ, নালীঘা ও চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারক। (ক্রমশঃ)

পোঃ চাকারিয়া, গ্রাম কাক্‌রা চট্টগ্রাম। } একান্ত বিনয়াবনত— শ্রীনবীনচন্দ্র দে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সুধানিধি।

সর্ব্বোপযোগী হিন্দী বৈদ্যক সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ-প্রসাদ শুক্ল বৈদ্য, প্রয়াগ। বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। আকার রয়েল অষ্টাংশিত ৪০ পৃষ্ঠা। আমরা এই উৎকৃষ্ট মাসিক খানা কয়েক মাস যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। ৪র্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (সংবৎ ১৯৭১-চৈত্র) আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি ও সুধানিধি আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ অপেক্ষা বর্ষীয়ান্ তথাপি আমরা সহযোগীর একটু পরিচয় পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিলে বোধ হয় ধৃষ্টতা হইবেনা। হিন্দী ভাষায় আমাদের তেমন অধিকার না থাকিলেও যতদূর বুঝিতে

পারিয়াছি, তাহাতে বড়ই আশন্বিত হইয়াছি, এইরূপ পত্রিকা দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে এই হিন্দীর আদর নাই। অনেক উপাদেয় তত্ত্ব আমাদের সম্মুখ দিয়া ভাষিয়া যাইতেছে, আমরা উহার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছি।

এই সংখ্যায় ষোলটি বিষয়ানুক্রম, তন্মধ্যে 'সেবাসে মেবা' (শুভানুষ্ঠানের সুফল) আয়ুর্ব্বেদকা অনাদিত্ব, প্রাণিজ ঔষধি, অনুভূতপ্রয়োগ (প্রত্যক্ষফল ঔষধ), রসায়নসার, ডেঙ্গুজ্বর ও কালাঘুংঘচী (সচিত্র বনৌষধি দ্রব্য ও তাহার গুণ) এই কয়টী প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রবন্ধ গুলি সময়োপযোগী ও উত্তম। এই বৈদ্যক মাসিকপত্রে এমন দুই একটি অবান্তর বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা না থাকিলেই সুশোভন হইত।

প্রবীণ সুধানিধি সদা স্বস্থ থাকিয়া স্বাস্থ্যসুধা আহরণ ও বিতরণ করিতে থাকুন, ইহাই আমাদের কামনা।

কাশ্মীরী কুঙ্কুম।

আমরা কুঙ্কুম সম্বন্ধে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। বাজারে যে সমুদয় কুঙ্কুম পাওয়া যায়, সে সমুদয়ই বিলাতী ; কাশ্মীরী কুঙ্কুম সচরাচর পাওয়া যায় না এবং উহার প্রাপ্তিস্থান ও অনেকেই অবগত নহেন, সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা কাশ্মীরী কুঙ্কুমের ঠিকানা দিতেছি ঃ—"ম্যানেজার কাশ্মীর-ষ্টোর্স্, শ্রীনগর"। (Kashmir Stores, Srinagar.) ইংরেজী অথবা হিন্দী ভাষায় পত্র লিখিতে হইবে। কুঙ্কুমের হিন্দী নাম "কেসর" এই শব্দটি দেবনাগর অক্ষরে বা ইংরেজীতে লিখিত হওয়া উচিত। ভরসা করি কবিরাজবৃন্দ এখন হইতে বিলাতী কৃত্রিম ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ব্যবহার না করিয়া দেশীয় সর্ব্বোত্তম কাশ্মীরী কুঙ্কুমই ব্যবহার করিবেন। আমরা উক্ত স্থান হইতে কুঙ্কুম আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাই অকৃত্রিম অত্যুত্তম জিনিস। ইহার সঙ্গে বিলাতী কুঙ্কুমের তুলনাই চলেনা। ঔষধ ও খাদ্য দ্রব্যে এই দ্রব্য ব্যবহার করিয়া ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য রক্ষা করুন। প্রতি তোলার মূল্য ১৲ এক টাকা।

চিত্র পরিচয়।

বিগত বৈশাখ মাসের আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশের মুখপত্রে যে চিত্রখানা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিকপত্র "সুধানিধি" পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সুধানিধি সম্পাদক পণ্ডিত জগন্নাথপ্রসাদ শুক্ল বৈদ্য মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক উক্ত চিত্রফলক (Half tone Block) খানা প্রেরণ ও আয়ুর্ব্বেদবিকাশে মুদ্রণের অনুমতি প্রদান করায় আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

চিত্রপরিচয় সম্বন্ধে উক্ত সুধানিধি পত্রে হিন্দীভাষায় যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহারই স্থূলমর্ম্ম এস্থানে প্রকাশ করিলাম :—

"এই উৎকৃষ্ট চিত্রখানা আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ভগবান্ চরকাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। অনেকে অবগত আছেন, মহর্ষি চরক 'শেষাবতার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি পৃথিবীর রোগক্লিষ্ট জীবগণের প্রতি দয়া বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের প্রচার এবং তাহার সাহায্যে লোকদিগকে নীরোগ করিবার বলবতী শুভেচ্ছা প্রাণোদিত হইয়াই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি স্বর্গপতি ইন্দ্রের নিকট সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ঋষিসঙ্ঘে তাহা প্রচার করেন এবং চরক সেই ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সঙ্কলন কিরিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করেন। প্রয়াগে যে ভরদ্বাজ আশ্রম আছে, সেখানে তাৎকালিক অবস্থার স্মরণবোধক চরকাচার্য্যের এক মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্তও অবস্থিত রহিয়াছে। শেষনাগমধ্যস্থ এই মূর্ত্তি তাহারই অলোক চিত্র (ফটোগ্রাফ) হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। চরক শেষাবতার এজন্য শেষনাগ বা অনন্তদেবের কল্পিত চিত্র উহাতে সংযোজিত হইয়াছে মাত্র। সিহোরা নিবাসী পণ্ডিত নিরঞ্জনলাল শুক্ল মহোদয় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া প্রতিমূর্ত্তির ফটো সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় তাঁহার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি। পোঃ সিহোরা, জেলা জব্বলপুর ঠিকানায় উক্ত মহাশয়ের নিকট হইতে আট আনা মূল্যে যে কেহ চরকাচার্য্যের ফটো আনয়ন করিতে পারেন"। *

---

* দুই আনার টিকেট পাঠাইলে উপরি উক্ত মুদ্রিত চিত্র আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয় হইতেও ঘরে বসিয়া পাইতে পারেন।

"প্রাণোবা অমৃতম্।" (শ্রুতি)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥ বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২১ { ৩য় সংখ্যা।

পাপের রোগ-সংজ্ঞা।

মানুষের দুইটি প্রধান স্পৃহনীয় বিষয় আর দুইটি বর্জ্জনীয় দেখা যায়, তাহারা একটি চায় স্বর্গ বা সুখ, আর একটি চায় স্বাস্থ্য বা আরোগ্য। বর্জ্জনীয় বিষয়ের একটি নরক বা দুঃখ। অপরটি রোগ বা অস্বাস্থ্য। এই সকলের লাভ কিংবা বর্জ্জনের নিমিত্ত মানুষ কতকগুলি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়, সেই ধর্ম্মদ্বারাই উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের একটি নাম পুণ্য। ইহার বিপরীত নাম অধর্ম্ম বা পাপ। ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ বা সুখ এবং অধর্ম্ম দ্বারা নরক বা দুঃখ লাভ হয়। এই সকলের আবার বহু প্রকারভেদ বিদ্যমান আছে।

স্বর্গ ও নরক বলিলে পারলৌকিক শান্তি বা অশান্তির কথাই যেন বুঝা যায়। দুঃখ ও রোগ বলিলে ইহলৌকিক কষ্টের কথাই মনে হয়। এই চারিটি কথাকে গভীর ভাবে বুঝিতে গেলে দু'টি কথাই যে প্রকৃত বলিয়া ধারণা হয়। অর্থাৎ স্বর্গ বা সুখ—স্বাস্থ্য বা আরোগ্য একটি কথা, আর নরক বা দুঃখ—রোগ বা অস্বাস্থ্য এই দু'টি কথা। তবেই—স্বর্গ, সুখ, স্বাস্থ্য, আরোগ্য এই চারিটি শব্দ এবং নরক, দুঃখ, রোগ, অস্বাস্থ্য এই চারিটি শব্দ

এক এক পর্য্যায়ে পরিণত হইয়া পড়ে। শাস্ত্রবাক্যেও আমরা এই সূক্ষ্ম বিচারের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যথা—"স্বর্গং সুখম্—"সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেবচ।" স্বর্গ বলিয়া যা কিছু তাহার মূলই সুখ, সেই সুখই আরোগ্য, তাহার বিপরীত বিকার অর্থাৎ রোগ, রোগই দুঃখ নামে অভিহিত। ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য-পাপও উহাদেরই নামান্তর। আমরা কিন্তু সময় সময় ইহার ব্যাখ্যা করিতে ভুল করিয়া থাকি। সেই ভুল স্বর্গে ও সুখে, পাপে ও রোগে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান। স্বর্গকে বুঝিতে যাইয়া সুখ এবং পাপকে বুঝিতে যাইয়া রোগকে ভুলিয়া যাই। কেন এরূপ হয়, প্রকৃত পক্ষেই উহারা এক অথবা ভিন্ন, তাহাই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লওয়া যায়। এক বিশিষ্ট জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী আর সাধারণ। প্রথম শ্রেণীর মানব লৌকিক জ্ঞানের ফলে অভিনব আবিষ্কৃত পন্থা ধরিয়াই বিচরণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ইহার সন্ধান পাইতে পারে না, তাহারা চক্ষুর সম্মুখে যে পন্থা সহজ বলিয়া বোঝে তাহা ধরিয়াই অনর্গল চলিয়া থাকে। এই উভয় শ্রেণীর লোকই কিন্তু স্বর্গকে—সুখকে পাইবার নিমিত্ত অন্তরে কামনাশীল। তাহার মধ্যে প্রভেদ এই, কেহ আপাত দুঃখকে দলন করিয়াও স্থায়ী অনাবিল সুখের প্রত্যাশী, আর কেহ আপাতমনোরম স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াই কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। ইহার মধ্যে আবার একটু বৈচিত্র্য আছে, অনেকে পার্থিব সুখ দুঃখকে, সুখ দুঃখ বলিয়া স্বীকার করেন না, পারলৌকিক সুখবাসনায়ই তাঁহারা মত্ত। কেহ কেহ পার্গিব সুখেরই উত্তর-কালজ স্থায়ী সুখ কামনায় আপাতত কষ্টকেও কষ্ট মনে করেন না। কাহারো কাহারো দু'টি অর্থাৎ ইহ-পারলৌকিক স্থায়ী সুখের প্রতিই একান্ত লক্ষ্য থাকে।

কষ্ট ব্যতীত কেহই প্রকৃত কোন সুখেরই আস্বাদ পাইতে পারে না, ইহা যেমন নিশ্চিত, তেমন আপাত সুখলিপ্সুগণের দুঃখ দুর্দ্দশাও অনিবার্য্য। আমরা অপার্থিব সুখ-দুঃখ বিষয়ে আলোচনা করিব না, কেবল জীবিত কালের সুখ দুঃখ বা পাপ পুণ্য কি, তাহাই একটু বিবৃত করিব।

মানব তাহাদের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছে—সুখ দুঃখ জ্ঞানকৃত

বা অজ্ঞান কৃত কর্ম্মফলেই ভোগ হইয়া থাকে। সুখের যে আরোগ্যসংজ্ঞা এবং দুঃখ কে যে রোগাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, এ দু'টিও জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কর্ম্মফল মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই কর্ম্মফলের কথা প্রকারান্তরে বলিয়াছেন—"—হেতুঃ—ত্রিবিধো বা অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ প্রজ্ঞাপরাধ পরিণামভেদাৎ, তত্র অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ অযোগাতিযোগ মিথ্যা-যোগযুক্তা রূপরসাদয়ঃ। প্রজ্ঞাপরাধো মিথ্যাজ্ঞানাদিঃ। পরিণামোহ-যোগাদিযুক্তা ঋতু স্বভাবজাঃ শীতাদয়ঃ। অধর্ম্মস্তচ রোগ হেতোরত্রৈবান্ত-র্ভাব ইতি তস্যাপি কালান্তরপরিণতস্য দুঃখকর্তৃত্বাৎ।—রোগকারণ-ত্বেনাধর্ম্মস্য সর্ব্বথা সিদ্ধত্বাৎ।" রোগের হেতু তিন প্রকার বলা হইল। অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের—যাহা দ্বারা আমরা সুখলাভ করিয়া থাকি, তাহাদের একান্ত প্রয়োজনের অভাব অথবা অতিবাহুল্য মাত্রায় লাভ কিংবা অযথা ভাবে তাহার গ্রহণ; ইহার নামই অযোগ-অতিযোগ-মিথ্যাযোগ। দৃষ্টান্ত—যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহারের অভাব অথবা তাহাই প্রয়োজনাতিরিক্ত সেবন কিংবা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া দেশ, দেহ, সময় সংযোগাদির বিরুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার। রূপরসাদি যাবতীয় বস্তুকেই ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ রসাদিকে বাস্তবই ধর বা আধ্যাত্মিকই ধর—কোন দোষ নাই। তুমি প্রত্যক্ষতঃই বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছা যাও বা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নবিভ্রমেই তোমাকে বিহ্বল করুক, ফল সমানই। তুমি সুরূপ দেখিয়া সুখানুভব করিতে পার, কিন্তু তাহাই অতিমাত্র দর্শনে তোমার মনোমোহ উপস্থিত হইয়া মত্ততা আসিতে পারে। তুমি মধুর অমৃত-ফলের রসাস্বাদনে যেমন আরাম উপভোগ করিতে পার, তেমন ভক্তি বাৎসল্যের সুধাভোগেও অনুপম তৃপ্তি না হইতে পারে এমন নহে। মধু একান্ত সেবনে যেমন দাহ দৈন্য আসিতে পারে, বৃথা ভক্তি বাৎসল্যেও তুমি হতজ্ঞান না হইতে পার এমন নহে। তবেই দেখ, রূপরসের মধ্য দিয়াও মানবকে কত সুখ দুঃখের পাক সহ্য করিতে হয়, যদি তাহা একটুমাত্রও আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া পড়ে। মানব সুখ দুঃখের হাত এড়াইতে পারে না সত্য, কিন্তু চেষ্টার ফলে অনেকটা করায়ত্ত করিয়া লইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপরাধ, ইহার স্থূলার্থ মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি, শাস্ত্র যথা—

ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্মযৎ কুরুতেঽশুভম্।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপণম্॥

অর্থাৎ বুদ্ধি, ধারণা ও স্মৃতিশক্তি বিরহিত হইয়া যে সমুদয় ন্যায়-বিগর্হিত কর্ম্ম করা যায় তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ, ইহা সর্ব্বদোষের আকর। হয় তোমাকে নিজ বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুভফল লাভ করিতে হইবে, অথবা প্রাজ্ঞজনের প্রদর্শিত পন্থানু-সরণ করিয়া চলিতে হইবে। যখনই দেখিবে কর্ম্মের ফল অশুভ হইতেছে, তখনই বুঝিবে নিজ বুদ্ধি-সামর্থ্যের ত্রুটী হইয়াছে অথবা পরিচালকের উদ্দেশ উপযুক্ত হয় নাই। তখনই কর্ম্মটি সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তুমি বিচার শক্তিতে স্থির করিলে কিংবা কেহ উপ-দেশ করিল—নিরামিষ আহার তোমার উপযোগী, বেশ, তুমি তাহাই গ্রহণ করিতেছ। যদি দেখিতে পাও, দিনদিন তোমার দেহ মনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে—বুঝিবে ঠিক পথ ধরিয়াছ, আর তাহার প্রতিকূল অবস্থা বুঝিলে মনে করিতে হইবে নিরামিষ তোমার দেশ-প্রকৃতির প্রতিকূল কিংবা অন্য কোন অপরাধ করিতেছ যাহাতে শুভ ফলের বিঘ্ন ঘটিতেছে। তখনই প্রতিকারের পন্থা খুঁজিতে হইবে।

তৃতীয় পরিণাম—ইহা কালানুরূপ ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ—দিবারাত্রি ঋতু প্রভৃতির বিরুদ্ধাচরণ। যেমন দিবার কার্য্য রাত্রিতে অথবা রাত্রির কার্য্য দিবাতে করিলে কিম্বা শীতকালে গ্রীষ্মানুযায়ী এবং গ্রীষ্মে শীতোপযোগী অনুষ্ঠান করিলে পরিণামে দুঃখ বা রোগ অনিবার্য্য। এজন্য তোমাকে প্রকৃতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। শাস্ত্রকার যদিও এই পরিণাম মধ্যেও অধর্ম্মের রোগ-হেতুত্ব কল্পনা করিয়াছেন, যেহেতু অধর্ম্ম করিলেও তাহা সময়ান্তরে রোগ বা দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মবিচার করিলে দেখা যায়, রোগোৎ-পত্তির উক্ত ত্রিবিধ কারণই অধর্ম্ম। অসাত্মেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই তিনটীই মানবের অধর্ম্মমূলক। এইটিই ঠিক, অধর্ম্মেই দুঃখ—রোগ, তাহাই পাপ। ধর্ম্মেই সুখ স্বাস্থ্য—তাহাই পুণ্য ও পবিত্রতা।

ধর্ম্ম কোথায়, পবিত্রতা কি, তাহা কি আমরা বুঝি? ধর্ম্মের নামে আমরা অধর্ম্ম করি—রোগে দুঃখে জর্জ্জরিত হই, পবিত্রতার নামে অপবিত্র অপদার্থের সেবা করিয়া থাকি, স্বর্গকেও নরক করিয়া তুলি। এ বড় বিষম বিপাক! (ক্রমশঃ)

আহরণ।

১। ক্ষুধা ও অগ্নিমান্দ্য।

(হিন্দীর অনুবাদ)

ক্ষুধা দুই প্রকার; এক স্বাভাবিক, অপর কৃত্রিম ক্ষুধা। ভাঙ্গ বা কোন গরম ঔষধ খাইলে এবং অন্যান্য অনেক কারণে কৃত্রিম ক্ষুধার আবির্ভাব হয়, বস্তুতঃ উহাকে প্রকৃত ক্ষুধা বলা যায় না। প্রকৃত ক্ষুধা—মিতাহার, মনের অনুকূল কার্য্য—ব্যবসায়, সম্পূর্ণ নিদ্রা, ব্যায়াম প্রভৃতি দ্বারা স্বাভাবিকরূপেই উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। কৃত্রিম ক্ষুধার কোন সময়েই নিবৃত্তি থাকে না, সকল সময়ই আহারের অন্বেষণে ব্যস্ত রহে। যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য আছে, তাহারা কিছুদিন উষ্ণবীর্য্য ঔষধাদি সেবন করিলে ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধিপায় সত্য, কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহা পূর্ব্বাপেক্ষাও মন্দীভূত হইয়া পড়ে। উত্তেজক দ্রব্যমাত্রই অতিশীঘ্র পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া যে কৃত্রিম ক্ষুধা উৎপন্ন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ক্ষুধা বা পরিপাক ক্রিয়া সহসাই অতি দুর্ব্বলাবস্থায় আসিয়া পড়ে। কৃত্রিম ক্ষুধা দ্বারা লোক অতিমাত্রায় আহার গ্রহণ করে। এক পোয়া দুধ হজমের শক্তি না থাকিলেও সে একসের দুধ খাইতে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করে না। ইহার ফলে ক্রমশঃ অগ্নি দুর্ব্বল ও দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং পরিণাম ভয়াবহ হইয়া উঠে। উত্তেজক (ভাঙ্গ প্রভৃতি) দ্রব্য ব্যবহার করিয়া যাহারা পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাদের মস্ত ভুল, যে হেতু উহাদ্বারা পরিণামে পরিপাক ক্রিয়ার বিষম ব্যাঘাত ঘটে। কেবল উত্তেজক পদার্থ—ঔষধাদি দ্বারা ক্ষুধা বাড়ান এবং আপন হাতে আপন পায়ে কুঠারাঘাত করা সমান অনিষ্ট

জনক। আমাদের ইহাই উত্তম বলিয়া মনে হয় যে, যে কোন কারণেই ক্ষুধামান্দ্য ঘটুক না কেন, সেই অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে স্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মানের উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১। এজন্য সর্ব্বপ্রথম মিতাহারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই আহার শস্যপ্রধান (নিরামিষ) ও অবান্তরহীন অর্থাৎ সাদাসিধা হওয়া উচিত। (বহুদ্রব্য একত্র ভোজন না করাই ইহার উদ্দেশ্য)। যে পরিমাণ আহার উপযুক্তরূপে জীর্ণ হইতে পারে, তাহার চেয়েও কম খাইতে হইবে, ইহা যেন ভুল না হয়। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে দুইবার কি তিন বারের অধিক যেন ভোজন না পড়ে। আর একটি কথা—কেবল অল্পাহার করিলেই চলিবে না, সেই অল্প আহার্য্যও বেশ চিবাইয়া খাইতে হইবে। মধ্যাহ্নে যে অল্প আহারও করা যায়, তাহা রীতিমত চর্ব্বিত না হইলে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহা উপযুক্তরূপে জীর্ণ ও রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না। সেই আহারই বেশ চিবাইয়া খাইলে রাত্রির আহারের সময় তাহা বেশ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত ক্ষুধাবৃদ্ধি করিবে। ভোজনের গ্রাস কখনও বড় করিবে না, গ্রাস ছোট হইলে উহা চিবানের পক্ষে যথেষ্ঠ সুবিধা হইয়া থাকে। এই কথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ আহার রীতিমত চর্ব্বিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক একথা সকলেই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন। বাজারের প্রস্তুত কোন খাদ্যদ্রব্য কিংবা কোন কাঁচা বস্তু একবারেই খাইবে না। যে পরিমাণ খাদ্যে পেট পূর্ণ হয়, তদপেক্ষা অনেকটা স্থান খালী থাকে, এমন ভাবে আহার করাই উচিত। যেদিন দেখিবে আহারে তেমন ইচ্ছা হইতেছে না, সেদিন এক-বারে উপবাস করিবে। বেশ ক্ষুধা ও অগ্নির বল না থাকিলে দুধ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই খাওয়া উচিত নহে। চা প্রভৃতি ব্যসন (অতিমাত্র অভ্যাস) একবারে ত্যাগ করিবে। খুব ক্ষুধা বোধ হইলে কোন লঘুদ্রব্য অল্প করিয়া খাওয়া যায়। অধিক ঘৃত তৈলাদিযুক্ত খাদ্যও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহপদার্থ ক্ষুধারহিত ও মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির একবারেই উপকারী নহে।

ক্ষুধাবৃদ্ধি ও অগ্নিমান্দ্য দূর করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য পরিত্যাগ ও যে সমুদয় নিয়মপালন করিতে বলা হইল, ইহা দ্বারাই বেশ ফল পাওয়া যাইতে পারে, যদি কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে ইহাতেও তেমন ফল হইতেছে না তখন একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থামত কিছুদিন ঔষধ সেবন করাও মন্দ নহে। ক্ষুধাবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন উত্তেজক ঔষধের সহায়তা না লওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

২। মনের অনুকূল কার্য্য।—মনোমত কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে মন বেশ প্রফুল্ল থাকে, দিনটি আনন্দে কাটিয়া যায়, পরন্তু ভুক্তদ্রব্য রীতিমত পরিপাক পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এরূপ হইলে, সময় মত স্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মে। কোন কার্য্য না করিয়া অলস ভাবে দিন কাটাইলে অথবা মনকে বিষণ্ন রাখিলে, সর্ব্বপ্রকারেই বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

৩। নিদ্রা।—যথোপযুক্ত নিদ্রা উত্তম পরিপাক ক্রিয়ার এক প্রধান সহায়, ইহাদ্বারাও স্বাভাবিক ক্ষুধা উৎপন্ন হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য (অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণাদিগ্রস্ত) ব্যক্তির দিবসেও এক আধ ঘণ্টা নিদ্রা কিছুমাত্র অপকারী নহে।

৪। ব্যায়াম।—রীতিমত পরিশ্রম বা ব্যায়াম কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিবার এক প্রধানতম উপায়। পরিশ্রমদ্বারা মানুষের নানা মঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। একদিকে শরীরের সমস্ত অংশ যেমন সুদৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হয়, অপর দিকে জীবনের অশেষবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমও স্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মানের এক অমোঘ উপায়।

উপসংহারে সংক্ষেপতঃ বক্তব্য এই যে, স্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মানের জন্য প্রথম কয়েকদিন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ফলের জন্য উপরোক্ত আহার বিহারের স্বাভাবিক নিয়মগুলিই পালন অবশ্য কর্ত্তব্য, এই সকল নিয়ম যেমন ক্ষুধা ও অগ্নি-বর্দ্ধক তেমনই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে মহা উপকারী।”

"হিন্দী বৈদ্যকল্পতরু" (আহমদাবাদ)।

২। যক্ষ্মা চিকিৎসা।

যক্ষ্মা রোগের ঔষধ চিকিৎসা-বিধি লিখিবার পূর্ব্বে রোগীর সাত্ম্য, দেশ এবং আহার বিহারের সংক্ষেপ বর্ণন করা যাইতেছে।

যদি রোগীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়, তাহা হইলে যক্ষ্মারোগীর সম্পূর্ণ অনুকূল দেশ অর্থাৎ যেখানে স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি হইতে পারে, এমন স্থানে বাস করাই কর্ত্তব্য। যে রোগী বলযুক্ত এবং শীত সহ্য করিতে সক্ষম, তাহার পক্ষে গ্রীষ্ম ঋতুতে উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করাই উত্তম। কিন্তু উচ্চপ্রদেশ হইতে সহসা শীত প্রধান স্থানে যাওয়া উচিত নহে, হঠাৎ শীত পাইলে রোগীর কষ্ট ও রোগ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং উষ্ণ স্থান ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া শীতলতর স্থানে বাস করিবে। আর একটি কথা এই, যে রোগীর প্রবল জ্বর বিদ্যমান, রক্ত সঞ্চালনের

ক্রিয়া মন্দগতি, হৃদয় দুর্ব্বল এবং রোগ বাতপ্রধান, তাহার পক্ষে এইরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে। যেহেতু, শীত এই সকল অবস্থার অনুকূল নহে বরং বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা। শীত যাহাদের সহ্য না হয়, তাহাদের পক্ষে উষ্ণ অথচ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ যেখানে অধিক শীত বা অধিক উষ্ণ বোধ না হয়, এমত স্থানই বাসের জন্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। যদি রোগের আরম্ভ হইতেই প্রবল জ্বর সর্ব্বদার জন্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রভ্রমণই তাহার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। রোগীর অবস্থা ইহার উপযুক্ত না হইলে, স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া সমুদ্রাদির নিকটবর্ত্তী এমন স্থানে থাকা আবশ্যক, যেখানকার বায়ু অতি বিশুদ্ধ থাকে এবং ভূমি আর্দ্র না হয়।

প্রত্যেক যক্ষ্মারোগীর জন্যই বিশুদ্ধবায়ুবিশিষ্ট উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। বাসস্থানে রীতিমত সূর্য্যের আলোক পতিত হইতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বহু জনাকীর্ণ সহর বন্দরে বাস করা কখনই উচিত নহে। স্থান পরিবর্ত্তন কালে এইটুকু দেখিতে হইবে, যেন স্বস্থান পরিত্যাগ জন্য তাহার ক্ষোভের সম্ভাবনা উপস্থিত না হয়। বিদেশে যাইতে যাহারা একান্ত 'নারাজ', তাহাদিগকে গৃহেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বিধিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। রীতিমত বায়ু ও সূর্য্যালোক চলাচল করিতে পারে, স্থানটি আর্দ্র না হয়, সেই মত ব্যবস্থা করিবে। রোগীর গৃহ বেশ শুষ্ক হইবে, সূর্য্যাতপ প্রবেশের জন্য খুব বড় বড় জানালা বা দরজা থাকা আবশ্যক। বায়ু একবারে রূক্ষ হওয়া উচিত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ থাকা চাই, নতুবা অতিরূক্ষ বায়ুতে কাসের বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে পরে রক্ত-নিষ্ঠীবন হওয়ারও সম্ভব। যদি সম্ভব হয় তবে রাত্রিতে যে গৃহে থাকিবে দিনে সেই গৃহে রোগীকে না রাখিয়া ঐ গৃহের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিবে, যাহাতে রীতিমত আলো ও বায়ু দ্বারা ঘরটি বিশুদ্ধ হইতে পারে। এরূপ গৃহেই রাত্রিতে বাস করা আরোগ্যের অনুকূল। রোগীর ব্যবহার্য্য বস্ত্র শয্যাদি এরূপ হইবে যাহাতে শরীরের শীতোষ্ণতা রক্ষিত হইতে পারে। পরিধেয় বেশ শুভ্র ও পবিত্র হইবে, উহা আর্দ্র বা ঘর্ম্মাদি দ্বারা মলিন না হয়। বস্ত্র ঘর্ম্মাক্ত হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবে। কাপড় মোটা এবং কষ্টদায়ক না হয় সেরূপই পড়িবে। (ঔষধ ও চিকিৎসাবিধি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)

"বৈদ্যভূষণ" (লাহোর)।

দেশীয় পথ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তরুণ কিংবা মধ্য জ্বরের কোন অবস্থাতেই দুগ্ধ পান করা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। যথা—

জীর্ণ জ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরংস্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥

জ্বরের যে অবস্থায় রোগীর লালাপ্রসেক, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, প্রলাপ, আলস্য, শরীরের গুরুতা, অজীর্ণ, মুখের বিরসতা, এবং জ্বরের প্রবলতাপ প্রভৃতি রসসামতার লক্ষণ বিদূরিত হইয়া জ্বরের মৃদুতা, শারীরিক কৃশতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষুৎপিপাসার প্রাবল্য এবং প্লীহাবিবর্দ্ধনাদি জীর্ণ জ্বরের লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই সময়, জ্বরারম্ভের দিন হইতে তিন সপ্তাহ অতীত হইলে দুগ্ধ হিতকর। যথা—

চতুর্গুণেনাম্ভসা বা শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ সদ্যো বাতপিত্ত জ্বরং জয়েৎ॥
দাহতৃষ্ণা পরীতস্য বাত পিত্তোত্তরং জ্বরম্।
বদ্ধ প্রচ্যুত দোষং বা নিরামং পয়সা জয়েৎ॥

(চরক—চিকিৎসা স্থান)

চারিগুণ জলে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিলে পুরাতন জ্বরের অবস্থা ভেদে উপকার হয়।

গোদোহন করিবার সময় তৎক্ষণাৎ সেই উষ্ণ দুগ্ধ সেবন করিলে, পুরাতন বাতপিত্ত জ্বর প্রমশিত হয়।

দাহ ও তৃষ্ণাপীড়িত বাতপিত্ত জ্বরীর কোষ্ঠ কঠিন থাকুক কিংবা সরলই থাকুক, নিরাম অবস্থায় পরিণত হইলে, দুগ্ধ সেবন দ্বারা তাহার প্রশমন করাইবে। এই দুগ্ধও চতুর্গুণ জলে জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া সেবন করা আবশ্যক।

এই সকল উপদেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবল মাত্র পুরাতন বাতপিত্ত জ্বরেই অবস্থা বিশেষে দুগ্ধ প্রশস্ত পথ্য, কিন্তু বাতশ্লেষ্ম কিংবা পিত্ত-

শ্লেষ্মজ্বরের পুরাতন অবস্থাতে ও দুগ্ধ হিতকারী পথ্য বলিয়া কোন বিশেষ উপদেশ পাওয়া যায়না। পক্ষান্তরে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে, আর্য্য ঋষিগণ জ্বর পীড়াতে কোন অবস্থাতেই দুগ্ধের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন না। কেননা অধিকাংশ স্থলেই দেখাযায়, জ্বরিত ব্যক্তির প্রকুপিত দোষত্রয়ের অংশাংশ কল্পনায় তত্তৎ দোষ প্রশমক এবং উপসর্গ নাশক জ্বরঘ্ন দ্রব্যাদির সহিত দুগ্ধের সংস্কার করিয়া পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজকাল অনেকেই সুখসেব্য পথ্যের পক্ষপাতী। চিকিৎসাক্ষেত্রেও অনেকে সুখসেব্য ঔষধাদি অনুসন্ধান করেন, এহেন সুখপরতন্ত্রযুগে বিবিধ তিক্ত কষায় দ্রব্যাদিসংস্কৃত বিস্বাদ দুগ্ধকে পথ্য শ্রেণীভুক্ত না করিয়া ঔষধ শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে। নিম্নে কতিপয় জ্বরঘ্ন সংস্কৃত দুগ্ধের প্রস্তুত পদ্ধতি লিখিত হইল।

১। কিসমিষ ১ তোলা, হরিতকী ১ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করত সেবন করনান্তর পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী চতুর্গুণ জলে শৃত দুগ্ধ পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া পুরাতন জ্বরের নিবৃত্তি হয়।

২। উদ্ধৃত নিয়মানুযায়ী কিসমিসের ক্কাথ অর্দ্ধ পোয়া সেবনান্তে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে পুরাতন ক্ষয় জনিত জ্বর দূরীকৃত হয়।

৩। এরণ্ড মুল ১ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা, জল ৩২ তোলা, একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করনান্তর ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিলে পরিকর্ত্তিকা (অর্থাৎ পেটে কর্ত্তনবৎ পীড়া) যুক্ত জ্বর ও কর্ত্তনবৎ পীড়ার উপশম হয়।

৪। বাইরকলী, গোক্ষুর, কণ্টকারী, শুণ্ঠী ও বৎসরাতীত পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য সমষ্টি ১ তোলা দুগ্ধ ৮ তোলা, জল ৩২ তোলা, একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে অবতারণ করতঃ পান করিবে, ইহাতে মল মূত্রের বদ্ধতা, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

বিধানজ্ঞ কালবিদ্ বৈদ্য দেশ কাল পত্রানুযায়ী পথ্যাদি যোজনা করিবেন রোগীর উপসর্গাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবিধ জ্বরঘ্ন দ্রব্যের সহিত দুগ্ধের সংস্কার করতঃ পথ্য নির্দ্দেশ করিবেন।

যথা—পেয়ং তদুষ্ণং শীতংবা যথাস্বং ভেষজৈঃ শৃতম্।

ক্ষীর পাকের সাধারণ বিধি—

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষ কর্ত্তব্যং ক্ষীরপাকেত্বয়ং বিধিঃ॥

যেই দ্রব্যের ক্ষীর পাক করিতে হইবে তাহার আটগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের চারিগুণ জল সহ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে। যেমন শুণ্ঠী ১ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক জ্বরিতব্যক্তি বিকাল বেলা অথবা রাত্রিতে অবস্থানুযায়ী বল্কা অর্থাৎ অল্প আবর্ত্তিত দুগ্ধের সহিত, সাগু, বার্লী সিদ্ধকৃত সুজি বা রুটীর ব্যবহার করিয়া থাকেন। একটু হিসাব করিয়া দেখিলে ইহা জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে দূরে থাকুক সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও সুপথ্যরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত নহে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে দুগ্ধ বেশী সময় অগ্নি সন্তাপে আবর্ত্তিত হইলেই তাহার বীজ দোষাদি বিদূরিত এবং দুগ্ধের সাধারণ অম্ল বিপাকত্ব দোষের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প আবর্ত্তিত অর্থাৎ বল্কা দুগ্ধে অগ্নি সন্তাপের অল্পতা নিবন্ধন দুগ্ধের সাধারণ দোষের কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না। পক্ষান্তরে নির্জ্জলাবস্থায় অধিক সময় জ্বাল দিলে দুগ্ধ ঘনত্বে পরিণত হইয়া গুরুপাক হয়, এমন অবস্থায়, কি সুস্থ, কি রুগ্ন, লঘু পাক দুগ্ধ সেবন প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই চতুর্গুণ জলসহ আবর্ত্তিত দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ দুগ্ধ পানের স্থূল সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে—

বর্জ্জয়িত্বা স্ত্রিয়াঃ স্তন্যং সর্ব্বে সামং বিবর্জ্জয়েৎ।

মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার দুগ্ধই অপক্কাবস্থায় সেবন করিবে না। ইহাদ্বারা সহজেই অনুমান হয় যে, অল্প আবর্ত্তিত দুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে আমদোষ বর্জ্জিত হয় না বলিয়া উহা অধিকতর অম্ল বিপাক হয়।

সেই অল্প আবর্ত্তিত দুগ্ধ, পিচ্ছিল সাগু বার্লির সঙ্গে মিলিত হইলে সাগু বার্লির পিচ্ছিলতা ও দুগ্ধের সাধারণ অম্ল বিপাকতা এই দুইটীতে একটি সংযোগ বিরুদ্ধ এবং অভিষ্যন্দীকারক (ক্লেদজনক) দ্রব্যের উৎপত্তি হয়,

সুতরাং জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ পথ্যাধীনে থাকা সঙ্গত বলিয়া বোধহয় না রুটী সম্বন্ধে ও অনেক বলিবার কথা আছে।

রুটিকা বলকৃৎরুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধিনী।
বাতঘ্নী কফকৃৎ গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নিনাং প্রপূজিতা॥

রুটী বলকারক, রুচিকারক, বৃংহণ, ধাতুবর্দ্ধক, বাতনাশক, কফকারক গুরুপাক এবং দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির হিতকর খাদ্য।

গুরু ও কফকারক দ্রব্যের সঙ্গে অম্লবিপাক ও মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্যের একত্র মিশ্রণে যে একটি কিরূপ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা রস বিপাক-বিদ চিকিৎ-সকের অগোচর থাকা সম্ভব নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, দুগ্ধ মানুষের আশৈশব অভ্যস্ত ও প্রাকৃতিক সাত্ম্য; সুতরাং তাহার সামান্য অপব্যবহারে বিশেষ ক্ষতি হওয়া অসম্ভব। এই যুক্তি সর্ব্ববাদী সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। কেননা রুগ্ন ব্যক্তির, চিরাভ্যস্ত দ্রব্যও হেতু এবং ব্যাধির অনুকূল হইলে রোগ বৃদ্ধি করা অবশ্যম্ভাবী। যথা—

প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষংপ্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

একান্ত প্রাণ রক্ষাকারী অন্নও অবিধি পূর্ব্বক সেবিত হইলে প্রাণ হানি করিতে পারে; অথচ বিষ স্বাভাবিক প্রাণঘ্ন হইয়াও বিধি পূর্ব্বক যুক্ত হইলে জরা ব্যাধি প্রশমক হয়। সুতরাং রোগীর পক্ষে চিরাভ্যস্ত প্রাকৃতিক সাত্ম্য দ্রব্যাদিও হেতু ও ব্যাধির অনুপযুক্ত হইলে ব্যবহার্য্য নহে। পরন্তু ব্যাধির হিতকারীদ্রব্যও অনভ্যস্ত বা ঘৃণার্হ হইলে তাহা বর্জ্জনীয়, এরূপ অবস্থায় পথ্য নির্ব্বাচনকালে দেশ, কাল, পাত্র, বয়স, বল, সাত্ম্য প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হিতকারী পথ্য যোজনা করিবেন।

দুগ্ধ কিংবা মাংসাদি বলকারক দ্রব্য, ব্যাধির উপসর্গাদির অনুপযুক্ত হইলে কেবল মাত্র বল রক্ষার জন্য তাহা প্রযোজ্য নহে। কেননা আহার্য্য বস্তু সম্যক জীর্ণ হইলে এবং রোগ শক্তির কিছু লাঘব হইলে সামান্য উপাদানেও জীবনী শক্তি রক্ষা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের লিখিত প্রবন্ধের সার মর্ম্ম লিখিত হইল :—

"শিশুর দন্তোদ্গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একমাত্র দুগ্ধই বিশিষ্ট খাদ্য। দন্তোগদমের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহার অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্যাদি খাওয়ার অধিকার হয় তখন তাহাকে একটু একটু কঠিন দ্রব্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। বোধ হয় এই অবস্থাকেই দুগ্ধান্ন জীবন বলে। সমস্ত দন্ত প্রকাশিত হইয়া দন্তের পূর্ণ বল প্রাপ্তি হওয়ার পর হইতে অবশিষ্ট বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত একবারে দুগ্ধ পান না করিয়া অনায়াসে সুস্থ সবল অবস্থায় জীবনাতিপাত করা যাইতে পারে, সুতরাং বল রক্ষা সম্বন্ধে একমাত্র দুগ্ধই বিশিষ্ট উপাদানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। বিশেষতঃ দেখা যায়, যে সকল ইতরপ্রাণী মাতৃগর্ভ হইতে সদন্ত জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা জন্মিবার অব্যবহিত পর হইতেই কোমল তৃণাদি ভক্ষণে সমর্থ হয়।

ক্রমে যখন দন্তের পূর্ণবল প্রাপ্ত হয়, সেই সময় হইতেই সমস্ত জীবনের জন্য মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে সুস্থ ও সবল শরীরে, পৃথক পৃথক প্রাণী, নিজনিজ জীবনের যথোপযুক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় জীবন ত্যাগ করে। সুতরাং স্তন্যপায়ী প্রাণির পক্ষেও বয়সে দুগ্ধকে একমাত্র জীবন রক্ষণোপযোগী পথ্যরূপে ধরা যায় না।" * ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত

কবিরাজ ॥

---

* এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে। আঃ বিঃ সঃ।

আয়ুর্ব্বেদে ত্রিবিধ—

"ত্রিবিধা গুণাঃ।"

১। ত্রিবিধগুণ, যথা সত্ত্ব, রজ, তম

স্রষ্টার সৃষ্টির গূঢ়রহস্য তিনটি বিষয়ের উপরই নির্ভর করিতেছে, তিনই সৃষ্টির ও সৃষ্টপদার্থ নিচয়ের প্রধানতম উপাদান, এই অভিপ্রায়েই মহামতি অগ্নিবেশ ত্রিস্রৈষণীয় অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন "ত্রিস্র এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তীতি" এষণা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—মঙ্গলজননী ইচ্ছার অনুকূল কার্য্যের প্রবৃত্তি। এই তিনপ্রকার এষণার বিষয় মানব মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য।

অশেষকৌশলময়ী জগৎ প্রসবিনী প্রকৃতিদেবী তিনটি ক্রীড়নক লইয়াই যেন জগতের, সৃজন, পালন, ও সংহাররূপ ক্রীড়া করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে সে ক্রীড়নক গুলি কি কি তাহাই আমরা একে একে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে, অনন্তকালপ্রবাহ তিনটি বিষয়ের উপরই নির্ভর করিতেছে।

সত্ব গুণের ক্রীড়নক বা খেলানা লইয়া প্রকৃতির রক্ষা কার্য্যের ও রজোগুণের খেলানা লইয়া সৃষ্টির ও তমোগুণের খেলানা লইয়া সংহার কার্য্যের খেলা চলিয়া আসিতেছে।

"ত্রিবিধা নাড্যঃ।"

২। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না তিনটি নাড়ী। ইহাদের দ্বারা মানবের জীবন মরণ ও সুখ দুঃখের অভিনয় চলিয়া আসিতেছে। তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু চিন্তাশীল মানব এই অঘটনঘটন-পটীয়সী প্রকৃতির লীলা দেখিয়া তন্ময় হইয়া যান, স্থুল দর্শী জীব আহার বিহারাদি চিন্তায়ই সময় অতিক্রম করিয়া থাকে। এই ত্রিবিধ বিষয়ের একটি বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে, এক এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে, তাই আমরা পাঠকের নীরস প্রবন্ধ পাঠের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় অতি সংক্ষেপে বিষয় তিনটির মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছি। অনুসন্ধিৎসু

পাঠক তত্তদ্ গ্রন্থবিশেষের অনুসন্ধান করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। এক্ষণে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের বিষয় আমাদের আলোচ্য।

ইড়া নাড়ী বামনাসায়, পিঙ্গলা দক্ষিণ নাসায় ও সুষুম্না উভয় নাসায়, একই সময় প্রবাহিত হইয়া। থাকে শুক্লপক্ষের, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা এই কয় তিথিতে প্রাতে প্রথমতঃ বাম নাসায়, পরে দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত হয়। প্রতি নাসায় আড়াই দণ্ড করিয়া দিবসে ৬ বার বাম নাসায় ৬ বার ও দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত ইহয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম হইলে কোনরূপ শরীর বা মানস-ব্যাধির সূচনা অথবা কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা বুঝিতে হইবে।

বাম নাসাপ্রবাহকে চন্দ্রের ও দক্ষিণনাসা প্রবাহ সূর্য্যের ও উভয় নাসার প্রবাহকে অগ্নির সহিত তুলিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইড়া স্নিগ্ধ চন্দ্রগুণ বিশিষ্টা, পিঙ্গলা সূর্য্যের তেজোগুণযুক্তা এবং সুষুম্না নাড়ী অগ্নিস্বরূপিনী বা অগ্নিসদৃশ দাহগুণযুক্তা বলিয়া অভিহিতা হইয়াছে। চন্দ্র বা বামনাড়ী অমৃত স্বরূপিনী। এ নাড়ী দেহ ও মনের স্নিগ্ধতা বা স্বাস্থ্য সম্পাদিকা, সূর্য্য বা দক্ষিণনাড়ী শরীর ও মনের সন্তাপদায়িনী ও বিবিধ রোগের হেতুভূতা, তৃতীয়া সুযুম্না নাড়ী সর্ব্বকার্য্য বিনাশিনী ও মৃত্যুদায়িনী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

বাম নাসা প্রবাহে লাভ, জয়,গমনাগমন ইত্যাদি যাবতীয় শুভ কর্ম্ম করণীয়। যুদ্ধাদি ক্রূরকর্ম্ম, স্ত্রীব্যবহার, ভোজন প্রভৃতি কার্য্য দক্ষিণনাসা-প্রবাহে কর্ত্তব্য উভয় নাসা প্রবাহে শুভাশুভ কোন কর্ম্মই করণীয় নহে। কেবল ভগবন্নামকীর্ত্তন ও স্মরণই প্রশস্ত। বাম নাসার গতি রাত্রিতে ও দক্ষিণ নাসার গতি দিবসে রোধ করিলে তাহার স্মৃতি, মেধা, স্বাস্থ্য, ও সুখ শান্তি অব্যাহত থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়। যেমন জল রাশিতে জল মিশাইলে ও তেজোরাশিতে তেজ মিশাইলে জলও তেজের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূর্য্যনাড়ী সূর্য্যকর্ত্তৃক ও চন্দ্র নাড়ী চন্দ্রকর্ত্তৃক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন, "সমাণগুনোহি ভাবানাং বৃদ্ধি-কারণং" সমান গুণই পদার্থ নিচয়ের বৃদ্ধির কারণ। এজন্য স্নিগ্ধরশ্মি

চন্দ্রমা রাত্রিতে স্বীয় রশ্মি দ্বারা পৃথিবীর স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তখন বামনাসা মুক্ত থাকিলে উভয়ের স্নিগ্ধগুণ মিলনে স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সেসময় উষ্ণ রশ্মি সূর্য্যের প্রবাহ অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা উন্মুক্ত রাখিতে পারিলে উভয়ের সমতা রক্ষিত হয়। দিবসে তীক্ষ্ণাংশু সূর্য্য তীক্ষ্ণ রশ্মিদ্বারা জগৎ শোষণ করেন। ঐ সময় বামনাসায় চন্দ্রনাড়ীর শ্বাস প্রবাহিত হইলে উভয়ের বিরুদ্ধগুণে তাপের সমতা রক্ষিত হইতে পারে, সাধক একনিষ্ঠ হইয়া পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই ফলোপলব্ধি করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ শ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বাদশ বর্ষ করিতে পারিলে তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের দংশনেও তাহার কোন অনিষ্ট হয় না এবং সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ অভ্যাসকারী রাত্রিতে বামনাসা ও দিবসে দক্ষিণ নাসা পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া কিছু দিন রাখিলে আপনা হইতে অভ্যাস হইয়া যাইবে। এরূপ বামনাসার শ্বাস দক্ষিণে ও দক্ষিণের শ্বাস বামে পরিবর্ত্তনেচ্ছু যখন যে অংশে শ্বাস চলে তখন সেই বগল চাঁপাদিয়া ১০।১৫ মিনিট শয়ন করিয়া থাকিলেই শ্বাসের পরিবর্ত্তন হইবে।

ইড়া, পিঙ্গলা,সুষুম্না তিথি, বার, নক্ষত্র ও রাশি আশ্রয় করিয়া উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে, কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য কোন্‌টিই বা অকর্ত্তব্য তাহার বিস্তৃত বিবরণ এক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঠক ও সাধক চেষ্টাকরিলে এরূপ স্বরোদয় শাস্ত্রের গবেষণায় অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

"ত্রয় উপস্তম্ভাঃ।"

৩। তিনটি উপস্তম্ভ—আহার নিদ্রা, ও ব্রহ্মচর্য্য। আহার, সুনিদ্রা ও ইন্দ্রিয় দমন এ তিনটি শরীরেরউপস্তম্ভ বা ধারক, এ তিনটি উপস্তম্ভ যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ুঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বল ও বর্ণের উপচয় হয়। এই সকল অবিধি পূর্ব্বক আচরিত হইলেই বিবিধ রোগ সমুৎপন্ন হয়।

"ত্রিবিধং বলম্"

৪। ত্রিবিধ বল—স্বাভাবিক, কালজ, যুক্তিকৃত। তন্মধ্যে স্বাভাবিক বল শরীর ও মনের প্রকৃতিসিদ্ধ, অর্থাৎ জন্ম হইতে যেরূপ শরীর ও মনের বল পিতামাতার নিকট হইতে লাভ করা যায়, তাহাই সহজ বা স্বাভাবিক বল। কালকৃত বল ঋতুবিশেষে ও বয়স বিশেষে হইয়া থাকে। আহার ঔষধাদি সেবন ও পরিশ্রম প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা যে বল হয়, তাহাকে যুক্তিকৃত বা যৌগিক বল বলা যায়।

"ত্রীণ্যায়তনানি"

৫। **তিনটি আয়তন** (কারণ) ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কাল। এই তিনের, অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ রোগের আয়তন বা কারণ বুঝিতে হইবে।

১। দর্শনীয় বস্তু একবারে দর্শন না করার নাম অযোগ।

২। অতি উজ্জ্বল রূপসমূহের অধিক দর্শন অতিযোগ।

৩। অতিসূক্ষ্ম, অতি নিকট, অতি দূরস্থ, অথবা অতি উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, বিদ্বিষ্ট, বীভৎস, ও বিকৃতাদি রূপ দর্শন করাকে মিথ্যাযোগ বলে।

ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়ের, অযোগ অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ নামে অভিহিত।

১। শ্রবণেন্দ্রিয়ের যথা—বজ্রনিনাদ, ঢক্কাশব্দ, চীৎকার প্রভৃতি শব্দ অতিমাত্র শ্রবণ করার নাম অতিযোগ।

২। শ্রবণীয় শব্দ (সঙ্গীতাদি) একবারে শ্রবণ না করাই অযোগ।

৩। পরুষবাক্য, ইষ্টজনবিয়োগ সংবাদ, বজ্রঘাত, লোমহর্ষণজনক বা বীভৎস শব্দ শ্রবণ করাকে মিথ্যাযোগ বলে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যথা।

১। অতিতীক্ষ্ণ, অত্যুগ্র, ও অতি অপ্রীতিকর শব্দসমূহের অতিঘ্রাণকে অতিযোগ।

২। সুগন্ধি মনোরম দ্রব্যমাত্রের একবারে আঘ্রাণ না করাই অযোগ।

৩ দুর্গন্ধ, বিদ্বিষ্ট, অপবিত্র ও ক্লিন্নপদার্থের ঘ্রাণ, অথবা বিষ-বায়ু শব প্রভৃতির গন্ধ গ্রহণ করাকে মিথ্যাযোগ কহে।

রসনেন্দ্রিয়ের যথা—

১। অধিক মাত্রায় আহারের নাম অতিযোগ।

২। একবারে আহার নাকরা অযোগ।

৩। সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার, অজীর্ণে আহার সংস্কার ও সংযোগ বিরোধি আহার প্রভৃতিই মিথ্যাযোগ।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের যথা—

১। অত্যন্ত শীতল বা অত্যুষ্ণ জলে স্নান, অভ্যঙ্গ, শরীর মর্দ্দন প্রভৃতি অতিমাত্র সেবিত হইলেই স্পর্শের অতিযোগ হয়।

২। সুখস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ না করাকে অযোগ বলা যায়।

৩। বিষম স্থানে ভ্রমণ, উপবেশন, বা শয়ন, আঘাত প্রাপ্তি ও অশুচি-সংস্পর্শ প্রভৃতিকে স্পর্শের মিথ্যাযোগ কহে।

কর্ম্মায়তন যথা—

১। বাক্য, মন ও শারীর চেষ্টার নাম কর্ম্ম, তত্তৎকর্ম্মের অতি প্রবৃত্তির নাম অতিযোগ।

২। একবারে কর্ম্মে অপ্রবৃত্তির নাম অযোগ।

৩। মলাদির বেগরোধ বা অতিরিক্ত বেগপ্রদান বিষমভাবে স্খলন, গমন, পতন বা শয়ন, অঙ্গকে দূষিত করা, প্রহারকরা বা অতিমর্দ্দন করা বা নিশ্বাসাদিব অবৈধ অবরোধ ও শরীরকে যন্ত্রণা দেওয়ার নাম শারীরিক মিথ্যাযোগ।

বাক্যায়তন যথা—

নিন্দা, মিথ্যা, অকালে বাক্য প্রয়োগ, কলহ, অপ্রিয় কথা, অসম্বন্ধ ও অশ্রদ্ধাসূচক কথা ও পরুষবাক্যাদিপ্রয়োগ বাচনিক মিথ্যাযোগ। পূর্ব্বের ন্যায় ইহার ও অযোগ অতিযোগাদি বুঝিতে হইবে।

মানসিক মিথ্যাযোগাদি—

ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান ঈর্ষ্যা ও মিথ্যা দর্শনাদিকে মানসিক মিথ্যাযোগ কহে।

কালের অতিযোগাদি—

কাল—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। এই তিনের লক্ষণ যথাক্রমে, শীত, উষ্ণ ও বর্ষণ,

ইহার সমষ্টিকে সংবৎসর কহে। ইহারই নাম কাল, কালেরই নামান্তর পরিণাম।

১। শীতোষ্ণ বর্ষার আতিশয্যের নাম অতিযোগ।

২। ইহাদের অল্পতার নামই অযোগ।

৩। শীতোষ্ণ বর্ষার অনুরূপ লক্ষণ না হইয়া বিপরীত লক্ষণ হইলে আহাকে মিথ্যাযোগ কহে। যথা শীতে গ্রীষ্মানুভব, বর্ষায় অনাবৃষ্টি।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে বাক্য, মন ও শারীরকৃত অন্য যে সকল অহিতকরকর্ম্ম-যাহা বাহুল্য বশতঃ এস্থানে বলা হইলনা, তাহাদিগকেও মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে। এই ত্রিবিধ কর্ম্মই (অযোগ, অতিযোগ মিথ্যাযোগ) নিজের বুদ্ধিকৃত অপরাধ বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী।

পল্লীচিকিৎসক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলা ১টা বাজিতেই আজ হরিনাথ হাজির। সুরেন্ ও আর বিলম্ব না করিয়াই উদ্দেশ্য সাধনার্থে মনঃ সংযোগ করিলেন।

হরি—আজ প্রথমে অর্শ রোগসম্বন্ধে আরম্ভ করা যাউক।

সুরেন—সে তোমার অভিমত।

হরি—দাড়িম্ব (ডালিম) গাছের পরগাছার (পর শ্যাওড়ার) শিকর, কোমরে ধারণ করিলে অর্শরোগের যাবতীয় উপদ্রব অচিরে নষ্ট হইয়া উক্ত রোগ দূরীভূত হয়। অর্শরোগে 'বলি' (গ্যাজ) হইলেও উহা আরোগ্য করিয়াছি। তবে এই ঔষধ কেহ কেহ রোগীর অনামিকা অঙ্গুলির মাথা হইতে মাপিয়া এক কড়, পরিমাণ মাত্রায় ধারণ করিতে দেয়। কেহ বা ঐ দাড়িম গাছের একটী শিকড়ও উক্ত মাপ অনুসারে উহার সহিত ধারণ করিতে দেয়।

শনি কি মঙ্গলবারে একটী কাঁকলাস (কৃকলাস, বা বহুরূপী) মারিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়, যেন পুনরায় উহা মাটিতে না লাগে। ঐ মৃত জীবের এক টুকড়া কোমরে ধারণ করিলেও অর্শ রোগ সারে।

আমি রোগীর কঠিন অবস্থায় উক্ত পরগাছার শিকড় এবং এই কাঁকলাসের একখণ্ড, একটি তামার তাবিজে ভরিয়া রোগীর কোমরে ধারণ করাইয়া অতীব আশ্চর্য্য ফল দেখাইয়াছি।

একতোলা আতপ চাউল, আধ তোলা চারানিমের শিকড় সহ বাঁটিয়া ৩।৪ দিন খাইলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

সু। তুমি বলিলে "৩।৪ দিন পর্য্যন্ত খাইলে"—তাহা কখন খাইতে হয়?

হ। কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় না বলিলে প্রাতঃকালই প্রশস্ত সময়। তবে রোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রাতঃকাল ও বৈকালে ব্যবস্থা।

গোলমরিচ সাতটী ও থানকুনি (থুলকুড়ি) পাতা ১ তোলা একত্র বাঁটিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে অর্শ ও তজ্জনিত রক্তপাত আরোগ্য হয়।

দুই তোলা পরিমাণ পরিষ্কার কৃষ্ণতিল চিবাইয়া সেবনান্তে শীতল জল পান করিলেও অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

আদা ও আমআদার রস এক ঝিনুক পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে অল্পদিনেই অর্শ ভাল হয়।

তেলাকুচা পাতার রস দিনে ২।৩ বার চোখে দিলে অর্শ জনিত রক্তপাত আরোগ্য হয়।

সু। তেলাকুচা পাতার রস চোখে দিলে কি জ্বালা করে না?

হ। না; উহাতে বরং চক্ষু শীতল হয়।

অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে গরম জলে ফিট্‌কারী মিশাইয়া জলশৌচ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

সু। 'বলি'তে যদি অসহ্যবেদনা হয়, তবে তাহার প্রতিকারের উপায় কি?

হ—অর্শের 'বলি'তে অসহ্য বেদনা ও জ্বালা হইলে ছালাতে (চট্ বা বস্তাতে) শঙ্খ ঘষিয়া উহা দ্বারা স্বেদ দিলে অথবা গরম কাপড়ের স্বেদ দিলে উহা সহজেই শান্ত হয়।

সু—'বলি' নষ্ট করিবার কোনও দ্রব্য আছে কি ?

হ—আছে ; সিজের আঠাতে হরিদ্রা চূর্ণ মিলাইয়া অল্পমাত্রায় বলির মুখে দিলে, উহা খসিয়া যায় ও রোগ দূর হয়।

তেঁতুল পাতার রস, রক্ত জবার কলির 'লোত' (পিচ্ছিল রস) একটু পরিষ্কার চিনিসহ দুই বেলা সেবন করিলেও অর্শ ভাল হয়।

সু—বাহ্যার্শের ঔষধ জান ?

হ—'বাহ্যার্শ' কি ? কথাটা মোটেই বুঝিলাম না।

সু—শরীরের কোনও স্থানে জলৌকা (জোক) সদৃশ মাংসাঙ্কুর উগদত হইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহাকেই 'বাহ্যার্শ' কহে।

হ—পেঁয়াজের খোসাভস্ম ও পানের বোঁটা, এই দুই দ্রব্য থুথু দিয়া বাঁটিয়া রোগস্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হয় এবং অঙ্কুর ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায়। এমন কি লোমকূপ দ্বারা রক্ত ক্ষরিত হইলেও ইহা অব্যর্থ ঔষধ জানিবেন।

সু—২। ১ টা মন্ত্রতন্ত্র ও আছে কি ?

হ—আছে—আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ হারাইয়া ফেলিয়াছি।

অব্যর্থ ফলপ্রদ মন্ত্রই শিখিয়াছিলাম। উহা পাঠ করিয়া স্নানকালে মাত্র এক গণ্ডূষ জল পান করিতে হইত। মন্ত্রটির একটি সর্ত্ত ছিল যে, রোগীর নাম জানা মাত্রই তাহাকে উহা শিখাইয়া দিতে হইবে, নতুবা লক্ষ লক্ষ ব্রহ্ম-হত্যার পাতক ঘটিবে আমার বলিতে কষ্ট হয় যে, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ যে তিনটি রোগীর নাম প্রথম জানিলাম তাঁহারা সকলেই শিক্ষিতাভিমানী, কাজেই আমার স্বেচ্ছাদত্ত দান তাঁহারা অতীব ঘৃণার ভাবে প্রত্যাখ্যান করি-লেন ; আমার মনে বাস্তবিকই একটা অভিমান ও আত্মগ্লানি জন্মিল ; আমিও হেলাখেলা করিয়া উহা ভুলিতে চেষ্টা করিলাম এবং কালক্রমে এক-বারেই ভুলিয়া গেলাম। এমন কি উহা কোন জায়গায় একটু টুকিয়াও রাখিলাম না। যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পা'বার যো নাই !

সু—তবে এখন আর অনুতাপ ও বৃথা।

হ—শনি কি মঙ্গলবারে একটি তামার আংটী তৈয়ার করাইয়া অথবা বাজার হইতে একমূল্যে কিনিয়া আনিবেন। ঐ আংটি উক্ত দিবসেই সন্ধ্যার

প্রাতঃকালে ভাটী বেলায় নিম্নোক্ত মন্ত্রে ও নিয়মে অভিমন্ত্রিত করিয়া অনামিকা অঙ্গুলিতে ধারণ করিলে অর্শ আরোগ্য হয়।

পূর্ব্বমুখ করিয়া নিরাসনে বসিয়া একটা দা'র এক পিঠে থুথু দিয়া আংটীটির একপিঠ ঘষিতে হয় ও মন্ত্রটী বলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বামহস্ত দ্বারা মেরুদণ্ড ঘষিতে হয়। পুনঃ দা'র অপর পিঠে থুথুদিয়া আংটীটির অপর পিঠ মন্ত্রোচ্চারণ সহ ঘষিতে হয়, পরে ধারাল অংশে অর্থাৎ দা'র মুখে আংটীটির বেড়টী (circumference) ঘুরাইতে ঘুরাইতে আস্তে আস্তেঘষিবেন ও মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই কায শেষ হইলে, ঐ আংটীটি রোগীকে ধারণ করাইবেন, এবং বলিবেন যে রোগী যেন উহা প্রথমে স্বীয় কপালে স্পর্শ করাইয়া "কামাখ্যার" নামে পাঁচ পয়সার লুট মানত করতঃ ধারণ করে।

মন্ত্রটী যথা ১ হইতে—২০ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া পুনঃ ২০ হইতে ১ পর্য্যন্ত উল্টা করিয়া গণনা করিতে হয়।

সু—এ'টা তোমার কেমন মন্ত্র?

হ—মন্ত্র না বলেন, আপত্তি নাই; কিন্তু মনে করুন যেন ইহা একটা "ঠিক ঠাক"।

সু—কামাখ্যার নামে মানত, ইহা কিরূপে আদায় করিতে হয়?

হ—যদি সম্ভব হয়, তবে তথায় কাহারও সঙ্গে আরোগ্যান্তে পাঠাইয়া দিতে বলিবেন, নতুবা সহজ কথায় 'হরিলুটের' ন্যায় 'কামাখ্যার' নাম নিয়া লুট দিতে বলিবেন।

সু—আচ্ছা, তাই হ'বে।

হ—কেহ কেহ তুঁতে হইতেও তামা বাহির করিয়া উক্ত তামা দিয়া আংটী করিয়া ধারণ করেন।

মনে রাখিবেন শৌচকর্ম্ম কালীন ঐ আংটী গুহ্যদ্বারে স্পর্শ করাইতে হয়।

আমি যা'কে যা'কে অর্শের ঔষধ দিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেককেই একটি আংটীও ধারণ করাইয়াছি।

সু—কেন?

হ—এইটাই আমার কবিরাজদের মত "যোগবহিনী" পদ্ধতি।

হ—এখন আমাশয়ের ঔষধ বলা যাউক।

সু—আচ্ছা, আরম্ভ কর।

হ—তেলাকুচার পাতা রগ্‌ড়াইয়া ঐ রস চক্ষুতে দিলে আমাশয় দূর হয়।

দ্রোণ ফুলের (দণ্ড কলসের) গাছের নির্জ্জলা রস চক্ষু মধ্যে দিলে আমাশয় নিশ্চই আরোগ্য হয়। অবস্থা ভেদে দিনে ২।৩ বার দিবে। সাধারণতঃ প্রাতে ও বৈকালে ব্যবহার্য্য। যেরূপ কঠিন রক্তামাশয়ই হউক না কেন উহাতে নিশ্চয়ই সারিবে।

সু—ইহাও কি ঠাণ্ডা?

হ—না; ইহাতে চক্ষু একটু জ্বালা করে; কিন্তু কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, বরং চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়। তবে ইহা অল্প বয়স্ক শিশু, কি দুর্ব্বল রোগীকে ব্যবহার করাইবেন না; কারণ তাহারা উহার বেগ সহ্য করিতে নাও পারে।

দ্রোণ ফুলের শিকড় আধ তোলা ও আদা এক তোলা, দুই দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ গরম জলে বাটিয়া প্রাতে খাইবে। পরে ২।৩ বার গরম জল খাইতে হয়। একবারেই নিশ্চয় আরোগ্য। যদি রোগের প্রকোপ পর দিন ও সামান্য উপলব্ধি হয়, তবে পরদিনও পুনঃ ব্যবহার করিবে। ছেলে পিলের পক্ষে ইহার অর্দ্ধমাত্রা প্রযোজ্য।

ডালিমের খোসার গুড়া ও জীরা সমপরিমাণে খাইলে অথবা তেলাকুচা পাতার রস ১তোলা পরিমাণে ৩।৪ দিনপান করিলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

চুণের জল ও হলুদ মিশাইয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে খাইলে সাধারণ আমাশয় একদিনে সারে।

২।১টা হলুদ পাতার রস, সমপরিমাণ চুণের জল সহ ২।১ বার খাইলে সকল প্রকার আম রক্তই আরোগ্য হয়।

ডালিমের শিকড়, জাম পাতার রস ও ছাগদুগ্ধ একত্র বাঁটিয়া খাইলে বহু দিবসের আম রক্ত দুই দিনে আরোগ্য হয়।

এক ছটাক পরিষ্কার চিনি সহ ২টী রক্ত জবা বাটিয়া খাইলে শ্বেত আমাশয় ভাল হয়।

ডালিম পাতার রস, থানকুনি পাতার রস ও আদার রস একত্র লোহাদাগ করিয়া সকালে বিকালে খাইলে আমরক্ত ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়।

আতপ চাউল বাঁটিয়া তেঁতুল পাতা সিদ্ধ জল সহ প্রাতে সেবন করিলেই আমাশয় দূর হয়। ইহা আশুফলপ্রদ।

থানকুনি পাতার রস চক্ষুতে দিলে ও নাভিতে মালিশ করিলে আমাশয়, বেদনা সহ দূর হয়।

সাতখণ্ড বেথাইক্ (বেতের কচি অগ্রভাগ) খালিপেটে চিবাইয়া খাইলে আমাশয় সারে।

কাঁচা আম, লবণ দিয়া খাইলে অথবা পুরাতন তেতুল একছটাক এক পোয়া জলে ভিজাইয়া, সেইজল লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে আমাশয় দূরীভূত হয়।

আধতোলা পরিষ্কার চিনি ও আতভোলা উত্তম ধূপচূর্ণ একত্রে মিশাইয়া ২।৩ দিন সেবন করিলেও উক্ত রোগ সারে।

আফুলা তেঁতুলের পাতা, বড়ইর (কুলের) পাতা, সমূল থানকুনি গাছ এবং আদা একত্র ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া লোহাদাগ করিয়া ২ তোলা আন্দাজ, দুই বেলা খাওয়াইলে সাদা রক্তামাশয় ভাল হয়।

সু। ঠাকুদ্দা, একশ্বাসে যে অনেকগুলি বলিয়া ফেলিলে? আমাশয় রোগের প্রতিকারার্থে যে ২।১টী জিনিষ শুঁকিতে দেখি, কই, তা যে কি, তাহাতো বলিতে পারিলে না।

হ। আচ্ছা, শুনুন; জাম পাতা অথবা সেঁচিশাক রগড়াইয়া একখানা পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়াতে পুঁটুলি করিয়া বারংবার শুঁকিতে হয়; এরূপ করিলে সহজেই আমাশয় সারে।

সু। আমাশয়ে অসহ্য শূল হয় ও কোমরে বড়ই বেদনা অনুভূত হয় তাহার হাত হইতে সহজ মুক্তির উপায় কি?

হ। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহারেই রোগ আরোগ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেদনাদি দূর হয়।

সু। তুমিত বেশ বল্লে।

হ। সুরেন বাবু, ক্ষুণ্ণ হইবেন না; আরো বলিতেছি।

সবরি কলা ও চিনি খালি পেটে খাইলে আমাশয়ের বেদনা শান্তি হয়।

তেলাকুচা পাতার রস, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, হাতে ও পায়ের

তালুতে মালিস করিলে আমাশয়প্রসূত বেদনা দূর হয়।

বেল পোড়া ও ঘোল একত্র সরবৎ করিয়া পান করিলে আমশূল ভাল হয়।

কানাইলড়ি গাছের কচি ডগার রস লবণ সহ মিশাইয়া ঘাড়ের ও মলদ্বারের উপরের হাড়ে দুইবেলা করিয়া মালিশ করিলে শূল সহ আমরক্ত সারে, ইহা শিশুদের পক্ষেই প্রশস্ত।

থানকুনি পাতার রস পাথরে রাখিয়া একটি জায়ফল খানিকটা ঘষিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে আফিং মিলাইয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে নাভি মূলের বেদনা ও আমাশয় দূর হইবে।

যাহাদের সাদা আমাশয়জনিত পেট বেদনা আছে, ১০,১৫ বার বাহ্য হয়, কিছুতেই সারে না, যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তাহারা আধ ছটাক কেশুর্ত্তের রস অল্প পরিমাণ লবণ সহ প্রাতে তিনদিন সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

ঠাণ্ডা জলের স্বেদ দিলেও উক্ত বেদনার উপশম হয়।

সু। আমাশয়ের ত অনেক ঔষধ বলিয়া ফেলিলে।

হ। আরও কিছু বলিয়া, এই অধ্যায় শেষ করিতে চাই।

সু। আচ্ছা, বলিয়া যাও, অমৃতে অরুচি কা'র?

হ। নালিতাপাতা (পাটপাতা) চূর্ণ,পূরাতন সিদ্ধি পাতা চূর্ণ ও ইক্ষু-গুড় প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ তণ্ডুলোদকের সহিত মর্দ্দন করিয়া বদরিকা প্রমাণ বটী তৈয়ার করিবে। এই বটিকার অনুপান —আমাশয়ের সঙ্গে জ্বর থাকিলে তণ্ডুলোদক (চাউল ধোয়া জল) এবং জ্বর না থাকিলে দধি। দিনে অবস্থানুসারে ২।৩ বটিকা সেব্য। ইহা সেবন করিলে সত্বর আমাশয় রোগ বিনষ্ট হয়।

পেয়ারা (গয়া) পাতার রস ও দুধ সমান ভাগে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে রক্তামাশয়ের রক্তভেদ ও রক্তবমন দূর হয়!

আদার ফানা, ভাতে দিয়া উহা গরম অবস্থায় গরম ভাত সহ খালিপেটে খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

রক্তশাপ্লা, কাঁচা চিবাইয়া খাইলে অথবা শুষ্ক রক্তশাপ্লার ক্কাথ পান করিলেও সারে।

ভিজান চিড়া, সবরিকলা ও ক্ষীর একত্র খাইলে ও আমাশয় সারে।

ঠটে কলা ৭ চাক্ (খণ্ড) খালিপেটে চিবাইয়া খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

আমাশয়ের পথ্য সাধারণতঃ শুক্ত ও লঘুদ্রব্য ভোজন।

সু। ও, ঠাকুদ্দা, এবার ২।১টা মন্ত্রতন্ত্র বলিলে না?

হ। না, দাদা, এইবেলা আমি পশ্চাৎপদ। তবে এইটা জানিয়া রাখুন:—

একটি কবরী কলাতে মটর প্রমাণ ঘোড়ার বিষ্ঠা ভরিয়া (অবশ্য রোগীর অজ্ঞাতে) রোগীকে ঐ কলাটি খাওয়াইতে হয়। ইহাতে আমাশয় একবারেই আরোগ্য হয়। প্রাতে খাওয়ার বিধি। ইহার নামই 'কলাপড়া'।

আজ অনেক হইল—এখন তবে আসি।

সু। আচ্ছা, তুমি বুড়া মানুষ, তোমাকে আজ আর কষ্ট দিতে চাইনা।

হ। না, এতে আর বিশেষ কষ্ট কি? তবে কিনা, বুড়া বয়সের আলস্য, জড়তা, এই যা, কিছু।

সু। আমিও তাই বলিতেছিলাম। ভুলো না যেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

পাইকপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক ও

অবধৌতিক চিকিৎসা তত্ত্ববিৎ।

দীর্ঘায়ু মনুষ্য ও তাহার আহার বিহার।*

(হিন্দী বৈদ্যকল্পতরু হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

নাম	স্থান	আয়ু	মৃত্যু সময় সন (খ্রীঃ)	আহার বিহার
পণ্ডিত শঙ্করলাল	অমরোহা, জিং মুরাদাবাদ	১২৫	১৯০০	এই মহাত্মগণ সকলেই সদাচারী মিতাহারী এবং মধ্য ব্যবহারী। ইহাঁদের আহার প্রায় দুধ, ঘি, রোটী এবং নানাপ্রকার তরিতরকারী প্রভৃতি। ইহাঁদের মধ্যে এক জন ও মদ্যপায়ী অথবা মাংসাহারী নহেন।
রামদাস সাধু	আম্বলা ক্যাম্প মৃত্যুস্থান কুরুক্ষেত্র	১১৬	১৮৯০	
গ্রাণীরোজ Granny Rose.	এস্ করোলাইনা S, Carolina.	১৩১	১৮৮৮	
গ্রাণী ওয়াপ ম্যারেক Granny Wap Marek.	জর্ম্মণী Germany.	১২৬	১৮৮৯	
এড্না গুড্ম্যান Edna Goodman.	আরকান Arkan.	১২৭		
মারিয়ন লোকহার্ট Marion Lockhart.	আইওয়া Iowa.	১২৭	১৮৬৯	
মারিয়ন মূর Marion Moore.	ইংলণ্ড England.	১৩১	১৮৬১	
থমাস্ লাইটফুট Thomas Lightfoot.	কানাডা Canada.	১২৭	১৮৪৬	
উইলিয়াম জেম্স Williom James.	এস, করোলাইনা S. Carolina.	১৩২	১৮৩৯	
ইউলেলিয়া পেরীজ Eulalia Perez.	কালীফোনিয়া California.	১৪০	১৮৭৮	

* উপরি লিখিত কোষ্ঠকে যে সকল মহোদয়গণের পরমায়ু বর্ণিত হইল, ইহাঁরা হিত ও মিতাহার, সদাচার, শারীরিক শ্রম এবং ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি দ্বারাই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। ১২০ বৎসর মানবের পরমায়ু এরূপই শুনা যায়। এমন কোনরূপ অনুষ্ঠান আছে, যাহাতে ইহাপেক্ষাও যে দীর্ঘজীবী হইতে পারে না এমন নহে। এই বিবরণই তাহার প্রমাণ। ইহাদ্বারা বুঝাযায়, আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন প্রয়োগের ফলে যে অমিত আয়ু লাভের কথা লিখিত আছে, তাহাও কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। লেখক

নাম	স্থান	আয়ু	মৃত্যু সময় সন (খ্রীঃ)	আহার বিহার
স্বার্লিংগ (সাধু) Swarling (monk.)	এই সকল ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী (All these were the residents of the British Isles)	১৪২	১৭৭৮	
চার্লস এম-ফাইন্‌লে Charles M. Finley.		১৪৩	১৭৭৩	
জন এফিঘম John Fflingham.		১৪৪	৩৫৭১	
ইভান উইলিয়াম্‌স Evan Williams.		১৪৪	১৭৮২	
থমাস্ উইংসলো Thoms Winsloe.		১৪৬	১৭৬৬	
উইলিয়াম্ মীড William Mead.		১৪৮	১৬৫২	
জেম্‌স্ বৌয়েল্‌স্ Jemes Bowels.		১৫২	১৬৫৬	
থমাস্ পার Thoms Parr.		১৫২	১৬৩৫	
জোসেফ্ সারিংটন্ Joseph Surrington,		১৬০	১৭৬৮	
উইলিয়াম এডোয়ার্ডস্ William Edwards.		১৬৮	১৬৭০	
হেনরী জেন্‌কিন্স Henry Jenkins.		১৬৯	১৬৭০	
লুইসা ট্রুক্‌সো Louisa Truxo.		১৭৫	১৭৮০	

মন্তব্য—রসায়নতন্ত্রের অমোঘ প্রয়োগ এবং ঋষিবাক্যের প্রতি যে সকল মহাশয় ব্যক্তি আক্ষেপ সহকারে দুর্ব্বচন বিন্যাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ সিদ্ধান্তের সহিত ইহা মিলাইয়া দেখিবেন।

ইন্দ্রপ্রস্থীয় রাজবৈদ্য শীতলপ্রসাদ জৈনী-দিল্লী।

প্রশ্নোত্তর।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ" পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ললিতারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় "পরমায়ু" প্রসঙ্গে নিদ্রাবিধি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সে সম্বন্ধে দুই চারিটী জিজ্ঞাস্য আছে। আশা করি ইহার সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন।

১। শয়নের পূর্ব্বে পদ সিক্ত করা অনুচিত। ইহার কারণ কি বা ইহাতে স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি হয়?

১। শয়ন গৃহে আলো জ্বালিয়া নিদ্রা যাইবেনা, কেননা বায়ুমধ্যস্থ অম্লজান বাষ্প জ্বলিয়া যে অঙ্গারীয় বাষ্প উৎপাদন করে, তাহা গ্রহণ করায় মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। বেশ! যদি শয়ন গৃহে (অল্প তাপ বিশিষ্ট) বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিয়া শয়ন করা যায়, তাহা হইলে ত বায়ু-মধ্যস্থ "অম্লজান বাষ্প" (Oxygon. O) জ্বালিয়া "অঙ্গারীয় বাষ্প" (Carbon dioxido coz) উৎপন্ন করিতে পারেনা।

এই আলোক বা অন্যকোন কৃত্রিম আলোক জ্বালিয়া নিদ্রা যাইতে পারা যায় কিনা? বা ইহাতে মৃত্যু ঘটিতে পারে কিনা? যদি বিপজ্জনক হয় তবে ইহার কারণ কি?

আপাততঃ এই দুইটীই থাক, পরে আরও জানিবার বাসনা রহিল। ইতি ৪।২।১৩২১।

নিবেদক—শ্রীরমেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (বৈদ্যরত্ন)
শ্রীরামপুর।

উত্তর।

১। শয়নকালীন পদ শুষ্ক রাখাই কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রানুশাসন এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল। যোগসিদ্ধ পুরুষগণ রাত্রিচর্য্যায় অন্যান্য বিধি-নিষেধের সহিত এই নিয়মটি ও পালন করিয়া সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবী হইয়াছেন।

'পরমায়ু' শীর্ষক প্রবন্ধকে নিয়মগুলি অধিকাংশই যোগসিদ্ধ পুরুষগণের আচরিতব্য বিধিনিষেধ মাত্র, কতক আয়ুর্ব্বেদ সম্মত। যদিও আয়ুর্ব্বেদে আর্দ্রপদে শয়নের নিষেধাত্মক কোন স্পষ্ট অনুশাসন নাই, তথাপি ইহা যুক্তির অনুকূল সন্দেহ নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে এসম্বন্ধে প্রচুর বিধিনিষেধ দেখা যায়, যথা—"নতুদ্বারেঽস্তসাকীর্ণে নার্দ্রপাদস্ত্বধাবিতঃ" অন্যত্র "সমুহৃদ্বান্ধবজনঃ স্বপেৎ শুষ্কপদো নিশি।" শয়নের সময় মস্তকে উষ্ণতাও পাদদ্বয়ে শৈত্য না আসিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা দেখা যায়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণশিরা হইয়া শয়নের তাৎপর্য্য ও অনেকটা তাহাই। এজন্যই মস্তকের নিকটবর্ত্তীস্থানে পূর্ণকুম্ভস্থাপনেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। যথা—"মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ" আর একটি কারণ, মস্তিষ্কে যতক্ষণ রক্তের চাপ অধিক থাকে ততক্ষণ নিদ্রা আসেনা, শয়ন করিলে স্বভাবতঃ মস্তিষ্কের রক্ত অধোগামী হয়, সুতরাং নিদ্রা আসে, কিন্তু পায়ে শৈত্য লাগিলে মস্তিষ্কের রক্ত নামিয়া আসিতে বাধা প্রাপ্ত হয়, কাযেই সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, নিদ্রা দুঃস্বপ্ন পূর্ণ হয় অথবা সহজে নিদ্রাই আসেনা। ইহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা। এবিষয়ে বহু যুক্তিই প্রদর্শন করা যায়, বিস্তৃতি ভয়ে এস্থানে অধিক উল্লিখিত হইল না। স্বতন্ত্রভাবে শীঘ্রই ইহার আলোচনা বাহির হইবে।

২। শয়নের উদ্দেশ্য বিশ্রাম ও পুষ্টি, এজন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের উপর কোন প্রকার উত্তেজনা না আসাই বাঞ্ছনীয়। নিদ্রা ও সুনিদ্রা ব্যাঘাতের কারণ গুলি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কতক আভ্যন্তরিক অসুখ ও কতক বাহিরের উপদ্রব। উপযুক্ত নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে নানা পীড়ার উৎপত্তি, জীবনী শক্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইতে থাকে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত-ক্ষয়িতদেহ রাত্রির সুখ-সুপ্তিতে পূর্ণ হয় এবং তদতিরিক্ত ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী হইতে মানব পর্য্যন্ত সকল জীবই নিদ্রার সময়, বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জীবকে বিশ্রাম ও নিদ্রার সুযোগ না দিলে সেত বৃদ্ধিলাভ করিতে পারেই না, পরন্তু জীবনধ্বংস ও অনিবার্য্য। চন্দ্রের আলোক ব্যতীত যে কোন আলোক জীবদেহের উত্তেজনা কারক। স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রতি দিবালোক যেমন উপকারী তেমন রাত্রিতে বিশ্রামের সময় আলোক দ্বারা ও অনিষ্ট হয়।

অভ্যাসে সকলই অনেকটা সহিয়া যায় কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আলোক হইতে অন্ধকারে গেলে বা অন্ধকার হইতে আলোর মধ্যে আসিলে ইহার বেশ পরীক্ষা হয়। বৈদ্যুতিক আলোকের উষ্মা (তেজ) আছে কিনা, এই নিয়মেই তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নিদ্রার সময় কোন প্রকার আলোকই শরীরে পতিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি ও সুস্থ শরীরে কাহারো কাহারো আপাতত অসুখ বোধ না হইতে পারে, কিন্তু অলক্ষিত ভাবে জীবনী ও পোষণ শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। রুগ্ন দেহে ইহার বিশেষ পরীক্ষা হয়।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"শয়নং পিত্তনাশায়—"আলোক বা উত্তাপ মাত্রই পিত্ত বর্দ্ধক সুতরাং উত্তেজক, এমতাবস্থায় বিশ্রান্তির সময় কোন্ বুদ্ধিমান্ আত্মহিতৈষিব্যক্তি অযথা ক্লান্তি ডাকিয়া আনে? দীর্ঘজীবীর বিবরণ আলোচনা করিয়াও জানা গিয়াছে, রাত্রিতে অন্ধকারে শয়নই দীর্ঘজীবনের অনুকূল। প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত আলোচনা হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা লাহোর হইতে প্রকাশিত "বৈদ্যভূষণ" নামক একখানা বৈদ্যক শাস্ত্রীয় হিন্দী মাসিক পত্র কয়েক মাস যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। পত্রিকার আকার ডিমাই অষ্টাংশিত ২৪ পৃষ্টা, মূল্য (১।•) একটাকা চারি-আনা, বিদ্যার্থীর জন্য একটাকা। ইহার সম্পাদক বৈদ্যরাজ ধর্ম্মদেব কবিভূষণ বৈদ্যরত্ন। পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র হইলে ও বিষয়গৌরবে মহান্, বিষয় গুলি চিকিৎসক এবং সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সম্পাদক মহাশয়ের বিষয়নির্ব্বাচন ও সগ্রহপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা জুন মাসের সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট আছে:—বাল রোগ চিকিৎসা, অমলতাস কো (আরগ্বধ) প্রয়োগ বিধি, আসবারিস্ট বিধি, বীর্য্যরক্ষা, পানকা খানা (পানের দোষ গুণ) রাজযক্ষা, প্রশ্ন-প্রশ্নোংকে উত্তর। প্রত্যেকটি বিষয় আমরা কুতূহলে সমগ্র পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি; আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের পাঠক বর্গের নিকট আমরা সময় সময় ইহাদের সার

উদ্ধার করিয়া উপহার দিব, অদ্য রাজযক্ষ্মা শীর্ষক প্রবন্ধের সার স্থানান্তরে সংকলিত হইল।

এই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধই 'অপূর্ণ' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বাহির হয়। পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেও খণ্ডশঃ বাহির হওয়ায় দোষ লিখার নৈপুণ্যে প্রায় ধরা যায় না। পত্রিকাখানা দীর্ঘ জীবী ও জয়যুক্ত হউক, ইহাই একান্ত কামনা। বিগত জানুয়ারী মাস হইতে মাত্র পত্রিকা খানার সূচনা করা হইয়াছে। সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় যে ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপুষ্টির ব্যবস্থা না করিবেন এরূপ মনে হয় না। সর্ব্বত্র এই পত্রিকার সমাদর দেখিলেই সুখী হইব।

মুষ্টিযোগ প্রেরিত।

পুরাতনজ্বরে—

১। তেলাকুচা পত্র রস ১ একতোলা, ছাগীদুগ্ধ একছটাক একত্র করিয়া রাখিবে। সর্ব্বাগ্রে রোগীর জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। রোগীকে তৈল মাখাইয়া উক্ত ঔষধ সেবন করাইবে। অব্যবহিত পরেই স্নান করাইয়া অন্ন খাইতে দিবে এবং লেপ ঢাকা দিয়া শয়ন করাইবে। যথেষ্ট ঘর্ম্ম হইলে রোগীকে উঠাইবে এবং গাত্রে অন্য কাপড় দিয়া দিবে। সে দিবস আর কিছু আহার করিতে দিবে না।

পালাজ্বরে—

২। লঙ্কা মরিচের পত্র ছেচিয়া হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র খণ্ড মধ্যে রাখিয়া ক্রমাগত আঘ্রাণ লইবে।

৩। আকলতী লতা হস্তে বাঁধিলে চতুর্থক জ্বর আরোগ্য হয়।

৪। গোল সিজের ডাটার অভ্যন্তরের শস্য ৭ শাত খণ্ড ও আদা ৭ সাত খণ্ড। জ্বরের পূর্ব্বে প্রত্যেকের এক এক খণ্ড খাইবে ও লেপ ঢাকা দিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। সাতবারে সমস্ত খাইয়া ফেলিবে।

জ্বরাতিসারে—

৫। তুলসী পত্র রস মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। অতিসার সহ গাত্র বেদনা থাকিলে বিল্বপত্র রস মধুসহ সেব্য।

৭। শালিঞ্চাশাকে মূল ও কাঁটা নটিয়ার মূল একত্রে সেব্য।

৮। আমরুল শাকের রস কয়েক ফোটা চক্ষের মধ্যে দিলে অতিসার আরোগ্য হয়।

কবিরাজ—শ্রীহরিপদ রায় কবিরত্ন।
(বহরম পুর)

"প্রাণো বা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

—:০:—

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"
বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২১ { ৪র্থ সংখ্যা।

আহার-সমস্যা।

"শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তমন্নং পানঞ্চ ভূতলে।
প্রবৃত্তিঃ কুত্রকর্ত্তব্যা জীবিতব্যং কথংনু বা॥"

(১)

জীবের জীবনধারণের মূলই আহার, কিন্তু মানবের আহার্য্য বড়ই সমস্যাসঙ্কুল ও বৈচিত্র্যময় এবং দিন দিনই তাহা জটিলাকার ধারণ করিতেছে। আমাদের খাদ্য অতি প্রয়োজনীয় নতুবা জীবনযাত্রা চলেনা, কিন্তু কি খাইব, আমরা তাহার সম্যক্ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পরিনা, খাই, বটে তবে

তাহা বড়ই প্রহেলিকাময়। এই যে আহার সমস্যা, ইহা কেবল সভ্য-নামধারী মানবের পক্ষেই সমালোচনীয়। বর্ব্বরজনেরা কখনও আহার বিহারে তেমন বিচার বিবেচনা করেনা, তাহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত হইয়া সহজলভ্য আহার বিহারেই সন্তুষ্ট চিত্তে স্বাস্থ্যময় জীবন অতিবাহিত করে। কেবল জ্ঞানবিজ্ঞানোন্নত শিক্ষিত ও সভ্যপদবাচ্য মনুষ্যগণ অহর্নিশ আহার চিন্তায়ই যেন নিমগ্ন। মাছ খাই কি মাংস খাই, দুধ খাই কি দই খাই, ফলে তৃপ্তি কি শস্যে সুখ, সকলই বুঝা ভার। কাহারো আমিষে রুচি কেহ বা নিরামিষের পক্ষপাতী। কেহ দুগ্ধ নিরামিষে নীরোগী-দীর্ঘজীবী, কেহ বা তাহার বিপরীত ফলভাগী। আমিষ কাহারো আরোগ্য-পুষ্টি-সুখ-প্রদ, কাহারো পক্ষে গ্লানিকর। একটা প্রবাদ আছে "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ" লোক সকল ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং ভিন্ন ২ লোকের যে ভিন্ন ২ আহার হইবে তাহাও স্বতঃসিদ্ধ; কাযেই ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু রুচির সহিত প্রকৃতির সাম্য বৈষম্য কতটুকু? রুচি যাহা চায় প্রকৃতি তাহার কতটা সহন-ক্ষম আর প্রকৃতির সাম্যত্বই কি প্রাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নহে? রোগ শোকের প্রধান মুল কোথায়, ইহাই কি সকলের জিজ্ঞাস্য নহে? লোক আহারের জন্য, জীবনের জন্য না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। লোকের আহার্য্য ও আয়ুষ্কাল যেরূপ দিনদিনই হ্রাস হইতেছে, মৃত্যুর অগ্রদূত ব্যাধি যখন মানব সমাজে তীরবেগে ছুটাছুটী করিতেছে, তাহাতে মানব বড়ই ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছে। ইহাকে দূর করিয়া দেওয়ার জন্য, আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য, আহারের নানা উপায় অন্বেষণে তৎপর হইতেছে। আজ যাহাকে উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; কাল তাহাই আবার নিরূপায় বলিয়া নিরূপিত হইতেছে। এখন প্রাণরক্ষার উপায় কি? ইহা সকলেরই এক গভীর সমস্যা। জগৎ সতৃষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছে; কোন্ জাতি কোন প্রাণী কি ভাবে কোন্ আহারে জীবন পালন করিয়া আসিতেছে। সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত কর, কি দেখিবে—দেখিতেছ ওই যে প্রকৃতি ক্রোড় লালিত বনবাসী স্বচ্ছন্দজাত কন্দ-মূল-ফলাশী নিরহঙ্কার নিষ্ঠুরতাবিহীন নিষ্পাপ নিরাময় তপস্বিবৃন্দ—মৃত্যুস্বয়ং যাহাঁদিগকে ভয় করিয়া সুদূরে অবস্থান

করে সেই মৃত্যুর অগ্রদূত—ব্যাধি ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গ, ব্যাল, বাত্যা প্রভৃতি রিপুগণ যাহাঁদের বশ করিতে যাইয়া নিজেরাই বশীভূত হইয়া পড়ে; ভাব একবার তাহাঁদের আহার কি, ভাবিয়া দেখ, ওই যে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতসমূহের অধিবাসীবৃন্দ—যেখানে যে সে প্রাণী বাচিতেই পারেনা, সেইস্থানের মহাকায় মানুষদের খাদ্য কি, আর কি ভাবে জীবন যাপন করে? মরুপ্রদেশের মনুষ্য, আনূপদেশের আপামর, দ্বীপবাসীর দেহ কান্তি কোন্ আহার আপ্যায়নে অধিষ্ঠিত? কেহ কোথাও পূতি পর্য্যুষিত ভক্ষ্য প্রিয়তমরূপে গ্রহণ করিতেছে, কেহ কেহ সদ্যাহৃত সদ্যপক্ক স্বাদু-সুরস ভোজ্য-পানে পরিতৃপ্ত। কাহারো আহার আমিষ প্রধান কাহারো শস্য প্রধান বস্তুতঃ আহার্য্য ও আহারকর্ত্তার বিভিন্নতা ভাবিতে গেলে মূঢ় হৃদয়ে ফিরিতে হয়, বিবেক বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। একের আহার অন্যে ঘৃণা করে, দ্বেষ করে। এখন আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, অনেকে চিরাভ্যস্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া নূতন ২ আহার অভ্যাস করিতেছে। যে বংশে যে দেশে যে আহার্য্য কোন কালে ব্যবহৃত নাই, তাহাও এখন সেখানে সমাদর পাইতেছে। সমাজ পরিবর্ত্তনে, দেশ ভ্রমণে প্রতিষ্ঠা প্রতি দ্বন্দ্বীতায়, আহারের কত কি পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়া যাইতেছে তাহার কি পরিসীমা আছে? বর্ব্বরজাতি প্রবীণ জাতির আহার অনুষ্ঠানে রত, প্রবীণগণও বর্ব্বরগণের আহার অতি আদরে নিত্যসঙ্গী করিয়া লইতেছেন। দিন দিনই যেন আহার্য্য বিপ্লবে মানব সমাজকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

এত কাল দেখা যাইত পূর্ব্বপুরুষ যেরূপ আহার বিহার করিত পরবর্ত্তিগণও তাহাই করিয়া আসিতেছেন, জগৎটি এই ভাবেই যেন বৃদ্ধি অথবা হ্রাসেরদিকে চলিয়াছিল, কিন্তু এখন আমরা আর সে পন্থা ধরিয়া চলিতে প্রস্তুত নহি। আমরা দেখিতে চাই, বিচার করিত চাই, কোন্ প্রাণী কিরূপ আহার-বিহারে কিরূপ জীবনধারণ করিতেছে? আমরা এমন আদর্শ এখন চাই; যাহারা অনাবিল আয়ুষ্কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিয়াছে। যত দিন আমরা ইহা খুঁজিয়া বাহির না করিতে পারিব ততদিন কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিবনা। এতদিন আমরা বেশ ছিলাম। যে দিন আমাদের এই প্রশ্ন উদয় হইল—আমাদের প্রকৃষ্ট

আপন জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। গর্ভিণীর প্রত্যেক শারীরিক ও মানসিক বিপরীতাচরণ দ্বারা ভ্রূণস্থ শিশুও তত্তৎ দোষভাগী হইয়া থাকে, এজন্যও সাবধানতা একান্ত প্রয়োজন। সময় মত আহার, জলপান, উপযুক্ত সময়ে শয়ন ও শয্যাত্যাগ বাঞ্ছনীয়। আলস্য পরায়ণা, উৎসাহহীনা অথবা অধিক পরিশ্রান্ত হওয়া ও উচিত নহে,ব্যায়ামাদি কঠোর কার্য্যও বর্জ্জনীয়। মন যাহাতে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও পবিত্র থকে, বৃথা চিন্তা এবং শোক প্রভৃতিতে ব্যথিত না হয় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। আহার এমন হওয়া আবশ্যক, যাহা বলকারক ও বেশ লঘুপাক হয়। গুরুপাক দ্রব্য ত সমুদয়ই বর্জ্জনীয়, এমন কি বলকারক গুরুপাক আহার্য্যও ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা বিলম্বে পরিপাক হইবে তাহাই বিষম অপকারী। কতকগুলি খাদ্য সাধারণের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য হইলে ও গর্ভিণীকে সে সব দিলে অপকার হইবে। যেমন মসল্লাযুক্ত ব্যঞ্জন লঙ্কা মরিচ, অম্লদধি ও সর্ব্বপ্রকার তীক্ষ্ণ ও অম্লদ্রব্য। প্রায়ই দেখা যায় স্ত্রীলোকগণ এই সময় অতিমাত্র অম্লদ্রব্য, দগ্ধমৃত্তিকা, অঙ্গার প্রভৃতি মুখের বিরসতা দূরীকরণের নিমিত্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে, এসকল ব্যবহার যেমন কষ্টদায়ক তেমন রোগকারক সুতরাং এই সকল দ্রব্য না খাইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাও কর্ত্তব্য যে, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী উত্তম উত্তম পদার্থ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। গর্ভিণী এমন কোন কার্য্যও করিবেনা, যাহাতে শরীর ও মনে আঘাতলাগে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং পেটের উপর চাপ পড়ে। কোনস্থান হইতে ভারী বোঝা উঠান বা সহসা শরীরে ধাক্কা লাগিতে পারে এমন কার্য্যের ধারে ও যাইবে না। ডুলী, পাল্কী, গাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি চড়িয়া বেড়ান বড়ই অনিষ্টকারক রেলগাড়ী চড়িয়া দূরদেশে গমন করিলে দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদের গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে। অনুচিত মলাদির বেগ অর্থাৎ কুন্থন অত্যন্ত হানিকারক।

গর্ভিণীদের গৃহকার্য্যোপযোগী সাধারণ পরিশ্রমই পর্য্যাপ্ত। তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। দেখা যায় দরিদ্র ও সাধারণ ঘরের স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালীন তেমন কোন কষ্ট

পাইতে হয় না। ইহার কারণ শুধু তাহারা একবারে অলস ভাবে বসিয়া থাকেনা বা থাকিতে পারেনা। সচরাচর ধনী বা আমীর গোছের লোকদের গৃহরমণীগণ অলসভাবে সময় কর্ত্তন করেন তাই তাহাঁরাই প্রসবকালীন অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন। গর্ভিণীর পরিধেয়াদি অধিক উষ্ণও না হয় অধিক ঠাণ্ডাও না হয় বিশেষতঃ উদরদেশ সর্ব্বদার জন্যই ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। মনকে শোকাতুর বা গ্লানিযুক্ত না করিয়া প্রসন্ন রাখিতে হইবে। যেখানে অধিক ভিড় বা জনতাপূর্ণ মেলা হয় সে সব স্থলে যাওয়া কখনও উচিত নহে।

যে সকল স্ত্রীলোকের প্রথম বার গর্ভসঞ্চার হয়, তাহাদের মনে কেমন ভয়, উদ্বিগ্নভাব যেন স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহারা বড়ই বিচলিত ভাব ধারণ করে। এই সময় ইহাদের শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর কথা, ভাল পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া, আমোদজনক খেলা প্রভৃতি দিয়া সন্তোষ আনয়ন করিতে হইবে। নির্জ্জনে থাকিতে দেওয়া বা কোন ভয়ানক ঘটনার সম্মুখীন হইতে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। গর্ভিণীকে কোথাও একাকিনী যাইতে দিবেনা। কোন রকমে ভয় বা ত্রাস জন্মিতে না পারে, সে জন্য সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক, হঠাৎ ভয় পাইলে প্রায়ই দেখা যায় গর্ভস্থ শিশু মৃত, অন্ধ, অবশ (নুলা) অথবা খঞ্জ (লেংড়া) হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়।

গর্ভিণীর কোন রোগ হইলে প্রতিকার করিতে ও অতি সাবধানতা অবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পারা যায়, করিবেনা। বিরেচক ঔষধ বিশেষ হানিকারক। যদি কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন কিছু অধিক মাত্রায় দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। এই সময় অধিকতর সহজপাচ্য আহার আবশ্যক। কিসমিস ও অন্যান্য সুপক্ক উত্তম উত্তম ফল খাইতে দিলে ও উপকার হয়। যদি একান্তই দুই তিনদিন ক্রমাগত পায়খানা নাই হয়, তবে অতি মৃদু ঔষধ প্রদান করিবে, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সওয়া (১।০) তোলা পরিমাণে বিশুদ্ধ তরল এরণ্ড তৈল সেবন করিতে দিলেই একবার কি দু'বার পায়খানা হইয়া যাইবে।

গর্ভিণীর পক্ষে প্রাতঃকালে শৌচাদির পর সামান্য কিছু জলখাওয়ার খাওয়া উচিত এজন্য দুগ্ধ বা সরবৎই উত্তম। গর্ভসঞ্চারের পর যে বমন হইয়া থাকে তাহা অপকারী নহে, বরং হওয়াই উচিত। যদি কোন কারণে পেটে বেদনা হইয়া রক্তস্রাবের সূচনা বুঝা যায়, তখন সেই অবস্থায় বিশ্রামই একমাত্র প্রয়োজনীয়; রোগিনীকে মাত্রই নড়চড়া করিতে দিবেনা, যে পর্য্যন্ত বেশ সুস্থা না হয়। পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার পরিশ্রম, সাহসেরকার্য্য বা শরীরে আঘাতাদি লাগে এমন কোন কার্য্যেই যাইতে দিবেনা।

যদি কোন ত্রুটী বশতঃ গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে গর্ভরক্ষা হওয়া কঠিন। কিন্তু যদি চতুর্থ মাসে এরূপ হয়, তবে তাহার উপায় করা যাইতে পারে, তাহা তত শক্তও নহে। এমত অবস্থায় গর্ভিণীকে পরিষ্কৃত কোমল অথচ ঠাণ্ডা বিস্তৃত বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিবে, খাটের পায়া অল্প উচা হওয়া উচিত, রোগিনীকে, শীতল জলে স্নান করাইবে এবং ভিজা কাপড় নাভির উপর স্থাপন করিবে। এসম্বন্ধে (গর্ভস্থাপন জন্য) দু'একটি ঔষধ ও বলা যাইতেছে :—গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল, যজ্ঞডুমুর, বেলশুঁঠ, বটগাছের জটা, এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া দুগ্ধসহ প্রয়োগ করিবে। অথবা, বলা (বেড়েলা) নাগবলা, শালপানি, যষ্টিমধু ইক্ষুমূল, কাকোলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিতেদিবে। দুগ্ধ, চাউল (চাউলের জল) সুগন্ধি ও নানা প্রকার শীতল দ্রব্য উপকারী। সকল প্রকার পরিশ্রম, ভয় চিন্তা, ক্রোধ প্রভৃতি প্রভূত অনিস্টজনক। উপরোক্ত নিয়ম সকল যথাযথ পালন করিলে গর্ভ রক্ষা হয় ও যথাকালে সুপ্রসব হইয়া থাকে।"

"বৈদ্য ভূষণ"

রসায়ন।

আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন শব্দ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিদ্‌গণের কেমিষ্ট্রি (Chemistry) নামক ইংরাজী শব্দের অনর্থান্তররূপে কল্পিত হইয়া, রাসায়নিক, রসায়নশাস্ত্র, হিন্দু কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই রসায়ন শব্দ, উক্ত ইংরাজীশব্দের কতটুকু যাথার্থ্য রক্ষা করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

রস ও অয়ন শব্দের যোগে বা সমাসে যখন রসায়ন শব্দের উৎপত্তি' তখন প্রথমতঃ রস বলিতে আমরা কি বুঝিব? রস বলিলে বহুকথা মনে হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ প্রভৃতি রসও রস, আবার মধুরাম্ল লবণ কটু তিক্ত কষায়ও রস। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে পারদ রস নামে কথিত হইয়া থাকে। কোন উদ্ভিজ্জ আর্দ্রাবস্থায় নিষ্পীড়িত হইলে যে তরল বস্তু নির্গত হয় তাহাও রস নামে পরিচিত। আহার দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে তেজোভূত তরল সারভাগ উৎপন্ন করে, তাহাকেও রস বলা হইয়া থাকে। তথা চ বাক্যম্‌ঃ—

রসো জলং রসো হর্ষো রসঃ শৃঙ্গারপূর্ব্বকঃ।
স্বাদ্বাদিষু চ নির্য্যাসে পারদেঽপি রসো বিষে॥

পরন্তু রস বলিতে একটী মাত্র বস্তুর প্রতীতি হয় না। ইহাতে রস শব্দ বহুবোধক হইয়া পড়ে। সুতরাং যথাক্রমে এই সকলের অর্থসঙ্গতি করা আবশ্যক।

১। রস্‌ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা। ইহার উত্তর কর্ম্মবাচ্যে অ (অল্‌) প্রত্যয় করিয়া রসশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হইাতে এইরূপ অববোধ হয় যে, যাহাকে আস্বাদন করা যায় তাহাই রস। সুতরাং আস্বাদনের উপায় জিহ্বাই আমাদের রসনেন্দ্রিয়। উহার গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই রস। কিন্তু শৃঙ্গারাদি রস জিহ্বার আস্বাদনে উপলব্ধি হইতে পারে না। উহা কাব্যশাস্ত্রের আস্বাদন অর্থাৎ মনঃপ্রীতিকরাদি ভাব।

২। মধুরাম্ল লবণ কটু তিক্ত কষায় এই ছয়টী রসের জ্ঞান জিহ্বারদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের উৎপত্তি জল হইতেই হইয়া থাকে। মনে হইতে পারে জলের কোন আস্বাদ নাই, তবে তাহার দ্বারা মধুরাদি রসের উপলব্ধি কেমন করিয়া হইবে?

হাঁ এই দুরধিগম্য বিষয়ের গবেষণায় এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের শক্তি নিয়োজিত হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে:—

"অকাশপবনদহনতোয়ভূমিষু যথাসংখ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। তস্মাদাপ্যো রসঃ। পরস্পর সংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সান্নিধ্যমস্তি। উৎকর্ষাপকর্ষাত্তু গ্রহণম্।

আপ্য এব রসঃ শেষভূত সংসর্গাদ্বিদগ্ধঃ ষোঢ়া বিভজ্যতে। তদ্ যথা— মধুরোঽম্লো লবণঃ কটুক স্তিক্তঃ কষায় ইতি। তত্র ভূম্যগ্নিগুণবাহুল্যান্মধুরঃ তোয়াগ্নিগুণবাহুল্যাদম্ল। ভূম্যগ্নিগুণ বাহুল্যাল্লবণঃ। বায়্বাগ্নিগুণবাহুল্যাৎ কটুকঃ। বায়্বাকাশগুণবাহুল্যাত্তিক্তঃ। পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কষায়ঃ। ইতি। (সুশ্রুত, সূত্র, ৪২শ অঃ)

আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে আমরা পঞ্চভূত বলিয়া অভিহিত করি। এই ভূতপদার্থে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, যথাক্রমে একোত্তর পরিবৃদ্ধ হইয়া উৎপন্ন হয়। যেমন শব্দগুণ আকাশ, শব্দ স্পর্শ গুণ বায়ু, শব্দ স্পর্শ রূপ গুণ তেজঃ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গুণ জল এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গুণা পৃথিবী। জগতের সমস্ত দ্রব্যেই এই পঞ্চভূতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য তাহা তদ্ভূতজ বলিয়া অভিহিত হয়। এই ভূত সকল পরস্পর সংযুক্ত, পরস্পরের দ্বারা উপকৃত এবং পরস্পরে আত্মীয়ভাবে দ্রব্যে অবস্থান করিয়া থাকে। এই ভূত সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু দ্রব্য সকলের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। এইজন্য রসকে আপ্য (জলসম্ভব) বলা হইয়া থাকে। চরকসংহিতাতে রসের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

সৌম্যাঃ খল্বাপোঽন্তরীক্ষপ্রভবাঃ প্রকৃতিশীতা লঘ্ব্যশ্চাব্যক্তরসাস্ত্বন্তরীক্ষাদ্ভ্রশ্যমানাঃ। ভ্রষ্টাশ্চ পঞ্চমহাভূতবিকারগুণসমন্বিতজঙ্গমস্থাবরাণাং ভূতানাং মূর্ত্তীরভিপ্রীণয়ন্তি। তাসু চ মূর্ত্তিষু ষডভিমূর্চ্ছন্তি রসাঃ। তেষাং ষণ্ণাং রসানাং। সোমগুণাতিরেকান্মধুরো রসঃ। তোয়াগ্নিভূয়িষ্ঠাদম্লঃ। ভূম্যগ্নিগুণ ভূয়িষ্ঠত্বাল্লবণঃ। বায়্বগ্নিভূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুকঃ। বায়্বাকাশাতিরেকা-

তিক্তকঃ। পবনপৃথিব্যতিরেকাৎ কষায়ঃ। এবমেষাং ষন্নাং রসানাং ষট্ত্বমুপপন্নং ন্যূনাতিরেকবিশেষান্মহাভূতানাম্। (চরক, সূত্র, ২৬, অঃ)

রসের উৎপত্তি জল হইতেই হইয়া থাকে। জল অব্যক্ত রস এই জল-সম্ভূত রস অন্য চারিটী ভূতের সংযোগ হেতু কালে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া ছয়টী রসের পৃথক্ত্ব সাধন, করিয়া থাকে। যেমন ভূমি ও জলগুণের আধিক্যে মধুর, জল ও অগ্নিগুণের আধিক্যে অম্ল, ভূমি ও অগ্নিগুণের আধিক্যে লবণ, বায়ু ও অগ্নিগুণের আধিক্যে কটু, বায়ু ও আকাশ গুণের আধিক্যে তিক্ত এবং ভূমি ও বায়ুগুণের আধিক্যে কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতের যে কোন ও আহার্য্য দ্রব্যই এই ছয়টী রসের অধীন।

(৩) পারদের রসাভিধান আস্বাদনের জন্য, ইহা বলিতে পারা যায় না। পারদের যোগসাধন গুণই প্রধান। বোধ হয় পারদ ঘটিত ঔষধে পারদের দ্বারা ঔষধ সমষ্টির প্রকৃষ্ট গুণাধান হয় বলিয়া, পারদ রস নামে কথিত হয়। তথা চ বাক্যং—

যস্য রোগস্য যো যোগস্তেনৈব সহ দাপয়েৎ।
রসেন্দ্রো হরতে রোগান্নরকুঞ্জরবাজিনাম্॥ ইতি।

অভিধানে পারদার্থক রস শব্দ আকরিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য পারদকে রসেন্দ্র বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পারদ, আকরিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহার নাম রসেন্দ্র।

(৪) গাছ গাছড়া, আর্দ্রাবস্থায় নিষ্পীড়িত হইলে তাহা হইতে যে তরল বস্তু নির্গত হয় উহাকে রস বলা যায় বটে, কিন্তু উহার প্রকৃত নাম স্বরস। স্বরসের বিষয় আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—"যন্ত্র-প্রপীড়নাদ্দ্রব্যাদ্রসঃ স্বরস উচ্যতে"।

(৫) ভুক্ত আহারীয়দ্রব্য পক্বাশয়স্থ পিত্তকর্ত্তৃক সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে প্রথমতঃ যে তোজোভূত তরল সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহাই শরীরস্থ রসধাতু নামে কথিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"তত্র পাঞ্চভৌতিকস্য চতুর্ব্বিধস্য ষড়্রসস্যদ্বিবিধ বীর্য্যস্যাষ্টাবিধবীর্য্যস্য-বানেকগুণস্যোপযুক্তস্যাহারস্য সম্যক্ পরিণতস্য যস্তেজোভূতঃ সারঃ পরমসূক্ষ্মঃ স রস ইত্যুচ্যতে। তস্য হৃদয়ং স্থানম্। স হৃদয়াচ্চতুর্ব্বিংশতিং

ধমনীরনুপ্রবিশ্যোর্দ্ধগা দশ, দশচাধোগামিন্যশ্চতস্রস্তির্য্যগ্‌গাঃ কৃৎস্নং শরীরমহরহস্তর্পয়তি বর্দ্ধয়তি ধারয়তি যাপয়তি জীবয়তি চাদৃষ্টহেতুকেন কর্ম্মণা। স খল্বাপ্যো রসো যকৃৎপ্লীহানৌ প্রাপ্য রাগমুপৈতি।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

তত্রৈষাং সর্ব্বধাতূনামন্নপানরসঃ প্রীণয়িতা। তত্র রস গতৌ ধাতু-রহরহর্গচ্ছতীত্যতো রসঃ।" (সুশ্রুত, সূ, ১৪শ অঃ)

এই উৎপন্নরস প্রথমে হৃদয়ে গমন করে। তথা হইতে ঊর্দ্ধগ ১০টী, অধোগ ১০টী ও তির্য্যগ্‌গত ৪টী ধমনীতে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে প্রত্যহ তর্পণ, (প্রীণন) বর্দ্ধন, ধারণও যাপন করে এবং জীবিত রাখে। রস প্রধানতঃ জল বহুল। উহা যকৃৎ এবং প্লীহাতে উপস্থিত হইলে লোহিতা-কার ধারণ করে। রক্ত হইতেই মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি ইইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই সাতটীই শরীর ধারণের কারণ বলিয়া ধাতু নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্নপানোৎপন্ন রসই এই ধাতু সমূহের একমাত্র পোষণকর্ত্তা। শরীরে অহরহ রসধাতুর গত্যর্থ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং সুশ্রুত, রস্‌ধাতুর গতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব রস্‌ধাতুর আস্বাদন ও গতি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

এক্ষণে এই সকল রসের মধ্যে কোন্‌টী কেমিষ্ট্রির (Chemistry) রসায়ন শব্দের সার্থকতা প্রতিপাদনে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। তৎপূর্ব্বে অয়ন শব্দের অর্থনির্দ্দেশ করা ও একান্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা উভয়ের যৌগিকসম্বন্ধ কষ্টকল্পিত হইতে পারে।

ইন্‌ধাতুর অর্থ গমন করা, তদুত্তরে অধিকরণ, করণ ও ভাব বাচ্যে অনট্‌ প্রত্যয় করিয়া অয়ন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অয়ন শব্দের অর্থ পথ, শাস্ত্র, আশ্রয়, উপায় ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল অর্থের মধ্যে কোন্‌টী কেমিষ্ট্রির অনুকূল তাহাও নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

প্রকৃতার্থের অনুসরণ করিলে শৃঙ্গারাদি রসের সহিত কেমিষ্ট্রীর রসায়-নের কোন সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়না। সুতরাং অন্যান্য রসবোধক শব্দের সহিত

কেমিষ্ট্রির রসায়নের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কেমিষ্ট্রির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণয় করা যাউক। দুই বা ততোধিক মৌলিকবস্তুর সংযোগে যে স্বতন্ত্র বস্তুর উদ্ভব ও গুণান্তরাধান হয় এবং একটী যৌগিকবস্তু বিশ্লেষণ করিলে যে দুই বা ততোধিক বস্তুর স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি হয়, ইহাই কেমিষ্ট্রির প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ এই সকল বিষয় যাহাতে (যে শাস্ত্রে) বর্ণিত আছে তাহাই কেমিষ্ট্রি।

এক্ষণে এই কেমিষ্ট্রির লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া রসের প্রয়োগ কল্পনা করিতে হইবে। মধুরাদি রসের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়নের সম্বন্ধ আছে ধরিয়া লইলেও কেমিষ্ট্রির সহিত তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ দ্রব্য ও রস এক বিষয় নয়। যেমন লবণ ও লবণ রস এক বস্তু নয়। দ্রব্যে রসের সত্ত্বা থাকিলেও উহা দ্রব্য হইতে পৃথক্। দুগ্ধে মধুর রস আছে বলিয়া মধুর রস মাত্রই দুগ্ধ হইতে পারেনা। ফলতঃ রসের বিশ্লেষণ কেমিষ্ট্রির বিষয়ীভূত নহে, দ্রব্যের বিশ্লেষণই কেমিষ্ট্রির বিষয়। রসের সংযোগ ও কেমিষ্ট্রির বিষয়ীভূত নহে, দ্রব্যের সংযোগেই উহার বিষয়। সুতরাং কেমিষ্ট্রিকে দ্রব্য-প্রধান শাস্ত্র বলিলে বলিতে পারা যায়। এখানে কেমিষ্ট্রির সম্বন্ধে অয়ন শব্দের শাস্ত্র অর্থ গ্রহণ ভিন্ন অর্থান্তরের উপপত্তি হয় না। আশ্রয় ও উপায়ার্থক অয়ন শব্দও ইহাতে প্রযুক্ত হয়না।

পারদ সম্বন্ধে রসায়নের প্রয়োগ শাস্ত্রার্থবাচী করিলে আংশিক ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে বটে কিন্তু উহাকে "রসায়ন" না বলিয়া রসগ্রন্থই বলা হইয়া থাকে। কারণ রসগ্রন্থে রসায়নাধিকার নামে একটী অতি প্রয়োজনীয় অধিকার রহিয়াছে। রসায়ন বলিলেই উহা প্রশস্তরসক্তাদি ধাতুর লাভোপায় বা জরাব্যাধি বিধ্বংসকর ভেষজ বলিয়া ধারণা জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ পারদকে আশ্রয় করিয়া যে গ্রন্থ বা শাস্ত্র এই অর্থে রসায়ন শব্দ নিষ্পন্ন হইলে পারদ ঘটিত সমস্ত ঔষধই রসায়ন হইয়া পড়ে, তখন আর রসায়নাধিকারের সার্থকতা রক্ষা করা যায় না।

এইরূপ স্বরস সম্বন্ধে ও রসায়নের প্রয়োগ আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তবে কি রসরক্তাদি ধাতুর সম্বন্ধেই রসায়ন শব্দ একমাত্র প্রযোজ্য ?

হাঁ, রসায়নের প্রকৃতার্থ যখন ইহার কোনটীর দ্বারা সুমীমাংসিত হইতেছে না, তখন এইরূপ রসায়ন শব্দ যে যোগরূঢ় শব্দ তাহাতে কোন

সন্দেহই নাই। যেমন পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ কেবল একার্থের দ্যোতক, এই রসায়ন শব্দেও তেমনি একার্থের দ্যোতক। নতুবা চরকাচার্য্য সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ ইহার লক্ষণান্তর নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত রস হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবেন কেন? মহর্ষি চরকাচার্য্য রসায়নের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত রসকর্ম্ম হইতে উহা পৃথক্ করিয়াছেন যথা:— "লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্" প্রশস্তরসরক্তাদি ধাতুর লাভোপায় যাহা তাহাই রসায়ন। সুশ্রুতেও উক্ত হইয়াছে—

"যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসিভেষজং তদ্রসায়নম্।"

জরাব্যাধি বিধ্বংসকর ভেষজ যাহা তাহাই রসায়ন। অন্যান্য ভেষজ নহে। এই লক্ষণ ব্যতীত রসায়নের লক্ষণান্তর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না যদি রসায়ন অর্থ রসশাস্ত্র হয়, তবে অলঙ্কার, তন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্তই রসায়ন কিন্তু পাশ্চাত্য কেমিষ্ট্রি কি তাহা বলে

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ দেশীয় মনীষিগণ কোনরূপ অনুসন্ধান বা আলোচনার অপেক্ষা না করিয়া কেমিষ্ট্রিকে রসায়নের অনর্থান্তররূপে কল্পনা করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উহা যে তাহাঁদের ভ্রান্তধারণা, অদূরদর্শিতার মোহময় ফল, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন?

এই ভ্রান্তধারণার কুহকে মজিয়া গড্ডলিকা প্রবাহন্যায়ের অনুসরণ পূর্ব্বক সকলেই চালিত হইতেছেন, একবার ভাবিয়া দেখিতেছেন না, ইহাতে সত্যের মর্য্যাদা কতদূর ক্ষুণ্ণ হইতেছে। হায় নবীকরণ! কতদিনে তোমার সংক্রামকতা হইতে আমাদের আপ্তবাক্য রক্ষা পাইবে, কতদিনে আমরা শান্ত, শুদ্ধ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের অধিকারী হইব?

আগামী প্রবন্ধে আমাদের ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের তপোজ্ঞানলব্ধ রসায়নের বিষয় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।*

শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়, কবিরত্ন।

---

*লেখকের এই বিষয়ে আলোচনা পরিসমাপ্তি হইলে আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করিব। আ:—বি:—স:।

আয়ুর্ব্বেদে ত্রিবিধ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ত্রিবিধা রোগাঃ"।

৬। ত্রিবিধ রোগ—নিজ, আগন্তু, মানস।

১। নিজ—যে সকল রোগ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ দুষ্ট হইয়া সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে নিজ রোগ বলে।

২। আগন্তু—ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদি হইতে যে সকল রোগ সমুৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তু রোগ বলা হয়।

৩। মানস—প্রিয়বস্তুর অলাভ ও প্রিয়বস্তুর সমাগম হইতে মানস-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমানব্যক্তি মানসরোগগ্রস্ত হইলে বুদ্ধির চালনা করিয়া, হিতাহিত বিচার, অহিতকর ধর্ম্মার্থকামসমূহের পরিহার ও হিতকর ধর্ম্মার্থকামের অনুসরণে যত্নবান্ হইবে। ইহলোকে ধর্ম্মার্থ ব্যতিরেকে কোনপ্রকার মানসিক সুখ উৎপন্ন হয় না। অতএব ধর্ম্মার্থ সর্ব্বদাই অনুষ্ঠেয়, এ বিষয়ে জ্ঞানীবয়োবৃদ্ধের সঙ্গ করিবে, এবং স্বকীয় দেশ, কাল, কুল, বল ও শক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না। ধর্ম্মার্থের অনুসরণই মানস-রোগের মহৌষধ যাহাঁরা তত্তৎবিষয়ে অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ তাহাঁদের অনুসরণ করিবে, এবং আত্মবিজ্ঞান সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে।

"ত্রয়োরোগমার্গাঃ।"

৭। রোগের স্থান বা রোগমার্গ তিনটী।

বাহ্য রোগমার্গ, মধ্যম রোগমার্গ ও আভ্যন্তরিক রোগমার্গ।

১। বাহ্যমার্গ—শাখা, শাখাশব্দের অর্থ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সপ্তধাতু ও ত্বক্ ইহারাই রোগের বাহ্যমার্গ।

২। মধ্যমমার্গ—মর্ম্মাস্থি সন্ধি, বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান সকল এবং অস্থিসন্ধি ও তত্তৎপ্রদেশস্থ স্নায়ু কণ্ডরা (স্থূলশিরা) সমূহ মধ্যম রোগমার্গ।

৩। আভ্যন্তরিক রোগমার্গ কোষ্ঠ—কোষ্ঠের অন্যান্য নাম মহাস্রোত শরীর মধ্য, মহানিম্ন, আম ও পক্বাশয় ইহারাই আভ্যন্তরিক রোগমার্গ।

গলগণ্ড, পীড়কা, অলজী, অপচী, চর্ম্মকীল (আচিল) অর্ব্বুদ (আঁব) অধিমাংস (বৰ্দ্ধিত মাংস) অলসক, কুষ্ঠরোগ ও ব্যঙ্গপ্রভৃতি বাহ্যরোগ বাহ্যমার্গ জাত। বিসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শঃ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ ও শাখানুসারী বা বাহ্যমার্গ জাত।

পক্ষাঘাত, অঙ্গগ্রহ, অপতানক, অর্দ্দিত, শোথ, রাজযক্ষ্মা, অস্থিশূল, সন্ধিশূল, গুদভ্রংশাদিরোগ এবং শিরোগত হৃদ্গত, বস্তিগত রোগাদি মধ্যমমার্গানুসারী।

জ্বরাতীসার, বমি, অলসক, বিসূচিকা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, আনাহ, উদর এবং প্লীহাদিরোগও অন্তর্মার্গজাত। বিসর্প, শোথ, গু,ল্ম অর্শঃ ও বিদ্রধি প্রভৃতিকে কোষ্ঠ মার্গানুসারী বা আভ্যন্তর রোগমার্গ বলা যায়।

"ত্রিবিধা ভিষজঃ"।

৮। তিন প্রকার বৈদ্য — ছদ্মচর বৈদ্য, সিদ্ধসাধিত বৈদ্য ও বৈদ্য গুণযুক্ত বৈদ্য।

১। ছদ্মচর বৈদ্য—যাহারা উত্তম বৈদ্যের ভাণ্ডার, ঔষধ ও পুস্তকাদির অনুকরণ ও অনুরূপপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বৈদ্য নাম লাভ করে, সেই অজ্ঞদিগকে ছদ্মচর বা প্রতিরূপক বৈদ্য বলে।

২। সিদ্ধসাধিত বৈদ্য—যাহারা শ্রীসম্পন্ন, লব্ধনামা, লব্ধজ্ঞান বৈদ্য-দিগের পরিচয় বলে চলিয়া থাকে অথচ তাহাদের নিজের কোন গুণই নাই, তাহাদিগকে সিদ্ধ সাধিত বৈদ্য বলে।

৩। বৈদ্যগুণযুক্ত বৈদ্য—প্রয়োগ কুশল, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধিসম্পন্ন, আরোগ্যদাতা ও প্রাণরক্ষক বৈদ্যকেই বৈদ্যগুণযুক্ত অর্থাৎ সদ্বৈদ্য কহে।

'ত্রিবিধমৌষধম্"

৯। তিনপ্রকার ঔষধ—দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজয়।

১। দৈবব্যপাশ্রয়—মন্ত্র, ঔষধিধারণ, রত্নধারণ, মঙ্গলাচরণ এবং বলি, পূজা, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত, তীর্থযাত্রাদিকে দৈব্যবপাশ্রয় ঔষধ বলে।

২। যুক্তি পূর্ব্বক পথ্য ও ঔষধযোজনার নাম যুক্তিব্যপাশ্রয়।

৩। অহিতবিষয় হইতে মনকে সংযত রাখার নাম সত্ত্বাবজয়।

"ত্রিবিধং কর্ম্ম"।

১০। ত্রিবিধ কর্ম্ম—অন্তঃপরিমার্জ্জন, বহিঃপরিমার্জ্জন ও শস্ত্রপ্রণিধান।

১। অন্তঃপরিমার্জ্জন—যে সকল ঔষধ শরীরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আহারজাত ব্যাধি সকল নষ্ট করে তাহাদের নাম অন্তঃপরিমার্জ্জন।

২। বহিঃপরিমার্জ্জন—যে সকল ঔষধ স্পর্শেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রলেপ, পরিষেক ও উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি সহকারে রোগ নষ্টকরে তাহাদের নাম বহিঃ পরিমার্জ্জন।

৩। শস্ত্রপ্রণিধান—শস্ত্রদ্বারা, ছেদন, ভেদন, ব্যধন, বিদারণ, লেখন, উৎপাটন, পৃচ্ছন, সীবন (সেলাই) এষণ ও ক্ষার-জলৌকাদিগকে শস্ত্র-প্রণিধান কহে।

নির্ব্বোধ বালকেরাই শত্রুরন্যায়, উৎপদ্যমান বা সমাগত ব্যাধিকে মোহ বা প্রমাদ বশতঃ প্রথম অগ্রাহ্য করে। রোগ প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবে উৎপন্ন হয়, পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া নির্ব্বোধদিগের বল আয়ু হরণ করে। পীড়া কঠিন হইয়া না পড়িলে মূঢ়ব্যক্তির চৈতন্য হয় না। সে তখন রোগশান্তির নিমিত্ত অস্থির হইয়া স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে থাকে যে, আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কোন সুচিকিৎসক আনাও। কিন্তু কে তখন সেই কঠিনরোগযুক্ত, দুর্ব্বল, ব্যাধিক্ষীণ, ক্ষীণেন্দ্রিয় দীনও গতায়ুব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়? তখন তাহাকে রোগযাতনা হইতে উদ্ধার করিবার লোক জুটিয়া উঠেনা। যেমন লাঙ্গুলাবদ্ধ গোধা (গুইসাঁপ) বলবান কর্ত্তৃক আকৃষ্যমান হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তদ্রূপ ঐ প্রকারে হীনবুদ্ধি ব্যক্তি প্রবলব্যাধির তাড়নায় সাধের জীবন অকালে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। অতএব আত্মহিতৈষিব্যক্তি রোগ জন্মিবার পূর্ব্বেই অথবা রোগ তরুণ থাকিতেই ঔষধ দ্বারা প্রতিকার করিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী, কবিরত্ন।
৩১ নং শোভা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

———

পল্লীচিকিৎসক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুরেন। আচ্ছা, ঠাকুদ্দা. আজ কুকুর বা শৃগালের কামড়ের ঔষধ বল না? হরি। তাই হউক।

(১) দুই ইঞ্চি পরিমাণ হাতীশুঁড়া গাছের মূল ও ছয়টা গোলমরিচ বাটিয়া অর্দ্ধেক খাইবে ও অপর অর্দ্ধেক ক্ষতমুখে বাঁধিয়া ২।৩ দিন রাখিতে হইবে, এইরূপে পাঁচদিন ঔষধ খাইতে ও বাঁধিতে হয়। দশদিনে দংশনজনিত উন্মাদ রোগও আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহারকালে বেগুন খাওয়া নিষেধ এবং ধাতুপাত্রে আহার করিতে নাই। শৃগালের কামড়েরও ইহাতে প্রতিকার হয়।

(২) আতপ চাউল বেশ করিয়া ধুইলে যে সাদা রং এর জল বাহির হয় তাহার সহিত ঝাঁপিটেপারি (স্থল বিশেষ ইহাকে ঝাঁপিপুটলীও বলে) গাছের মূল বাটিয়া খাইলে আরোগ্য হয়।

(৩) তণ্ডুল বাটা সহ মেষলোম ভক্ষণেও বিষ নষ্ট হয়।

(৪) কাঁটালের ভিতর ছারপোকা (উরস) বাটা ভরিয়া খাইলে, কুকুর শৃগাল দংশনের বিষ নষ্ট হয়।

(৫) পাকা কলাতে এক টুক্‌রা বনাত ভরিয়া খাইলেও সারে।

(৬) যে কুকুরে কামড়ায়, তাহার লোম কলাতে ভরিয়া খাইলে ভাল হয়। দেড় বৎসর পর্য্যন্ত কলা খাওয়া নিষেধ।

(৭) কনক ধুতুরার পাতার রস. ইক্ষু গুড় ও দুগ্ধ প্রত্যেক দ্রব্য ৩ হইতে ৫ তোলা পর্যান্ত পূর্ণ মাত্রায় এবং বয়স ও স্বাস্থ্য অনুসারে ১।২ তোলা ইত্যাদিরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করাইলে কুকুর বা বিড়ালের কামড়ের বিষ নষ্ট হয়। ঔষধটী নেশাকারক।

(৮) শৃগাল বা কুকুরে দংশন করিলে আকন্দ পাতার রস এক ছটাক ও কাঁচা দুগ্ধ নূতন শরায় করিয়া পান করিতে দিবেন। ২।৩ দিন খাইতে হয়। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত স্নান, জলপান বা জল স্পর্শ নিষেধ পথ্য দুগ্ধ অথবা চিড়াদুধ; তিন দিন পরে অন্ন সহ ঘৃত ও দুধ খাইবে। শরীরে বিষ থাকিলে ঔষধ বিস্বাদ লাগে না। ঔষধ বিস্বাদ লাগিলে শরীরে বিষ নাই

ইহাই উত্তম পরীক্ষা। বয়স ও শারীরিক বল বুঝিয়া মাত্রা ঠিক করিয়া দিবেন।

সুরেন। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, যদি জলাতঙ্ক উপস্থিত হয়, তবে কি করিতে হয়?

হরি। জলাতঙ্ক উপস্থিত হইলে তালের জটা ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম, ।/। এক পোয়া জলে গুলিয়া রোগীকে সেবন করাইয়া একটি গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিবে। এই রোগের প্রধান ক্রিয়া, রোগী জল দেখিলেই আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উক্ত ঔষধে সে আতঙ্ক দূর হইয়া রোগী জল জল বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। যখন দেখা যায় প্রকৃতই জলের জন্য রোগী কাতর, তখন তাহাকে যথেচ্ছ জলপান করাইতে পারিলেই রোগ দূর হয়। ঔষধের মাত্রা, রোগীর বয়স ও বলের উপর নির্ভর করে, আর ক্ষিপ্ত না হইলে এ ঔষধ কদাচ সেবন করাইবেন না।

সু। এবার বুঝি ২।১টা মন্ত্র বলিবে?

হরি। হাঁ, এই শুনুন ঃ—

"শিয়ালে পিয়ালে বিড়ালে কামড়
মারম তোরে ধরি চমর;
যা সারি যা, দোহাই মত,
দূরে যা, দূর যা, শত হাত।
শরীরে ধরণ বিষের জোর,
শিবের বরে লাগল তোর॥"

উক্ত মন্ত্রে লবণ অভিমন্ত্রিত করিয়া শৃগাল, কুকুর বা বিড়ালে কামড়াইলে সেই ক্ষত স্থানে দিলে শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যায়।

সু। বোল্‌তা (বল্লা), মৌমাছি (মধুপোকা) ও ভীমরুলে কামড়াইলে কি উপায়ে উহার প্রতিকার হয়?

হরি। ক্ষত স্থানে মুথা ঘাসের রস দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবৃত্তি হয়। বিছুটী ঘর্ষণেও জ্বালা থাকে না।

পুঁই পাতা বা হাতীশুঁড়ার পাতার রস মর্দ্দন করিলে জ্বালা শান্তি হয়।

ডাটার রস মর্দ্দনেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কাদামাটী লাগাইলে বেদনা আরোগ্য হয়।

গুহ্যদ্বারে সরিষাতৈল মালিস করিলে অচিরে বেদনা দূরীভূত হয়। ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।

শ্যাওড়া পাতার রস মর্দ্দন করিলে বিষ শীঘ্র নষ্ট হয়। বানরে ভীমরুলের বাসা হইতে ভীমরুল ধরিয়া খায়। দৈবাৎ যদি ২।১টী কামড়ায় তখনই বানর দৌড়িয়া নিকটবর্ত্তী শ্যাওড়া গাছের পাতা আনিয়া তদ্দারা উক্ত স্থান ঘষিতে থাকে। ইহা দেখিয়া, পরে এই ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে।

ক্ষতস্থানে মধু দিলে ভীমরুলের দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়।

বোলতার বিষ—দংশনমাত্র কেরোসিন তৈল মাখিলে জ্বালা হয় না। ও ফোলেনা।

চূণ ও গোবর একত্রে লাগাইলে উপশম হয় দা' স্পর্শ করাইলেও বেদনা সহজে সারে।

দাড়িম পাতা ঘষিলেও উক্ত স্থানের জ্বালা শীঘ্র দূর হয়।

হরি। দেখুন সুরেন বাবু, যদি আমাদের জিহ্বার অগ্রভাগ মুখগহ্বরস্থ তালুতে (তালুকায়) সংলগ্ন করিয়া রাখা যায়, তবে বোল্‌তা, মৌমাছি কি ভীমরুলে শরীরে হুল্ ফুটাইতে পারে না। বাজ পাখী যখন মৌমাছির চাকে ছোঁ মারে, দৈবাৎ উহার মধ্যে পড়িলে আত্মরক্ষার ইহাই একমাত্র প্রধান উপায়।

সু। মাকড়সার গরল হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

হরি। কাঁচাকলার আঠা প্রত্যহ ৩।৪ বার লাগাইলে ২।৩ দিনে উপশম হয়।

সু। চেলার কামড়ের ত বড় যন্ত্রণা! তাহার উপায়?

হ। কচু পাতার রস দি'লে সারে।

সু। ছুঁচার বিষ কিসে যায়?

হ। আমরুল বাটিয়া খাইলে ঐ বিষ দূর হয়।

সু। মৎস্য বিষ?

ওকড়া পাতর ধুম ক্ষতস্থানে দিলে শিঙ্গি মাগুরাদি মৎস্যের বিষ নষ্ট হয়। কাচা কুইনানের উক্ত বিষ সহজে দূরীকৃত করিবার শক্তি অমোঘ ও

আশ্চর্য্য। থানকুনীর রসেও ব্যথা সারে। অগ্নির তাপ লাগাইলে ও বেদনার উপশম হয়।

লোক সচরাচর গোলমরিচ ও কাঁচা লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ দিয়া থাকে।

বিষকাটালী গাছ দিয়াও কেহ কেহ ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ জোরে ঘা দিতে থাকে; ইহাতে বেদনার উপশম হয়।

সু। ভেকে কামড়াইলে উহার স্বতন্ত্র ঔষধ আছে কি?

হ। আছে; শিরিষ বীজ ও ওকড়ামূল, ক্ষীরসহ পিষিয়া সেবন করিলে তিন দিনে আরোগ্য হয়।

সু। কুঙ্কুম, মনঃশিলা, কাকড়ার মাংস, হরিতালও কুসুম পুষ্প সমভাগে পিষিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবেন। ঐ বটী অঙ্গে বুলাইলে উক্ত বিষ নষ্ট হয়।

সু—বৃশ্চিকে দংশন করিলে বড় কষ্ট পাওয়া যায়, তাহার ২।১টা ঔষধ বল।

হরি—ক্ষতস্থানে প্রখর অগ্নিতাপ দিলে বেদনা নিবারিত হয়। বকুলবীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ অসহ্য বেদনা দূরীকৃত হয়।

আম্বলী পাতা ৫।৭ মিনিট ঘষিলে বা দংশন মাত্র কেরোসিন তৈল মাখিলে ব্যথা সারে।

বারংবার তার্পিণ তৈল মালিস করিলে বা চিটেগুড় লাগাইলে অথবা কেঁচোর মাটির প্রলেপ দিলে দংশন জনিত জ্বালা দূর হয়।

উষ্ণঘৃতে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

তুলসী মূল পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া দষ্টস্থানে বুলাইলে বা কাসমর্দ্দ ও কালকাসুন্দের মূল চিবাইয়া কানে ফু দিলে বিষ বিনষ্ট হয়।

একমুষ্টি কুলপত্র, ১ তোলা আন্দাজ লবণের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দষ্টস্থানে বসাইয়া দিবে। একটি চিমটা দ্বারা ১ খণ্ড জ্বলন্ত নির্ধূম অঙ্গার লইয়া তাহার উপর লাগাইয়া দিয়া সেক দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ সেক দিলে অতি অল্পে সময়েই উহার উৎকট বিষের জ্বালা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যে বৃশ্চিকে দংশন করে তাহাকে ধরিয়া উহার নাড়ীভূঁড়ি বাহির করতঃ জ্বালাস্থানে ঘষিয়া দিলে বেদনা সহজেই দূরীকৃত হয়।

মুথা ঘাসের রস লাগাইলেও জ্বালা সহজেই সারে

সু-অন্য কোন বিষের কথা বলনা ?

হ—কোন্ বিষ ?

সু—সর্পবিষ।

হ—সে অনেক কথা ; তাহার পূর্ব্বে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়া রাখুন ; সময়মত পরে উহার আলোচনা করা যাইবে।

সু—তবে কি বলিতে চাও, বলিয়া যাও।

হ—ছায়াশুষ্ক এরণ্ড বৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে শরীরে প্রবিষ্ট যে কোনও প্রকার বিষ নষ্ট হয়।

আঁধার মাণিক ;—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। সাধারণতঃ পতিত ভূমিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের পাতার রস অৰ্দ্ধ ছটাক লইয়া এক ছটাক জল সহ মিশাইয়া সেবন করিলে উদরস্থ বিষ নষ্ট হয়।

কালকাসুন্দা ;—এই বৃক্ষের শিকড় ৭টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া রোগীকে সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয়।

সু—শরীরে পারদ বিষ জমিলে কি করিতে হয় ?

হ—নাটার কচিডগা যাহার গাত্রে এখনও কণ্টকাদি হয় নাই এবং পত্রাদিও সতেজ হয় নাই, সেই ডগা ছেঁচিয়া অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণ রস বিনাজলে বাহির করিয়া প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই শরীরস্থ যাবতীয় পারদ নির্গত হয়। ইহা অতি সহজ উপায়।

কাল তুলসীপাতার রস এক ঝিনুক করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় খাইলে সপ্তাহ মধ্যেই বেশ উপকার পাওয়া যায়।

হংস ডিমের সাদা জলবৎ ভাগ শীতল জল দ্বারা পাথরের পাত্রে আলোড়ন করিয়া পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ উক্তবিষের প্রতিকার হয়।

সু—গায়ে গরল ফুটিলে কি করিতে হয় ?

হ—গরল কি বুঝিলাম না।

সু—যাহাকে সাধারণতঃ আমরা "লাল বা লালা লাগা" বলি।

হ—হাতিশুঁড়ার পাতা বাটিয়া বা সোডা ও চূণ মিশাইয়া বাঁধিলে আরোগ্য হয়।

কমলী (কলম্বী) লতার মূল সৈন্ধব লবণের সহিত থেঁতলাইয়া দিবসে ২ বার পট্টি বাঁধিলে ব্যথা ও ফোলা সারে; ঘা হইলে তাহা শুকাইয়া যায়।

কাঁচা হরিদ্রা দুধে বাটিয়া মাখাইলে বা মাধবী লতার শিকড় বাটিয়া একটু থুথু দিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে অথবা আমলকী পাতা নির্জ্জলা বাটিয়া তাহাতে লবণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

ধুপের ধূম রুগ্নস্থানে লাগাইলেও উক্ত রোগ সারে। চূণ ও তেঁতুল মিশাইয়া পটী বাঁধিলে পরদিন বেদনা স্থানে একটু মরারক্ত জমা হয়। গালিয়া দিলেই জ্বালার উপশম হয়।

বেদনাস্থানে চূণ মাখাইয়া শুকাইলে পরে জল সংযোগে চূণ দ্বারা ঘষিয়া উক্ত চূণ উঠাইতে হয়। ইহাতেও বিষ বাহির হইয়া যায় ও সহজে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

লাল লাগিলে বেগুনের ভিতর উক্ত স্থানটী ভরিয়া রাখিলে কতকটা উপশম বোধ হয়।

হ—দেখুন সুরেন বাবু, অনেকেই লালার প্রথম অবস্থায় তৎস্থানে কোন ও প্রকার কাটার আচড় লাগিয়াছে মনে করিয়া, সূঁচ বা কাঁটা দিয়া উক্ত-স্থান খুঁটিয়া দেখে, এরূপ করিলেই বিপদ। ইহাতে বড়ই যন্ত্রণা দেয় ও রোগ কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষরূপে না পাকিলে সহজে উহাতে অস্ত্র ধরা অকর্ত্তব্য।

আজ এই পর্য্যন্ত; এখন তবে আসি।

সু—আচ্ছা, যাও।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠের (৬ই জুনের) অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—

১। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট পুণাতে এবং বিহার গবর্ণমেণ্ট বাঁকীপুর, মজঃফরপুর এবং পুরীতে যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন, এজন্য উক্ত প্রদেশদ্বয়ের গবর্ণমেণ্টকে এই সভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সভা আর একটী নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট দ্বয়ের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন পত্র প্রেরণ করা হউক, যেন অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও শব-ব্যবচ্ছেদাদি সহিত যথারীতি অধ্যাপনের ব্যবস্থা হয়।

২। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় আসব অরিষ্ট প্রভৃতিকে মদ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া ইহাদের "লাইসেন্স' বিধি প্রবর্ত্তনের সংকল্প করিয়াছেন। এই কার্য্য আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের দৃষ্টিতে অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা হয়। যেহেতু এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে বৈদ্যমাত্রেরই চিকিৎসা কার্য্যে অত্যন্ত অভাব এবং অসুবিধা ঘটিবে। আসব অরিষ্টের মধ্যে কিছু মাত্র সুরাসার বা 'এল্‌কোহল' নাই, যাহাতে নেশা হইতে পারে। সুতরাং আসব অরিষ্ট পান করিয়া কেহ মাতাল (উন্মত্ত) হইতে পারেনা। ইহা সেবনে কেবল রোগীর রোগমাত্রই দূর হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের কখনও মদ্যশ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া উচিত নহে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট "আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল" এই প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, এই সংকল্প তাহাঁরা পরিত্যাগ করেন। এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত প্রান্তীয় সভ্যগণ দ্বারা এক এক উপসমিতি গঠন করিয়া এই প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে যাহাতে আবেদন প্রেরিত হয়, সে জন্য আয়ুর্ব্বেদমহামণ্ডলের মন্ত্রী (সম্পাদক) মহোদয়ের প্রতি ভার অর্পিত হইল। সংবাদপত্র ও জনসাধারণ মধ্যে ও এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত।

৩। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পরিক্ষা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই গৃহীত হইবে এবং পরীক্ষা ফল জানাইয়া প্রমাণ পত্র ও

(সার্টিফিকেট) বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইবে। এই বৎসরের পরীক্ষা আগামী কার্ত্তিক শুক্লপক্ষ অথবা অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে গ্রহণ করা হইবে।

৪। পূর্ব্ববৎসরের প্রকাশিত পরীক্ষাফল অনুমোদিত হইল।

৫। বাড়ীভাড়া বন্ধ করিয়া সহকারী মন্ত্রীকে ২৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া হইবে, নির্দ্ধারিত হইল।

৬। নানা অভাব বশতঃ মহামণ্ডলের কোন মাসিকপত্র বাহির করিতে পারা যায় নাই। মহামণ্ডলের বার্ষিক "রিপোর্ট" এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একখানা ত্রৈমাসিক পত্র অন্ততঃ বাহির করা আবশ্যক, এজন্য বার্ষিক দুইশত কিংবা তিনশত টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারিবেন না। মন্ত্রী এবিষয়ে একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবেন।

৭। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হইলে সে বিষয়ে তাহাঁকে আগামী বর্ষে পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেওয়া যাইবে কিন্তু শতকরা ৫০ নম্বর রাখিতে না পারিলে উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবেন না।

৮। হিসাব পরীক্ষা করার নিমিত্ত লাহোরের পণ্ডিত ঠাকুরদত্ত শর্ম্মা আসিতে না পারিলে একবার সহকারী মন্ত্রী স্বয়ং তাহাঁর নিকট যাইয়া হিসাব পরীক্ষা করাইয়া আনিবেন এবং পণ্ডিত ঠাকুরদত্ত শর্ম্মাকে কলিকাতার সম্মেলনের ২।৩ দিন পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন। তিনি আসিয়া সম্মেলনের পূর্ব্বমাসের পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা করিবেন। *

শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ শুক্ল, মন্ত্রী
প্রয়াগ (এলাহাবাদ)

---

* আমরা প্রয়াগের মন্ত্রী মহোদয়ের প্রেরিত হিন্দীভাষায় লিখিত মহামণ্ডলের কার্য্য বিবরণ তাহাঁরই অনুরোধ ক্রমে বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আঃ—বিঃ—সঃ

বৃদ্ধবাক্য (প্রাপ্ত)।

বৎস, সম্পাদক ভায়া, আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমাকে দু'চারটা কথা না বলিয়াই আর থাকিতে পারিলাম না ; এক সময় তোমার মত আমারও কর্ম্ম করিবার মতি গতি হইয়াছিল। কিন্তু হায়! দুঃখের কথা কি বলিব, সে দিন কালের গর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। বহুদিন নীরব নিশ্চেস্ট আছি, বহু ঝঞ্ঝাবর্ত্তে আপনাকে স্থির রাখা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা কর্ম্মীপুরুষগণ বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকেন। যা'ক সে কথা, অতীতের দুঃখকাহিনীর উদগীরণে আর কোন ফল নাই। ফল কথা—ভীষণ দুর্গম পিচ্ছিলবর্ত্মে ও অচল অটল থাকিয়া অভীষ্ট সাধন কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

এখন আর দেহে ও মনে তেমন বল নাই, শেষের সেদিন কেমন ভাবিয়া, আর তোমাদের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইতেছি। আর একটি কর্ম্ম করি যেখানে কিছু প্রাচীনত্বের গন্ধ পাই, যেখানে যে প্রকার আয়ুর্ব্বেদের নামে দু'টা কথা শুনিতে বা দু'টা অক্ষর লিখা দেখিতে পাই তাই একবার শুনিয়া ও দেখিয়া লই। নবীনতার মোহমদেও এক সময় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ভায়া, দেখিয়া দেখিয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া, মজিয়া মজিয়া আবার সেই চির পুরাতনকেই নবীন বলিয়া আলিঙ্গন দিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে আমার চিরপুরাতন প্রিয় সুহৃদ! তুমি আবার ফিরিয়া এস, বরষার নবীনধারার মত তোমার পুনরাগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া অভিবাদন করিতেছি! নিদাঘের তপ্ত ধরণীর মত আমাদের তপ্ত হৃদয় শীতল কর।

সেদিন নরেন আমাকে একখানা "আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ" কোথা হইতে আনিয়া হাতে দিল, জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"ও বাড়ীর রমেশ এখানা পড়িতেছিল, আমি বলিলাম—রমেশ, তুমি একজন কবিরাজ হবে নাকি, বি এ, এম, এ পাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের ঐ 'কটমট' জঞ্জাল দিয়া আর কি হবে? সেদিন আর নাই, নূতন নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টির সঙ্গে বুঝি আর দাঁড়াইতে পাড়িলনা। রমেশ—নরেন, অমন কথা বলিওনা একবার চোক

খুলিয়া আয়ুর্ব্বেদের দিকে চাহিও তবেই বুঝিবে, আচ্ছা এ বইখানাই একটু পড়না। নরেন—দিতে চাও দেও, কবিরাজ দাদার এদিকে বড় ঝোঁক, তাঁকে দিলেই আমার দেখা হ'বে, এই বলিয়া নিয়া আসিয়াছি।" দেখ নরেন, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না, তোমার পূর্ব্বপুরুষ বড় বড় বিদ্বান বিশিস্ট কবিরাজ ছিলেন, তা'দের কি মান, সম্ভ্রম প্রতিপত্তি ছিল, তা, তোমরা কল্পনাও করিতে পারনা, আজ তোমরা ইংরেজী শিখিয়া ডাক্তারী পড়িয়া এই অবস্থায় পঁহুছিয়াছ, ইহা বড়ই লজ্জার কথা, আজ তোমাদের অবজ্ঞার ফলে কত সেই প্রাচীন রত্ন লোপ পাইয়াছে, সেই সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, শোধিত ও জারিত দ্রব্য, পুরাতন তৈল ঘৃত ইত্যাদি কত নাম করির, যাহা মূল্যদ্বারাও কখন মিলিবেনা? শবৃত্তির অবসরে আজ সেই পূর্ব্ব পুরুষদের গৌরবের কাহিনী স্মরণ করিয়া চোখে জল আসে। দশাবিপর্য্যয়ে আমার বহুপুরুষ চাকুরীজীবী হইলেও তোমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি ও পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া যা' অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যা' কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন তাহাও তোমরা রক্ষাকরিলে কত গৌরবের বিষয় ছিল। সেই সমুদয় প্রাচীন পুঁথি, শোধিত জারিত প্রভৃতি দ্রব্য, কোথায় কিভাবে নষ্ট হইয়াছে আজ তাহার কোন সংবাদই নাই, এই ভাবেই দেশের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে নরেনকে কিছু তিরস্কার করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশখানী আদ্যন্ত পাঠ করিলাম।***প্রকাশিত সমুদয় সংখ্যাগুলিই মনোযোগের সহিত দেখিয়া আসিতেছি। রমেশ বড় ভাল ছেলে, সে প্রাচীন উৎকৃষ্ট পন্থাগুলির বড়ই পক্ষপাতী ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ অন্তর্ম্মুখিনতা বস্তুতঃই বিরল। নরেন ও বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে তার একটি বিশেষ গুণ বা দোষ এই, সে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন বিষয় সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না, অন্ধভাবে সে যার তার কথায় যা, তা' একটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ, যখন তাহার যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখনই সে তাহা নিয়া বিশেষ গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজী এবং ডাক্তারী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ফলেই বোধ হয় তাহার এমন একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কবিরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে তেমন কিছু নাই, যা' দ্বারা তাহার আস্থা হইতে পারে নাই। বৃদ্ধ

বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, আমার প্রতি কিন্তু তার গাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। উহার মতি গতি একটু বাহিরের দিকে বেশী দেখিয়া সময় সময় আমি দু'একটা আয়ুর্ব্বেদের গৌরবের কাহিনী শুনাইতাম এবং আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার ফলও তাহাকে বলিতাম নিঃসম্পর্কিত হইলেও কেন জানিনা সে আমাকে 'কবিরাজ দাদা' বলিয়া ডাকিত আর সময় সময় আয়ুর্ব্বেদের ও অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক খবর আনিয়াআমাকে শুনাইত।

আজকাল এমন অনেক শিক্ষিত ধুরন্ধর দেখা যায়, যাহাঁরা আয়ুর্ব্বেদকে অন্তরে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বাহিরে কপট ভক্তি যেন তাহাঁদের উছলিয়া পড়ে, এমন কপটতায় শতধিক্।

আয়ুর্ব্বেদ রীতিমত না পড়িলে বা ব্যবসায় না করিলেও এমন এক সময় গিয়াছে, যখন বহু আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থীর সঙ্গে একত্র আয়ুর্ব্বেদের মহাভাণ্ডার অবস্থান করায়, আয়ুর্ব্বেদীয় সকল বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ না হইয়াছিল এমন নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিরও দুই চার পাতা যে না উল্টাইয়াছি ইহাও বলিতে পারিনা। বহুকাল চর্চ্চার মধ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম, কতিপয় বৎসরাবধি আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য সময় সময় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের দু'এক পাতা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় নাড়াচাড়া করিয়া থাকি। * * * * *

তোমার পত্রিকা খানি পড়িয়া একদিকে যেমন আশার আলোক দেখিতে পাই, তেমনি আবার কি যেন এক নৈরাশ্যের কালিমা আসিয়া ঘিরিয়া বসে, তাই তোমাকেই দু' একটি কথা সময় ২ বলিয়া দুঃখের কথঞ্চিৎ নিরসন করিব। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছ, এই শুভ অনুষ্ঠানও তাহারই নিদর্শন, কিন্তু কাল বড় প্রতীপগামী তোমার আমার কথা শুনিবে কে, যা'র পড়িবার সাধ আছে তাঁহারা দু'টা মিষ্টিকথায় তুষ্ট করিয়া, কেহবা মুরুব্বী সাজিয়া, কেহবা প্রশংসাপত্র দান করিয়া, কেহবা আয়ুর্ব্বেদীয় মুদ্রিত গ্রন্থের দু'টা অনুবাদের অনুবাদ লিখিয়া পাঠাইয়া 'লেখক' নামের সার্থকতা ও বিনামূল্যে পত্রিকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। এতদ্ভিন্ন যাহাঁদের অর্থ আছে, লিখিবার সামর্থ্য আছে

তাহাঁরাত ইহা আমলেই আনিবেন না। তোমার জিনিস তুমি ভালই বোঝ, তাই ঘরের পয়সা ব্যয় করিতে বসিয়াছ, দেশের লোক আজও তাহা বুঝিবেনা, যদি প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য নিয়া কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, তবে এই বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া কর্ম্ম করিতে থাক, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইওনা, ভগবান তোমাদের সাধু উদ্যমের সহায় হইবেন। বৃদ্ধের কথা বলিয়া রাগ করিওনা বা হাসিয়া উড়াইয়া দিওনা, বৃদ্ধ সময় ২ যা'বলে না করিও অন্ততঃ শুনিয়া রাখিও। বৃদ্ধদের এটা দোষই বল আর যাই বল, তাহারা অনেক সময় অযাচিত উপদেশ দিতে আসে, আমারও যে সে স্বভাব কতকটা না আছে এমন নহে, আজ তোমার প্রতি স্নেহ বশেই হউক, অথবা বার্দ্ধক্যসুলভ সহজ বুদ্ধিতেই হউক, প্রাচীন বুদ্ধিতে অথচ প্রাচীন কথার কিছু পুরশ্চরণ করিতে প্রয়াস পাইব। কথা প্রসঙ্গে অবান্তর অনেক কথা বলিয়া তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম, সূচনায় একটি মাত্র কথা বলিয়াই আজ বিদায় লইব, সময়ান্তরে উপস্থিত হইবার বাসনা রহিল।

বেদ নিত্য, ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ ইহার প্রণেতা নহেন, এইরূপ প্রথিত। আয়ুর্ব্বেদকেও পণ্ডিতগণ নিত্য বলিয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের প্রণেতার এক ইতিহাস পাওয়া যায়, সে আজ আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা সকলেই জান আয়ুর্ব্বেদে 'বৃদ্ধ মত' বলিয়া ও একটা কথা চলিয়া আসিয়াছে। অনেকেই বৃদ্ধ মতের দোহাই দিয়া অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। এই বৃদ্ধ মত বলিয়া কি কোন শাস্ত্র আছে, না লোক পরম্পরা চলিত মতকেই বৃদ্ধমত বলা হয়? এই বৃদ্ধমত কথাটি কতদিনের, কোন্ কোন্‌টি বৃদ্ধমত বলিয়া চলিত, ইহার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তোমরা বা তোমাদের সুযোগ্য লেখকবর্গ প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয়। এই বিষয়টা নিয়া কিন্তু সময় সময় আমাকে বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়। তোমরা যখন ঠেকিয়া পড়, শাস্ত্রের যুক্তিতর্ক দ্বারা আর 'সামাল' চলেনা তখন 'বৃদ্ধমত' তোমাদের সম্বল, তাহাতে দুস্তর সাগরও পাড় হওয়া যায়। এমন সাধের জিনিসটার একটা ইতিহাস থাকা বড়ই প্রয়োজন।

আমি তোমাদের নিকট অন্ততঃ 'বয়সা বৃদ্ধত্বস্পর্দ্ধী' হইলে ও ব্যক্তিত্বের হিসাবে আমার কোন মতামত নাই। তোমরা শাস্ত্রের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া মধ্যে ২ যে দু'একটি তত্ত্বের আভাস দিতেছ সর্ব্বজনবরেণ্য হৃষীকেশরণ্য অন্তর্দ্দর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মগণ শাস্ত্রে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি চোখ্ খুলিয়া বুঝিতে পারি, তবে আর একটা হাত গড়ান বৃদ্ধমতেরইবা কি প্রয়োজন থাকে? প্রকৃত শাস্ত্রসম্বাদী কেন বৃদ্ধের দোহাই দিবে? প্রকৃত শাস্ত্রসম্বাদীর লক্ষণ কি? কেবল শাস্ত্রধ্বজীরইত ছড়াছড়ি! সেই শাস্ত্র-মহাহ্রদ-গভীরে পর্য্যন্ততল কোথায়, তাহা একবারও কি ভাবা উচিত নহে? কেবল গতানুগতিক ন্যায়, কল্পনা তটিনীই অতলস্পর্শিনী,—গড্ডলিকার মরিচিকা! সুখের আশ্রমে দুঃখ-শতশাণিত শরনিকর! কত শাখামৃগ শাস্ত্র-শাখা ফলশুদ্ধ দলন করিয়া দিয়াছে—ইয়ত্তা নাই। আমরা সেই শাস্ত্রের নাম করিয়াই শাস্তি ভোগ করি, বৃদ্ধের দোহাই দিয়া বালকত্বের ব্যসনে পতিত হই, বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে?

যে পর্য্যন্ত আমরা শাস্ত্রের মূল ও ফল ধরিয়া প্রকৃত পরিচয় না পাই, সে পর্য্যন্ত বৃদ্ধ মতই গ্রাহ্য হইবে সত্য, কিন্তু যত শীঘ্র হয় বৃদ্ধ মতের শাস্ত্রীয় তথ্য বাহির করিতে হইবে। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে বৃদ্ধমতই শাস্ত্র, শাস্ত্রেই বৃদ্ধমত এবং বৃদ্ধমতই বেদ—অভ্রান্ত সত্য, সেই মতই বা কোথায় আর মানেইবা কে। বৃদ্ধমত মানিয়া চলিলে কি আর আমাদের এমন দশা উপস্থিত হইত? ভায়া, আমার কথার ধারা সময় ২ আপাত-বিপর্য্যয় বলিয়া ধারণা হইতে পারে, ইহা বেশবুঝি, কিন্তু সময় সুবিধা হইলে এবং সকল কথা বলিয়া যাইতে পারিলে সকলই সোজা হইয়া আসিবে মনে করি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, ঋষির গৌরব গাইয়া লোক আজকাল ব্যবসার জাল পাতিয়া বসিয়াছে। রুজার্ত্ত-ক্ষুধার্ত্ত কত 'কপোত' সেই ফাঁদে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর আপৎকালেই সেই বৃদ্ধের বাণী স্মরণ করিতেছে। তেমন বৃদ্ধইবা কোথায় তেমন শ্রোতাইবা কোথায়? আমি একজন শক্তিহীন, জ্ঞানহীন, কর্ম্মহীন বৃদ্ধ, আমার কথা ছাড়িয়া দিও, তোমরা যখনই কোন কাজ কর, সরলমনা যে কোন বৃদ্ধকে একবার

জিজ্ঞাসা করিও, পরে যথাভীষ্ট চলিয়া যাইও। আমি আশৈশব যত কর্ম্ম বৃদ্ধবাক্য অবহেলা করিয়া করিয়াছি সেথানেই ঠেকিয়া শিখিয়াছি। বৃদ্ধ কে, তাহার লক্ষণ কি, জরসা বৃদ্ধ হইয়াও যে সে মরণের পন্থা বলিয়া দিবেনা, তাহাই বা বুঝিবার উপায় কি; আমরা যে মর্ত্ত্য হইয়াও মরণকে ভয় করি" এই প্রশ্ন করিয়া বসিতে পার, তখন এই বক্তব্য যে, অবোধ শিশুকে অগ্নির দাহিকা শক্তি এবং অনভিজ্ঞকে ভুজঙ্গমের ভয়াবহবিষের বার্ত্তা বলিয়া দেওয়ার মত, প্রকৃত জ্ঞানেরকথা বিজ্ঞানেরকথা যিনি অজ্ঞকে বলিয়া দিবেন তিনিই বৃদ্ধপদবাচ্য সন্দেহ নাই। এমন বৃদ্ধ আছে, শ্রোতা নাই, বালক আমরা আগুণে হাত পুড়িবে, একথা কি আর আমরা শুনি— অগ্নিতে হস্ত প্রবেশ করাইয়া হস্তকে বিহস্ত করিয়া তুলি, সর্পকে মালার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া পরিণামে পরিতাপ করি—বিনষ্ট হই, তখন কর্ত্তব্য— যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিকাশ না হইবে, হিতাহিত না বুঝিবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে ও পথেই ছাড়িতে নাই। যাহাদের জ্ঞান নাই, শাসন মানিবেনা তাহারাই অনধিকারী। অনধিকারী অধিকার লাভ করিতে গেলে যাহা হয়, আজকাল আমাদের ও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বৃদ্ধ খুঁজিতে হয়, বৃদ্ধবাক্য সংগ্রহ করিতে হয়, মান্য করিতে হয়। আবার বলি, বৃদ্ধমত যা' শাস্ত্রমতও তা' কিছুমাত্র পৃথক্ নহে। উহাই বেদ—নিত্য অপৌরুষেয়। আজ এইখানেই বিদায় হই।

(ক্রমশঃ)　কস্যচিৎ বৃদ্ধস্য।

প্রাপ্তি স্বীকার ও পুস্তক পরিচয়।

আমরা বোম্বাইর "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈদ্য যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য মহোদয় প্রেরিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুস্তিকা সকল প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ১। রসহৃদয় তন্ত্রম্। (সটীক) ২। রস প্রকাশ সুধাকরঃ। ৩। গদনিগ্রহঃ (প্রয়োগখণ্ডঃ)। ৪। রাজমার্ত্তণ্ডঃ। ৫। নাড়ীপরীক্ষা। ৬। রসসার। ৭। রস সঙ্কেত কলিকা। ৮। বৈদ্যমনোরমা। ৯। ধারাকল্পঃ। ১০। রসায়ন খণ্ডঃ (রসরত্নাকরান্তর্গত)। ১১। আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশঃ। উক্ত এগারখানী পুস্তকের মধ্যে অদ্য আমরা "রসহৃদয় তন্ত্রম্" নামক প্রথম প্রকাশিত পুস্তকখানারই সংক্ষেপপরিচয় প্রদান করিব। পুস্তকের আকার-ডিমাই অষ্টাংশিত ১৩৫ পৃষ্ঠা। মূল্য একটাকা, ভাষা সংস্কৃত, অক্ষর দেবনাগর, বলাই বাহুল্য। গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীমদ্‌গোবিন্দভবৎপাদাচার্য্য। চতুর্ভুজমিশ্র বিরচিত 'মুগ্ধাববোধিনী' নাম্নী সংস্কৃত টীকা দ্বারা গ্রন্থখানা সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। 'কালে' উপাধি যুক্ত গুরুনাথ পুত্র ত্র্যম্বকশর্ম্মা মহোদয় এই পুস্তকের এক গবেষণা পূর্ণ ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার সম্বন্ধে নানাবিরুদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাই আমরা সমীচীন মনে করিতেছি। এই গ্রন্থের সংক্ষেপপরিচয় ও উপযোগিতাসম্বন্ধে আমরা গ্রন্থের ভূমিকার একদেশ হইতেকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"রসহৃদয় তন্ত্রকার গোবিন্দাচার্য্য বা গোবিন্দভিক্ষুর পূর্ব্বেও পতঞ্জলি-ব্যাড়ি-নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বহু রসবিদ্যাবিদ্ রসতন্ত্রকারের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রও যে সম্যক উপযোগী ও লোকোপকারী হইয়াছিল, ইহা গোবিন্দাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। রস হৃদয় হইতে প্রাচীন রস গ্রন্থ সকল ও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বোধত্ব এবং অজ্ঞাত পরিভাষা সমন্বিত বলিয়া এই গ্রন্থের গুরুত্ব অধিক বিবেচনা করি; বিশেষতঃ প্রাচীন যত রসগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল সম্প্রতি এই একখানী গ্রন্থেরই মাত্র টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই টীকা দ্বারা পুস্তকখানী যে অধিকতর সহজবোধ্য হইয়াছে বলাই বাহুল্য। নানাবিষয়ে ইহার উপযোগিতা দেখিয়াই সর্ব্বাগ্রে এই পুস্তক খানাই প্রকাশিত করা গেল। রসহৃদয় এই নামের যথেষ্ট সার্থকতা দেখা যায়। বস্তুতঃ রসহৃদয় রসবিদ্যার হৃদয় স্বরূপই সন্দেহ নাই। রস বা পারদের অষ্টাদশ প্রকার সংস্কার বা শুদ্ধি কি জন্য করিতে হয়, প্রত্যেক সংস্কারের হেতু প্রভৃতি এই গ্রন্থেই কেবল সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ সংস্কারসম্পন্ন পারদই দেহের যথার্থ সংশোধনও লোহসারে পরিণত করিতে সমর্থ, এইরূপই রস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধি। আজকাল আর ভিষকগণ রসের অষ্টাদশ সংস্কার করিয়া ব্যবহার করেন না। পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থকার অষ্টাদশ সংস্কারের স্থানে কেবল অষ্ট প্রকার সংস্কারের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও আবার কদাচিৎ কেহ করিয়া থাকেন প্রায়ই হিঙ্গুল হইতে উর্দ্ধপাতন করিয়া সেই রস অথবা কজ্জলী করিয়া সেই রসই ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পারদের গন্ধক জারণ (বালিজারণ) প্রভৃতি প্রধান কর্ত্তব্য গুলি কেহ ২ মাত্র অবগত আছেন এবং সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। এই জন্যই রস প্রয়োগের যথোক্ত ফল কেহ পাইতে পারেন না। গন্ধকজারণ ভিন্ন কেবল শোধিতরস কখনও ঔষধে প্রয়োগ করিবেনা, এই কথা শাস্ত্রকার স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, যেহেতু উহাতে প্রকৃত রোগ দূরীকরণের শক্তি উৎপন্ন হয় না। সপ্তদশ সংস্কার সিদ্ধ যে রস তাহাই ভস্মীভূত (রসসিন্দূরাদি) রূপে রসায়ন এবং রোগনাশার্থে লোকের ভক্ষনীয়, ইহাই প্রধান ২ রসতন্ত্রকারগণের অভিপ্রায়।"

আমরা এই পুস্তকখানার মূল ও টীকার যথেষ্ট উপাদেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথার্থই আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। পারদের অষ্টাদশ সংস্কার পদ্ধতি ইহাতে সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। উপরিলিখিত গ্রন্থনিচয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় মাসিকাকারে বাহির হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল দুর্লভ লুপ্তপ্রায় গ্রন্থরাজির উদ্ধার ও প্রচারে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী তথা ব্যবসায়ীর যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থমালার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য মহোদয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমে নানাদিগদেশ হইতে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করতঃ এই সকল অপ্রকাশিত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব পুস্তকাবলী জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেওয়ায় অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এখন দেশের চিকিৎসক মণ্ডলী ইহার অবলম্বনে রস প্রক্রিয়ার উন্নতি বিধানে মনোযোগী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা। আমরা পাঠকবর্গকে অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয়ও ক্রমশঃ প্রদান করিব। পুস্তক গুলির ছাপা কাগজ মলাট প্রভৃতি বেশ পরিপাটি ও চিত্তাকর্ষক।

আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক ভগবান ধন্বন্তরি।
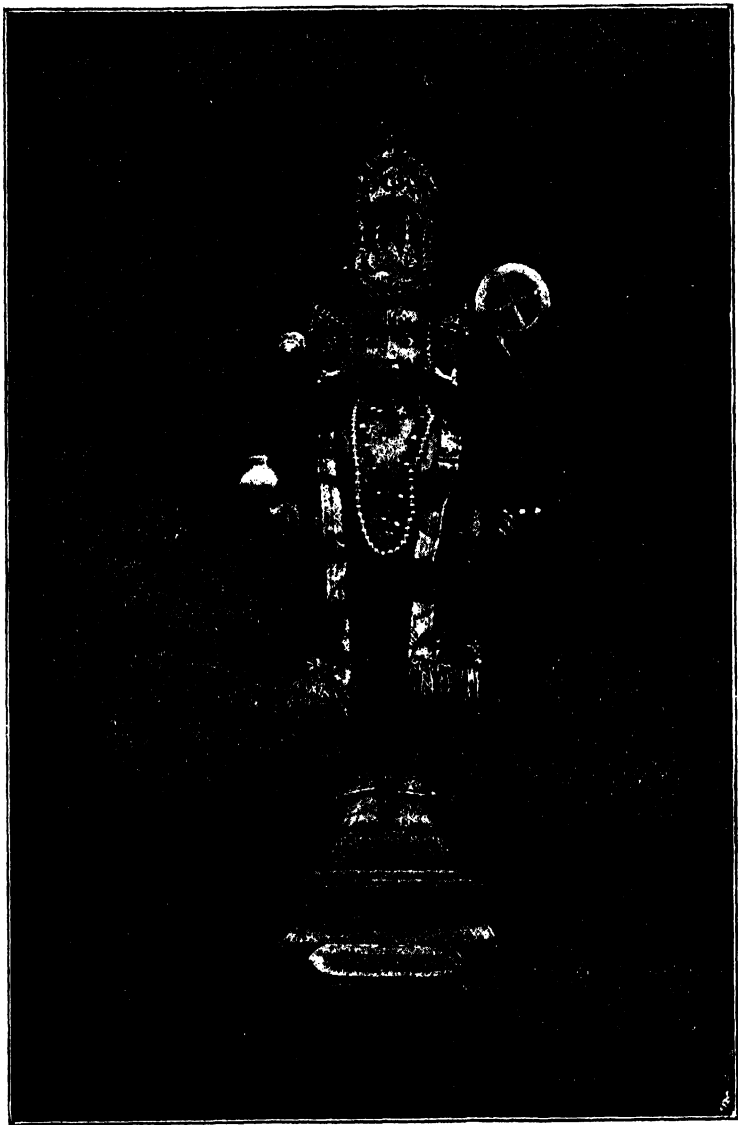
(হিন্দী বৈদ্যকল্পতরু হইতে গৃহীত)

"প্রাণোবা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"
বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ } ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩২১। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আহার-সমস্যা।

(২)

প্রাণিমাত্রেরই জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কোন না কোন আহারের প্রয়োজন। তখন তাহারা 'অনায়াসলভ্য যা' কিছু আয়ত্ত করিতে পারে তাহাই উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করে। আহার ব্যতীত কি কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে? শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "প্রাণিনামাহার-মেবমূলম্" আহারই সর্ব্বসম্পদের মূল। আহারের উপরই প্রকৃতি, বল, বর্ণ, আয়ু সমুদয় নির্ভর করে। ভগবান সকল প্রাণীরই প্রকৃতি-সুলভ আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। জীব কঠোর সংগ্রাম করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে। যদিও খাদ্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম দেখা যায়, এই প্রাণীর এই খাদ্য, এই

অখাদ্য। কিন্তু প্রকৃত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, কোন্ প্রাণীর যে কি খাদ্য তাহা আজও কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, এজন্য জীব-সঙ্ঘে আহার-সমস্যা কেবল সামান্য নহে। সর্ব্বচিন্তা হইতে আহার চিন্তাই সর্ব্বত্র প্রবলা। বিষ্ণু শর্ম্মার কথায় আমরা বলিতে পারি সমস্ত অন্ন-পানীয় আমাদের আশঙ্কাজনক অথবা সকল বস্তুই প্রাণীর খাদ্য সন্দেহ নাই। আমরা জঠরানল ও জীবন রক্ষার অত্যুৎকট কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আশঙ্কাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আগেই ভোজন করিয়া লই, বিচার কিন্তু পরে করি। বিচার কি আমাদের কখনও নিরঙ্কুশ হয়, বা বিচারের ক্ষমতা আমাদের আছে? কিন্তু আমরা মনে করি, আমরা বিচার করিয়াই আহার করিয়া থাকি। এই ধারণার ফলেই মানবসমাজে নানা শাস্ত্রবিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল আহারের মূলেই সমুদয়। আহারের অন্বেষণেই জীব অহর্নিশ ছুটিতেছে। আমরা জীবন রক্ষার জন্য আহার করি কিন্তু সেই আহারই আবার আমাদের জীবন পাত করিতেছে, আমরা কি তাহা বুঝি? আমরা আহারের জন্যই মর্ত্ত্য বা মরণোন্মুখ। যাঁহাদের আহার নাই তাঁহারাই কিন্তু অমর, স্থিতিশীল, গতিশীল উন্নতজীব। তবে কি আহার না করিলেই অমর হওয়া যায়—বিচার শক্তি কি আমাদের নাই? এই প্রশ্ন ও বড় শক্ত। জীবের আহার আবশ্যক কি না এবং কাহার কোন্ আহার উপযোগী, আহারের পরিণাম কি, সে চিন্তা ও অতি বলবতী।

প্রাণীর অখাদ্য কি? বিশেষতঃ মানবকে সর্ব্বভুক বলিলেও অন্যায় হয় না। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে আহার বিষয়ে সাধারণতঃ একটা নিয়ম দেখা যায়, কিন্তু কেবল মানবেই তাহার ঘোর ব্যতিক্রম। মানব বিজ্ঞান বলে কিন্তু আহার্য্য সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বই আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার মূলেই বা সত্য কতটুকু? আবার বিজ্ঞান থাকিলেও খাওয়ার বেলায় আমরা বড়ই দিশাহারা এবং ঘোর স্বেচ্ছাচারী।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক আমিষজাতীয় আহার্য্যকেই মানবের প্রধান খাদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আবার কেহ বলেন মানবের উহা খাদ্যই নহে, নিরামিষই মানুষের খাদ্য। দুগ্ধকে যে আমরা চিরকাল এত ভালবাসি সেই দুগ্ধ ও আমাদের শৈশব ব্যতীত অন্য কালের খাদ্য নহে বলিয়া কেহ কেহ

মত প্রকাশ করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন অন্নই আমাদের প্রাণ, ধান্য ইহার মূল এই জানি কিন্তু এই অন্ন ভোজীদিগকে আবার কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। পরন্তু মানুষ কি কেবল মাংস ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেনা? মানুষকে কি অপক্ক তৃণ পত্র কন্দমূল ফলে দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায় না? পক্ক অন্ন খেয়ে ও কি খাদ্যের পূর্ণতা হয় না? আমিষভোজী ও নিরামিষ ভোজীদের তুলনা করিলে কি জ্ঞান লাভ হয়? ভোজন ব্যাপারে আমরা আত্মকৃত বিধানকেই ভগবদ্দত্ত বিধান বলিয়া মানিয়া লই, ভগবদ্দত্ত বিধান যে কি, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি? এইরূপ কত না কি জল্পনা স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

যখনই খাদ্য সম্বন্ধে কথা উঠে তখনই আমরা অন্য প্রাণীর খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতে উৎসুক হই। সিংহ ব্যাঘ্র মাংস-ভোজী হইয়া এরূপ বলবান আমাদের ও মাংস আহারে সেইফল, কেন মাংস ত্যাগ করিব? হস্তী তৃণ ভোজী হইয়া কেমন বিপুলদেহী বলী, দীর্ঘজীবী, কেন আমরা মাংস খাইব? তৃণ-শস্যই উত্তম খাদ্য; মাংস মনুষ্যের খাদ্যই নহে। এইরূপ নিয়ত কত কি কল্পনা অনুষ্ঠান চলিতেছে, মীমাংসা কোথায়? "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" এই বলিয়া সকল সংশয় দূরে ঠেলিয়া রাখা হয়। প্রকৃত জ্ঞানীসকল কিন্তু ইহাও শুনিতে প্রস্তুত নহেন। আরও দেখুন, গোদুগ্ধ বৎসের খাদ্য মানব তাহাতে অনধিকার অভ্যাস করে কেন? কোন কোন পণ্ডিত বলেন দশদিন খাও আবার দু'দিন উপবাস দেও। "জঠরানল থাকিতে উপবাস দিব, এ বড় মর্ম্মান্তকর কথা। প্রাণ যা'ক উপবাসী রহিবনা।" যা'র অন্ন জোটেনা সে উপবাসে থাকিবে, যা'র সান্নিপাতবিকার সে লঙ্ঘন করিবে। আমি রাজরাজেশ্বর, অন্নদাতা, "ভূস্বামী, আমার উপবাসের প্রয়োজনকি?" "আমি সিংহবলে বলিয়ান, জরা ব্যাধিকে পদাঘাত করি, আমি রোগীর পথ্য, ক্ষয়ের নিদান, গ্লানির আকর লঙ্ঘনের বশ্যতা স্বীকার করিব?" কিন্তু এই আবার কি দেখি, ওই দেখ চতুস্তল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত দেহ নাগরিক জন, যার গৃহে অনবরত চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয় পক্কান্নের পবিত্রগন্ধে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিয়া পান্থজনের রসনাও সরস করিয়া তুলিতেছে, সেই বিলাসিজনও আজ অকাতরে অনশনব্রত অবলম্বন

করিতেছেন। ওই যে কানন প্রান্তে অমৃতময় ফল ভরে নমিতশাখ তরুতলে তেজঃপুঞ্জ দীপ্তদেহখানী রহিয়াছে, কে জানে সেই সুমিষ্টফল গ্রহণেও তাঁহার করযুগল কোন্‌শাপে অসার হইয়া রহিয়াছে, রসনাও যে তাঁহাদের লালসায় কুণ্ঠিত। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আবার দেখ, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ভীষণ ছায়া! কত লোক অনশনে অর্দ্ধাশনে হাহাকার করিতেছে, দে অন্ন, দে অন্ন, প্রাণযায়! প্রাণযায়! অন্নাভাবে কত অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু, ব্যাধি, মহামারী—দৈন্য উপস্থিত! ইহা ও কি দেখিতে পাও না যে, নিত্য সুভিক্ষ্য স্বচ্ছন্দ সুখাহৃত-সম্ভার দেশের অবস্থা-অতিভোজন অকালভোজন কত মানবকে মরণের পথে আকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ আহারই কি প্রাণ, আহারেই কি সুখ—দুঃখ—জরা—মৃত্যু? রসনার তৃপ্তিকেই আহার বলিব, কি মুখ্য প্রাণের গতিলাভের উপায়কেই আহার বলিব। অনাহারেওত প্রাণের গতি দেখা যায়, তবে বলিতে পার, কোন না কোন আহার তাহাতেও কল্পনা করা যায়, যে বায়ুমাত্র অবলম্বন করিয়া প্রাণের স্থিতি, সেই বায়ুও আহার বিশেষ, কিন্তু এইকথা বলিলে রসনার তৃপ্তিই কেবল আহার নহে। প্রাণরক্ষার অনেক উপায় বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রাণের গতির ও স্থিতির মর্য্যাদা কতটুক তাহাই দেখিতে হইবে। জীব শুধু বায়ু বা জল ভক্ষণ করিয়া কতকাল বাচিতে পারে, আর রসনার স্বরস তৃপ্তিতেই বা জীবনের পরিমাণ ও পরিণাম কি দাঁড়ায়? রসনার অর্গল একবারে রুদ্ধ করিয়া দিলে অথবা অনর্গল ছাড়িয়া দিলে কি হয়, তাহাত আমরা অহরহঃই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি রসনাকে সংযমের রশ্মিদিয়া বাঁধিয়া রাখিতেই মনীষিগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ব্বর জাতি—ইতরপ্রাণীর কর্ণে তাহা মধুবর্ষণ করেনা, তাহারা এই অনুশাসন মানেনা। তাহারা ও কি প্রাণের প্রাণ স্বাস্থ্যসার নিয়া সংসারে বিচরণ করেনা?

প্রাণীর খাদ্য কি? বস্তুতঃ খাদ্যের কোন বিধি ব্যবস্থা নাই, প্রাণী নিজ বুদ্ধি সামর্থ্যে যা' জুটাইতে পারে, তাহা খাইয়াই জীবনধারণ করে। বাঘে মাংস খায়, কিন্তু "ঠেকিলে বাঘেও ধান খায়" ইহা যদি ও প্রবাদবাক্য কিন্তু এই কথাটা একবারে মিথ্যা নয়। বাঘের যা, খাদ্য বিড়াল কুকুরের ও প্রায় তাই খাদ্য, কিন্তু গৃহপালিত কুকুর বিড়ালও মাংস পাইলে ভাত

স্পর্শ ও করেনা, কিন্তু অভাবে ইহারা শুধু ভাত সর্ব্বদাই উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। বলিতে পার তাহাতে উহাদের তেমন পুষ্টিও আয়ু বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু এই কথাও স্বীকার করা যায় না। শুধু ভাত খাইয়াও কুকুর বিড়াল এমন হৃষ্ট পুষ্টি ও বলবান হয় যে, যাহা মাংসাসী কুকুর বিড়ালেও অনেক সময় দেখা যায় না।

জলের মাছ স্বজাতিকেও খায়, না পাইলে মৃত্তিকা, শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করে, তাহাও যদি না জুটে, বহুকাল অনাহারে থাকিয়াও বুঝি মারা যায় না। মানুষ যদি তাহার নিজখাদ্য কিছু অনুগ্রহ বা নিগ্রহার্থ উহাদের দান করে, তখন তাহারা সেই খাদ্যও মহোল্লাসে উদরস্থ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে প্রয়াস পায়। জঠরযন্ত্রণায় অনেক প্রাণী যে নিজ নিজ সন্তানকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই।

কত মুনি-ঋষি মনীষী ক্ষুন্নিবৃত্তি ও প্রাণের জন্য কত কি না ভক্ষণ করিয়াছে, তাহারও বহু প্রমাণ রহিয়াছে। খাদ্যের বিচার বিতর্ক উপস্থিত হইলেই মনে হয়, খাদ্য নিজ যোগ্যতা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। তুমি অন্নজীবী অন্ন না জুটিলে কি কর? তখন বনের ফল, জলের মাছ, বৃক্ষ-পত্র, তৃণ যা' জোটে তাহাই তোমার উত্তম খাদ্য, শাস্ত্র, সভ্যতা তখন স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। আমরা আহারের ভাল মন্দ যদিবা বুঝি কিন্তু জোটে কই, আর জুটিলেও সর্ব্বত্র বিচার থাকে কোথায়? জগৎটা যেন ক্ষুধারই রাজ্য, কেবল দেহি দেহি রব—খাই খাই এই উদ্যোগ পর্ব্ব।

মানুষ দিনের দিন যে কত খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহার সংখ্যা করিবারও কাহারো শক্তি নাই। খাদ্যগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক স্বাভাবিক, অপর কৃত্রিম। ইহারা কতক আমিষ জাতীয় কতক শস্য জাতীয়। স্বাভাবিক, খাদ্যেরপ্রতি দিন দিনই লোকের অনাস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে, কৃত্রিম আহারের জন্যই এখন সকলে লালায়িত। বস্তুতঃ লালায়িত হওয়ারও কথা। মানুষ যতই জ্ঞান বিজ্ঞান লাভকরে, ততই তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় করিয়া লইয়া থাকে। যদিও বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় নানারূপ সুখের পন্থা অবিষ্কার হইয়াছে সত্য, কিন্তু আহার বিষয়ে লোক সকল আজও যে কত বিশৃঙ্খল তাহা

বর্ণনাতীত। জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত সভ্যপদ বাচ্য দেশের লোকও কত যে অপকৃষ্ট অজ্ঞানোচিত আহার গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞাত নহে। আহার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে কত প্রভেদ তাহার সীমা নাই। সকল দেশের আহার পর্য্যালোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দুগ্ধ ঘৃত যে এমন উপাদেয় খাদ্য তাহাও কোন কোন দেশের লোকের নাসিকাকে কুঞ্চিত করিয়া দেয়। আর বস্তুতঃ যে, অখাদ্য অপকৃষ্ট—কতখাদ্য—রোগ দুঃখের আকর, এমন অসার জিনিসও মহাদরে কত সভ্যতাভিমানী লোক উদরস্থ করিয়া লইতেছেন।

খাদ্য সম্বন্ধে যে কত বাক্ বিতণ্ডা, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। দুগ্ধ যে লোকের খাদ্য নহে ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার দেখ একজন কৃতবিদ্য উচ্চ উপাধিধারী একদিন কথা প্রসঙ্গে বালিয়াছিলেন। শুষ্ক (শোরা) মাছ উপাদেয় খাদ্য, টাট্‌কা মাছের অভাব উহা দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। ইহার সমর্থনজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, ঔষধি সকল যখন শুষ্ক হইয়াও গুণহীন হয় না, তখন মৎস্যই বা শুষ্ক হইলে কেন গুণহীন হইবে? ইত্যাদি। এইরূপ মানুষ নিজরুচি, জ্ঞান, দ্রব্যের সুলভতা, অভাব প্রভৃতির বশবর্ত্তিতায় কত প্রকার মতই না প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেখিতে হইবে প্রকৃত বিচার কোথায়?

কতগুলি এমন খাদ্য পানীয়াদি লোক ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন যে, তাহার প্রয়োজনীয়তা আবার অনেক উপলব্ধি করিতে আদৌ পারেন না। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্মই করা উচিত নহে, ইহা যদি সত্য হয় তবে অবাস্তর উপসর্গ ব্যাধি-পাপ কেন লোকে জুটাইয়া লয়? বলিতে পার, যে যাহা জুটায় তাহারই প্রয়োজনীয়তা সে বুঝিয়া থাকে, বস্তুতঃ একথা আমরা সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশভাবে গ্রহণ করিতে পারিনা। দেখ চা, চুরুট, কাফি, কোকেইন, তামাক, পান, সিদ্ধি, আফিং, মদ প্রভৃতির বশীভূত হওয়ায় কত জনের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে? ক্ষুধায় আহার এবং রোগে পথ্য না জুটিলেও লোকে কি এই ব্যসন ছাড়িতে পারে? সকলেই যদি মানবের আহার হয় তবে আর আহারের ব্যসন নামটি দেওয়া চলেনা। তবে বলিতে পার

অত্যাসক্তিই ব্যসন। যাহা প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় তাহাতে অত্যাসক্তি না হইলে চলিবে কেন? আহারের অত্যাসক্তি, অনাসক্তি ও উপযুক্ততাই কিন্তু সকলের লক্ষ্য। লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে পারিলেই সুখ ও স্থিতি। (ক্রমশঃ)

আহরণ—

যক্ষ্মারোগের ঔষধ চিকিৎসা।

(হিন্দীর অনুবাদ)

যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় যখন ফুস্‌ফুসে গুটিকা সঞ্চয় হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় যোগরত্নাকরোক্ত কুমুদেশ্বররস গোলমরিচ চূর্ণ ২ রতি ও একমাষা পরিমাণ গুড় সহ বেশ মর্দ্দন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গুটিকা সঞ্চয় হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ ফুস্‌ফুস্ ব্যাধি-মুক্ত হইয়া রোগীকে আরোগ্য দান করিবে। উক্ত ঔষধ সম্পৃক্ত মনঃশীলা ও অভ্র ফুস্‌ফুস্‌কে শোধন করিয়া দেয় এবং লৌহ শরীরের রক্তকণিকা বৃদ্ধি করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করে।

সম্বলক্ষার (যাহাকে শিমুলক্ষার, শঙ্খবিস, দারমুজ, শেঁকো প্রভৃতি বলা হয়। হিন্দীনাম সোমল বা সংখিয়া শ্বেত) $\frac{১}{২০০}$ রতি (একরতির দুইশত ভাগ মাত্রা) গরুর দুধের সহিত প্রাতঃকালে একবার অথবা দিনে দুইবার দিবে। ইহাদ্বারাও উপরোক্ত প্রকার ফল পাওয়া যায়। এই তীব্রবিষঘটিত ঔষধ রোগীর বা রোগীর আত্মীয়গণের সম্মতি ভিন্ন নিজ কর্তৃত্বে দিবেনা। চিকিৎসক এই ঔষধের মাত্রা নির্ব্বাচন করিতে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন।

যক্ষ্মারোগীর যদি জ্বর না থাকে, তবে শুষ্ক কাসের জন্য চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশাবলেহ অর্দ্ধ তোলা হইতে একতোলা পরিমাণ ছাগলের দুধের সহিত প্রাতঃকালে খাইতে দিবে। আবশ্যক মত উপরোক্ত কুমুদেশ্বর রস সন্ধ্যাকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পুষ্টির আবশ্যক হইলে চ্যবনপ্রাশ না দিয়া প্রাতঃকালে চরকোক্ত অমৃতপ্রাশ, অথবা ছাগলাদ্য ঘৃত দিবে। যোগরত্নাকরোক্ত খর্জ্জূরাসব, দ্রাক্ষাসব অথবা পিপ্পল্যাদি অরিষ্ট আহারের পর একতোলা কি দুই তোলা মাত্রায় সেবন

করিতে দিবে। এই ঔষধদ্বারা সত্বরেই পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি ও বলের উপলব্ধি হইবে। কাস দমনের নিমিত্ত শার্ঙ্গধরোক্ত তালীশাদি চূর্ণ ।০ আনা বা ছয় আনা মাত্রায় মধু সহ দিনে ৩। ৪ বার করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রক্তনিষ্ঠিবন (মুখদিয়া রক্ত বাহির) হইলে লাক্ষা চূর্ণ ৪ রতি হইতে ৬ রতি মাত্রায় ছাগদুগ্ধ বা জলসহ দিনে দুইবার করিয়া দিবে। অথবা শ্রীবাস তৈল (তারপিন তৈল) ১০ বিন্দু * * * * * জল মধ্যে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি শুষ্ক কাসের প্রাবল্য থাকে তবে উপরোক্ত ঔষধ সঙ্গে ভৈষজ্য রত্নাবলী কথিত অহিফেণাসব। ১০।১৫ বিন্দু মিলিত করিয়া দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা ফিট্‌কারী ৫ রতি সজল গন্ধকদ্রাবক ১০ বিন্দু ২॥ তোলা জলদ্বারা মিলিত করিয়া সেবন করিতে পারিবে।

যদি কাসেরসহিত অত্যধিক শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়, তবে তন্নিবারণার্থ রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত অহিফেণবটী ভৈষজ্যরত্নাবলীর উক্ত শশিপ্রভাবটী প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মার অল্পতা ও কাসেরপক্ষে উপকারী হইবে, পরন্তু এই বটী রাত্রিতে সেবন করিলে উত্তম নিদ্রাও হইবে। ইহাও জানা আবশ্যক যে অত্যধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে তন্নিবারণের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ শ্লেষ্মার নিঃসরণ সুখজনক অথচ অনিষ্টকারক নহে।

যদি কাসের সহিত রক্ত অথবা পূযযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, আর মৃদুজ্বর বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে রসেন্দ্রসারসংগ্রহের যক্ষ্মাধিকারোক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস, ক্ষয়কেশরী, যক্ষ্মারিলৌহ, রাস্নাদিলৌহ প্রভৃতির উত্তম ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক বাসক পত্র রস অথবা অন্যান্য উপযুক্ত অনুপান সহ দেওয়া উচিত। যদি ইহাতেও তেমন ফল না পাওয়া যায়, আর রোগ বহুদিনের হয়, তবে রসেন্দ্রসার সংগ্রহোক্ত মৃগাঙ্করস গোলমরিচ চূর্ণ প্রভৃতির সহিত প্রয়োগ করিবে।

প্রবল জ্বর অথবা মধ্যজ্বর এবং তৎসঙ্গে কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত কাঞ্চনাভ্র রস অথবা রাজমৃগাঙ্করস পিপ্পলী চূর্ণ মধু অথবা মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত সহ দিনের মধ্যে একবার করিয়া দিবে। পার্শ্বশূল ও শিরঃশূলেও ইহা বিশেষ উপকারী।

শ্লেষ্মাসহ মিশ্রিত হইয়া অল্প অল্প রক্ত নির্গত হইলে ভৈষজ্যরত্নাবলীর এলাদিগুড়িকা, চরকোক্ত সিতোপলাদিলেহ, বাসাকুষ্মাণ্ডাবলেহ, কিংবা বৃহৎ বাসাবলেহ ছাগদুগ্ধ সহ প্রয়োগ করিবে।

নিশাস্বেদ (রাত্রিকালে যে ঘর্ম্ম হয়) নিবারণার্থ প্রবাল ভস্ম ২ রতি অথবা যশদ (দস্তা) ভস্ম ১ রতি কিংবা ধুস্তূরবীজ অষ্টমাংশরতি (এক রতির আট ভাগের একভাগ) ও যশদ ভস্ম ১ রতি সহ মিলিত করিয়া মধু বা চিনির সঙ্গে দিনে একবার প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার হয়।

অত্যন্ত শ্লেষ্মা নির্গমের সহিত শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে রসেন্দ্রসার-সংগ্রহোক্ত বসন্ততিলকরস ২ রতি মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। শ্বাসের বেগ অত্যধিক প্রবল হইলে শ্বাস চিন্তামণি অথবা শ্বাস কাস চিন্তামণি বহেড়া চূর্ণ ৪ রতি মধু দুই আনী সহ প্রয়োগ করাইবে।

যদি শ্লেষ্মা বাহির হইতে রোগীর কষ্ট অনুভব হয়, তবে চন্দ্রামৃত রস আদার রস দুই আনী ও মধু ১০বিন্দু সহ অথবা কর্পূর ১রতি মধু ১০বিন্দুসহ প্রয়োগ করাইলে সহজে শ্লেষ্মা নির্গত হইবে এবং কাসের পক্ষে উপকারী হইবে।

যদি ফুস্‌ফুসের আবরণে শোথ হইয়া রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস প্রয়োগ করান কর্ত্তব্য।

রোগীর জ্বর প্রবল হইলে রোগীকে বিশ্রাম পূর্ব্বক শয়ন করাইয়া আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা বেশ করিয়া শরীর মার্জ্জন করিয়া দিবে, ইহাতে জ্বরের সন্তাপ লাঘব হইবে। এই অবস্থায় বিষমজ্বরান্তক লৌহ (পুটপক্ক) জয়মঙ্গল রস প্রয়োগ করান উচিত।

রোগীর অতিসার বিদ্যমান থাকিলে নৃপতিবল্লভ রস, মহারাজ নৃপতি বল্লভ অথবা রস পর্পটী প্রভৃতি সেবন করাইলে ফল পাওয়া যাইবে।

যদি রোগীর শোথ দেখা যায় তবে স্বর্ণ পর্পটী, লৌহ পর্পটী পঞ্চামৃত পর্পটী প্রভৃতির অন্যতম ঔষধ সেবন করাইলে উপকার হইবে। রোগের তৃতীয় অবস্থায়ই প্রায় শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই অবস্থা কঠিন বলিয়া বুঝিবে। * "বৈদ্যভূষণ" (লাহোর)।

* ৩৬ পৃষ্ঠার ৬ পঙ্‌ক্তির তারকা চিহ্নিত স্থানে 'বাবলার গঁদ ভিজান' এই শব্দটি যোজনা করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

আহরণ—কৃত্রিমতা।

এমন একটা সময় আসিয়াছে যে, কেহ কাহাকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। কেহ কাহার প্রতি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না অথচ একজন আর একজনের উপরে দায়ে পড়িয়া জীবন সমর্পণ করিতেছে। বলিতে গেলে যে যাহার রক্ষক ব্যবহার দোষে সেই তাহার ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইতেছে সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে জীবনধারণ করা মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত জনের পক্ষে এক বিড়ম্বনার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা প্রয়োজন। দুগ্ধ দেহরক্ষার পক্ষে পরম বস্তু; সেই দুগ্ধ প্রতি দিন গোয়ালা জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। গোয়ালার বাড়ীতে ত কত প্রকার সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইতেছে, সে তাহা গোপন করিয়া রোগের বীজ ছড়াইতেছে। ঘৃতের মত বলকারক পদার্থ বাঙ্গালি-জীবনের পক্ষে দ্বিতীয় নাই, কিন্তু সে ঘৃত আজ কোথায়? ঘৃতের কানেস্তারার ভিতরে দুই একটী ঘৃণিত ও ত্যক্ত পদার্থ ব্যতীত না পাওয়া গিয়াছে এমন পদার্থ নাই। তাহার প্রমাণ কলিকাতা মিউনিসিপাটীর পক্ষ হইতে প্রতি সপ্তাহে দোকানদারের নামে অভিযোগ ও শাস্তির তালিকা। এই ঘৃতপক্ক খাদ্য হইতে বাঙ্গালীর দেহে অসংখ্য রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া সকলকে চিররুগ্ন করিয়া তুলিতেছে। মৎস্য-বিক্রেতা পঁচা মাছের উপরে তাজা মাছের রক্ত মাখাইয়া তাজা বলিয়া অপরিপক্কবুদ্ধি ক্রেতার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে। তণ্ডুল-বিক্রেতা পুরাতনে নূতন তণ্ডুল মিশাল দিয়া পুরাতন বলিয়া বিক্রয় করিতেছে। ঔষধ বিক্রেতারা খাটি ঔষধে ভেজাল দিয়া অল্প মূল্যে কৃত্রিম ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। আবার ফলবিক্রেতা ক্রেতাদিগকে নিরন্তর ঠকাইতেছে। এমনি করিয়া মিঠাই বিক্রেতা তাহার বহু দিনের পর্য্যুষিত মিঠাইগুলিকে ঘৃত-চিনি-সংযোগে নূতন ব্যপদেশে অহরহ বিক্রয় করিতেছে। হোটেলওয়ালারা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিবর্গকে পর্য্যুষিত অন্নব্যঞ্জন বণ্টন করিয়া—অবাধে অর্থ গ্রহণ করিতেছে এমনি করিয়া চতুর্দ্দিকে কেবল কৃত্রিমতার ক্রীড়া চলিতেছে পদেপদে আশঙ্কা। জীবন-ধারণ শঙ্কটাপন্ন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের জীবনধারণ ব্যাপারেই যে কেবল কৃত্রিমতা চলিতেছে তাহা নহে। যে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা, বিচার অবাধে এই কৃত্রিমতার চাল চালিতেছে দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতেছে প্রকৃত পক্ষে সেই মানুষগুলিই ত কৃত্রিম—ছদ্মবেশী—অবিশ্বাসী হইয়াও বিশ্বাসী সাজিতেছে। মানুষের বিচার ও বুদ্ধির ভিতরেই ত আগে ভেজাল আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; এই অর্থে বর্ত্তমান সময়ে অকৃত্রিম খাঁটি মানুষ বড় দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ক্ষেত্রে লোক যুধিষ্ঠির সাজে, লক্ষ্মণ সাজে; প্রকৃত পক্ষে সে যুধিষ্ঠির নহে, লক্ষ্মণও নহে, তেমনি সভ্যতার দিনে সাজ-পোষাকের আবরণে মানুষের প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া কঠিন হইয়াছে। বিদ্যালয়ে শিষ্য গুরুর কাছে স্বকীয় অভাব ও মূর্খতা গোপন করিয়া নিজকে বুদ্ধিমান্ ও অধীতবিদ্য বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছে। গুরুও শিষ্যের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষার্থ ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ শিক্ষাদানে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বিচারালয়ে ব্যবহারজীবিগণের সহিত মক্কেলের কৃত্রিমতা চলিতেছে। আইনের ফাঁকে রামের ধন শ্যামের হইয়া যাইতেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিবাহ ব্যাপারে নূতন কুটুম্বিতার স্থলে দুই পক্ষ নিজ নিজ সাজ সজ্জা প্রদর্শন করিয়া স্বরূপ গোপন করিতেছে। দেশ-হিতৈষণার ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ দেশচর্য্যা দুর্ল্লভ হইয়াছে। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির অভাব হইলে সেস্থানে হিতৈষণা ফুরাইয়া যাইতেছে। সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠান-ক্ষেত্রে পুরোহিত যজমানের কাছে নিজের ঠাঁট বজায় রাখিয়া চলিতে চলিতেও ধরা পড়িতেছেন। যজমান যাহা বিশ্বাস করেন না, সমাজের দায়ে সে অনুষ্ঠান ও সম্পূর্ণ করিয়া নিষ্ঠাবান্ সাজিতেছেন। জ্ঞান ও বিচার-পূর্ণ ধর্ম্মসাধানার ক্ষেত্রে আচার্য্য, উপদেষ্টা ও বক্তাগণ জীবনের সীমা হইতে দূরে গিয়া বড় বড় কথা বলিয়া ধার্ম্মিক-আখ্যা লাভ করিতেছেন। শ্রোতাদলও লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভদ্রতার ব্যপদেশে দীনহীন, ব্যাকুল ধর্ম্মার্থী সাজিতেছেন। এই প্রকারে গভীর দৃষ্টি-সহকারে বর্ত্তমান সময়ের অন্তর বাহির উভয় দিকের দৃশ্য-চিত্র দর্শন করিলে এই যুগে যে এক সর্ব্বগ্রাসী কৃত্রিমতা আসিয়া সকল অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না।

কৃত্রিমতা ছদ্মবেশের নামান্তর। আটপৌরে কাপড় যেন কেহই নাই, সকলেই পোষাকী পরিচ্ছদে সজ্জিত। কেহই স্বরূপে নাই, সকলেই যেন মুখোস পরিয়া বিরূপ ধারণ করিয়াছে। স্বাভাবিকতার অভাব হইলে সরলতা সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না সরলতার যে স্থানে অভাব, সেস্থানে সত্যের অপলাপ। আবার সত্যের অপলাপ হইলে ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতাকেই মানুষ আশ্রয় করে। বর্ত্তমান সময়ে—এই সভ্যতার যুগে জীবনসংগ্রামে পড়িয়া স্বার্থের দায়ে মানব সমাজে কৃত্রিমতাই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানুষের সাধুতা. সত্যবাদিতা, সরলতা, নির্ভীকতা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণ সকল হরণ করিয়া ফেলিতেছে।

জানি না, বর্ত্তমান যুগে—বিজ্ঞানের যুগ—সভ্যতার মহাসভায় এই কৃত্রিমতা কি করিলে মানব-সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে সকলের ভিতরে জ্ঞানের আলোচনা; ধর্ম্মের সাধনা এবং Plain Living and High Thinking এর সামঞ্জস্য হইলে যদি এই কৃত্রিমতার হস্ত হইতে ক্রমশঃ পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু সে যেন এক কল্পনার বস্তু বলিয়া মনে হয়, ভগবান্ করুন দেশে অকৃত্রিম লোকের সৃষ্টি হউক। "ব্রহ্মবাদী"

আহরণ—আহার ও পরিচ্ছদ।

দেশভেদে লোকের আহার ও পরিচ্ছেদর ভিন্নতা দেখা যায়। আবার জাতি ধর্ম্ম ও বয়সভেদে একই দেশমধ্যে আহার ও পরিচ্ছদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেই ভিন্নতা কেন হইল এবং তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া সুযুক্তির অনুসরণ করা উচিত।

কোন ধর্ম্মের সহিত কোন পোষাকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কোন দেশের কোনধর্ম্মগ্রন্থে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য কোন পোষাক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তথাপি কোন কোন জাতীয় লোক কোন কোন কার্য্যউপলক্ষে বিশেষ পোষাক পরিয়া থাকে, তন্মধ্যে কোন কোন প্রকার পোষাক ধারণের কারণ আছে। যেমন—

(১) কোন অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যথাসাধ্য উত্তম সাজে যাওয়াই উচিত। কেননা তদ্দারাই প্রথম মর্য্যাদা প্রকাশ হয়।

(২) নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনে ও বিবাহকালে সুন্দর পোষাক ধারণ করা আবশ্যক। কেন না তদ্দ্বারাই তাহাদের পরস্পরের চিত্তাকর্ষণ হয়।

(৩) যোদ্ধাদের পক্ষে সুদৃঢ় দেহরক্ষক আঘাতনিবারক বীরত্বব্যঞ্জক পরিচ্ছদ প্রয়োজনীয়।

(৪) গুরু পুরোহিত ও বৃদ্ধ লোকদের নানাবর্ণশোভিত জমকাল পোষাক দূষ্য, কেননা তাহাতে তাহাদের বিলাসিতা প্রকাশ হয় এবং সম্মানের হ্রাস হয়।

(৫) শীতকালে মোটা আঁটা গরম পোষাক প্রয়োজনীয়। তেমনি গ্রীষ্মকালে পাতলা ঢিলা কাপড় ধারণ করা সুসঙ্গত।

আর কতকগুলি পোষাক ধারণের কোন নৈসর্গিক হেতু নাই। তাহা কেবল চিরাগত প্রথানুসারে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। যেমন হিন্দুদের যজ্ঞীয় পোষাক এবং মুসলমানদের নমাজের পোষাক ইত্যাদি। আমরা বাল্যাবধি যে পোষাকে লোকদিগকে ধর্ম্মক্রিয়া করিতে দেখিয়াছি সেই পোষাক ধারণ করিলে আমাদের মনে স্বাভাবতঃই ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়। সেই পোষাকের সহিত প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে সেই পোষাকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, বদ্ধমূল সংস্কারই (Long association) তাহার কারণ। আমরা যদি বরাবর লম্পটদিগকে সেই পোষাক পরিতে দেখিতাম, তবে সেই পোষাক ধারণ করিলে আমাদের মনে ধর্ম্মভাব না হইয়া কামভাবের আবির্ভাব হইত। আমি দেখিয়াছি যে হিন্দুস্থানী আর্য্যেরা চাপকান গায়ে দিয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া উপনয়ন কালে ব্রহ্মচারী সাজে। তথায় বহুদিন যাবৎ ঐরূপ পোষাক প্রচলিত হওয়ায় ঐ পোষাকেই তাহাঁদের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন ধর্ম্মের সহিত কোন পরিচ্ছদের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই।

পূর্ব্বে জাতীয় পোষাক বলিয়া হিন্দু মুসলমানের কোন গোঁড়ামি ছিল না এবং তাহা থাকাও সঙ্গত নহে। বরং যে স্থানে যেরূপ জলবায়ু ও অবস্থা, সেখানে যেরূপ পোষাকে স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হয় তদনুরূপ পোষাক পরাই কর্ত্তব্য। সেই যুক্তি অবহেলন জন্য ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের স্বাস্থ্য-

হানি হইয়া থাকে। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ। ইংরাজেরা সেই স্বদেশে যেমন মোটা আঁটা কাপড় ব্যবহার করেন, ভারতের উষ্ণ ভূমিতে তদ্রূপই করেন। কাজেই তাহাঁদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেইরূপ উষ্ণ দেশের লোক ঠাণ্ডা দেশে গিয়া যদি খালি গায় থাকে অথবা পাতলা ঢিলা কাপড় পরিয়া জাতীয় পোষাক রক্ষা করিতে চাহে, তবে অবশ্যই ব্যারাম হইয়া পড়িবে।

বস্ত্র অপেক্ষা খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অনেক বেশী। খ্যদ্যের সঙ্গে ধর্ম্মেরও কতক সম্বন্ধ আছে। সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই খাদ্যাখাদ্য-বিষয়ে কতক বিচার আছে এবং কোন কোন বস্তু অখাদ্য বলিয়া বিধান আছে। জ্ঞানবান্ লোক অনেক দেশেই সময়ে সময়ে আবির্ভূত হন। তাহাঁরা আপনাপন দেশের জলবায়ু, অবস্থা ও প্রয়োজন-দর্শনে সেই দেশের লোকের উপযোগী আচার-ব্যবহার এবং খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে সেই দেশে সেইকালে মহোপকার হয়। কিন্তু দেশান্তরে ও সময়ান্তরে সেই ব্যবস্থা ততদূর উপকারী হয় না, বরং প্রচুর অনিষ্টকারী হইতে পারে।

ইংলণ্ড যেরূপ শীতল দেশ তথায় শরীরের তাপ রক্ষা করাই স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান উপায়। পক্ষান্তরে আমাদের উষ্ণদেশে গ্রীষ্মকালে শরীর ঠাণ্ডা রাখাই স্বাস্থ্যকর। সেই জন্য বিলাতী স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকাংশ নিয়ম আমাদের দেশে ফলদায়ক হয় না বরং অনিষ্টকর হয়। এই নিয়ম যে কেবল বিদেশের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য তাহাও নহে। দেশের মধ্যেও স্থানভেদে, খাদ্য ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যেমন—

(১) শীতপ্রধান কাশ্মীরের খাদ্য ও বস্ত্র গ্রীষ্মপ্রধান মান্দ্রাজের উপযুক্ত নহে। তদ্রূপ মান্দ্রাজের প্রচলিত খাদ্য ও বস্ত্র কাশ্মীরের যোগ্য নহে।

(২) পূর্ব্ব বঙ্গের জল ভারী এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। সেই জলদোষ না কাটিলে কফ, কাশি, শোথ বাত, গলগণ্ড এবং কোষবৃদ্ধি রোগ হয়। সেই দোষ কটিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে লঙ্কা, মরিচ, মশুরীর দাইল এবং কিছু কিছু গাঁজা ? সেবন কর্ত্তব্য। আর তথায় অম্ল ও কাঁচা মাষ,কলাইর ডাইল খাওয়া

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পশ্চিম দক্ষিণ বঙ্গে রাঢ় দেশে জল বায়ু অতীব উষ্ণ ও রুক্ষ। তথায় জল দেওয়া ভাত, কাঁচা মাষ, কলাইর ডাইল, পুঁই শাক এবং প্রচুর অম্ল সেবনীয়। পূর্ব্ববঙ্গে রাঢ় দেশীয় খাদ্যগ্রহণে জ্বর, কাশি, শোথ, বাত প্রভৃতি রোগ হইয়া জীবন শেষ হয়। তেমনি রাঢ় দেশে পূর্ব্ববঙ্গের রীতিতে আহার করিলে রক্ত আমশায় ব্যারাম হইয়া অচিরে মৃত্যুর কারণ হয়।

আমাদের দেশীয় বহুলোকের কার্য্যকারণবোধ নাই। তাহারা সকল বিষয়েই ইংরেজের অনুকরণ করিতে চাহে। কিন্তু ঐক্য, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, সাহস, উৎসাহ প্রভৃতি যে সকল মহৎ গুণে ইংরেজের উন্নত অবস্থা হইয়াছে তাহা অনুকরণ করা অতি কঠিন, এজন্য নকল সাহেবগণ সে বিষয়ে অনুকরণ জন্য চেষ্টা না করিয়া কেবল আহার ও পরিচ্ছদ-সম্বন্ধেই বিলাতী নকল করিয়া থাকে। শীতল দেশীয় খাদ্য ও বস্ত্র ভারতের উষ্ণ ভূমিতে গ্রহণ হেতু ইংরাজদিগেরও অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাল্যাবধি অভ্যাসহেতু তাহাদের অনিষ্ট কম হয়! অথচ এতদ্দেশীয় যেসকল লোক বিলাতী রীতিতে খাদ্য ও পোষাক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাঁদের অতি শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হয়। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ জজ দ্বারকানাথ মিত্র, কোচবেহারের মহারাজ নরেন্দ্রনাথ ভূপ বাহাদুর এবং দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের অকাল মৃত্যুর উপরি-উক্ত কারণ সুবিজ্ঞ ইংরেজ ডাক্তারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখন বিলাতি নকল করিবার প্রবৃত্তি ক্রমেই এদেশীয় লোকের কম হইতেছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক।

আমাদের দেশে শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য আহার ও পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণীয়—

(১) গ্রীষ্মকালে ঢিলা পাতলা কার্পাস বস্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চাদর, চোগা, ওবর কোট প্রভৃতি পাতলা রেশমী কাপড় হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু পশমী কাপড় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

(২) শীতকালে তুলাভরা আঁটা কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। পশমী কাপড়ও অনিষ্টকর নহে। বিশেষতঃ শাল, রুমাল, চোগা, ওবর কোট

প্রভৃতি আল্‌গা কাপড় লোমজ হইলে কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু তুলাভরা বালাপোষ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

(৩) ইহা সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য যে, তুলাভরা কাপড়ের 'ওম' যাদৃশ সুখকর এবং উপকারী কোনপ্রকার পশমী কাপড় তদ্রূপ নহে। মোগল সম্রাট্‌ ও নবাবগণ তুলাভরা কাপড় সর্ব্বোত্তম বলিয়া পছন্দ করিতেন। পারস্যে, মিশরে, রোম সাম্রাজ্যে তুলাভরা কাপড়ের খুব আদর ছিল। ইংরেজেরা বিদেশীয় উত্তম জিনিস অপেক্ষা স্বদেশীয় অপকৃষ্ট দ্রব্যও সমধিক সমাদর করেন; সেইজন্য বিদেশী তুলার কাপড় অপেক্ষা স্বদেশী পশমী কপেড়ের প্রতি তাহাদের পক্ষপাত বেশী।

খাদ্যবিষয়ে—

(১) একরসবিশিষ্ট দ্রব্য অতি অল্পই সেবনীয় অর্থাৎ যে যে বস্তুতে কেবলমাত্র লোণা, তিতা, টক, ঝাল, মিষ্ট বা কষায় রস আছে তাহা অতি অল্পই খাইতে হয়।

(২) যাহাতে বহুরস সংযুক্ত আছে অথচ কোন রসের প্রাবল্য নাই তাহাই অন্ন। সেই অন্ন দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে অর্থাৎ পেট ভরিয়া খাইবে। অথচ অতি ভোজন করিবে না।

(৩) চাউল, গম ও যব এই শস্য হইতে যে খাদ্য তৈয়ারী হয় তাহাই সদন্ন অর্থাৎ উত্তম অন্ন। তাহাতে যে আঠা থাকে তাহাই শরীরের পোষক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অনুমান হয় যে, আলু হইতে যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাও সদন্ন মধ্যে গণ্য হইতে পারে; কেননা তাহাতেও আঠা আছে। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সময়ে এদেশে আলু ছিল না তজ্জন্যই আলু-জাত খাদ্যকে সদন্ন বলা হয় নাই।

(৪) ভোক্তার শরীরের রক্ত যে পরিমাণে গরম সেই পরিমাণ গরম দুগ্ধ সেবনীয়। তদপেক্ষা বেশী গরম দুধ রেচক হয় এবং কম গরম দুগ্ধ শ্লেষ্মা-বর্দ্ধক হয়।

(৫) কলা, কাঁঠাল, আম প্রভৃতি ফল-ভক্ষণের পর জল খাইতে বিস্বাদ বোধ হয়। সেই জল খাইলে পরিপাকের বিঘ্ন হয়। এজন্য তাদৃশ

ফলভক্ষণের পর কিছু মিষ্ট দ্রব্য কিংবা হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্য সেবন করিয়া পরে জল খাইবে।

(৬) ডাইল মধ্যে মসূর ও মাষকলাই অতি পুষ্টিকর। কোন মাংস, মৎস্য বা দুগ্ধ ততদূর পুষ্টিকর নহে। এইজন্য এই দুই ডাইল আমিষ মধ্যে গণ্য। উহা ব্রহ্মচারীর ও বিধবার অসেব্য। কিন্তু মসূরের ডাইলে রুক্ষতা দোষ আছে। এবং মাষ ডাইলে শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দোষ আছে। মসূরের ডাইলে ঘৃত, আদা ও হিং দিলে তাহা নির্দ্দোষ হয়। মাষ ডাইলে ঘৃত, দারুচিনি ও জৈত্রী দিলে তাহার দোষ থাকে না। অহিংসক লোকদের পক্ষে এই দুই ডাইল শোধন করিয়া খাওয়া উচিত। কেননা উহা মাংস হইতে সুস্বাদ এবং পুষ্টিকর।

(৭) মুগ ও বুটের ডাইল উক্ত দুই ডাইল অপেক্ষা কম তেজস্কর হইলেও প্রায় মৃগ-মাংসের তুল্য পোষক। এই দুই ডাইল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এজন্য সকলকালে সকল লোকেরই সেবনীয়।

(৮) গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে আহারের পর যেমন হাত মুখ ধোবে তেমনি দুই পা ধোবে এবং ভিজা গামছা দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিয়া ফেলিবে।

(৯) আহারান্তে বাম কা'ত হইয়া হেলান দিয়া বসিবে এবং একদণ্ড বিশ্রাম না করিয়া কোন পরিশ্রম করিবে না।

(১০) ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিন্ত মনে আহার করিবে। নতুবা সুজীর্ণ ও উপকারী হয় না।

(১১) লোকে আকণ্ঠ ভোজন করিলে যে পরিমাণ দ্রব্য খাইতে পারে তাহার তিন পোয়া পরিমাণ আহার করিবে। তদপেক্ষা বেশী খাইলে অজীর্ণ হয় এবং শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়।

নিম্নলিখিত পর্য্যায়ক্রমে ষড় রস সেবনীয়।

১। লবণ-সংযুক্ত তিক্ত দ্রব্য যৎকিঞ্চিৎ অগ্রে আহার করিবে।

২। লবণযুক্ত ঝাল দ্রব্য।

৩। লবণ ও মিষ্টসংযুক্ত অম্ল বা দধি।

৪। মিষ্ট মধুর দ্রব্য খাইয়া ভোজন শেষ করিবে।

অবশেষে আঁচাইয়া আসিয়া তাম্বূল, হরিতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্য দ্বারা মুখ শুদ্ধি করিবে।

এইরূপে প্রত্যহ ষড় রস-ভোজনে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবে।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল। (অর্ঘ্য)

পল্লীচিকিৎসক।

৭ম অধ্যায়।

সু—ঠাকুদ্দা, আজ কি বলিতে চাও?

হ—ফোড়া (স্ফোটক) সম্বন্ধে কিছু বলি।

সু—ফোড়া বসাইবার উপায় কি?

হ—চিনি ও চূণে একত্র প্রলেপদিলে ফোড়া বসিয়া যায়। পোড়া মাটি ও গোলমরিচ একত্র জলে বাঁটিয়া—পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে হয়। পুনঃ পুনঃ আটালে মাটির প্রলেপ দিলেও বসিয়া যায়। চিনি ও চূণ, মধুসহ প্রলেপ দিলে অথবা জবার পাকাপাতা, সরিষা ও আদা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা দণ্ডকলসের (দ্রোণফুলের) পাতা চূণের সঙ্গে পেষণ করিয়া লাগাইলে ফোড়া বসিয়া যায়। ঝিণুক বা শামুক অথবা সমুদ্রফেনা চটে ঘসিয়া গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ লাগাইলে ব্রণ বসিয়া যায়। শঙ্খ-ঘষিয়া লাগাইলেও চলে। ব্রণের উপর বটের আঠা ও তাহার উপরে সিমুলের তুলা লাগাইয়া দিলে ফোড়া ও ব্রণ বসিয়া যায়। নাকের ভিতর আঙ্গুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলে যে জলবৎ পদার্থ আঙ্গুলে লাগে উহা পুনঃ ফোড়াতে বা ব্রণে দিলে সহজেই বসিয়া যায়। দেখিলে মনে হয় যেন কষ্টিকদ্বারা পোড়ান হইয়াছে।

সু—ফোড়া ফাটাইবার উপায় কি?

হ—তেলাকুচপাতা চিনিসহ বাঁটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে পাকিয়া ফাটিয়া যায়। কেবল ফোড়ার মুখ বাদে চারিপাশে চিংড়িমাছ বাঁটিয়া

প্রলেপ দিলে ফাটিয়া যায় ও নিঃশেষ পূঁষ নির্গত হইয়া যায়। বিস্ফোটের মুখে মরিচ ঘসিয়া দিলে হয় বসিবে ; নতুবা আপনিই গলিবে। গরুর দাঁত শিলাতে ঘষিয়া দিলে অথবা কবুতরের বিষ্ঠা গরম করিয়া লাগাইলে ফোড়া ও ব্রণাদি ফাটিয়া যায়। একটী খেসারী ডাইল সাবান সহযোগে ফোটের যে কোন ও স্থানে লাগাইয়া দিলে সেস্থানদ্বারা পাকিয়া গলিয়া যায়। ফোড়ার মুখ করিবার ইহা একটী সহজ ও উত্তম উপায়। ময়দার পুল্‌টিস্‌ এই ডাইলের উপর দিয়া নিয়া, ফোড়াটী বেড়িলে আরও ভাল হয়। পান বা দুধআকন্‌পাতা দিয়া ঘি সহযোগে স্বেদ দিলেও ফাটিয়া যায়। এই স্বেদে পাকায়, গলায় ও শুকায়।

সু—ব্রণ শুদ্ধির উপায় কি ?

হ—অনন্তমুল পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপদিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-বিশুদ্ধ হয়।

সু—স্ফোটক আরোগ্যের উপায় ২।১ টা আরও বল।

হ—শিরিষছাল, বেণামুল ও নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক প্রশমিত হয়। বিল্বপত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বা ব্রণ হইবার সূত্রপাতে ধুতূরা পাতায় বোঁটায় লবণ মিশাইয়া লেপন করিলে অবিলম্বে ব্রণ বিনষ্ট হয়। দধিসহ শিমুলকাঁটা ঘষিয়া চন্দনের মত করতঃ তদ্দারা লেপ প্রদান করিলে বিস্ফোটক রোগ বিনাশ পায়, কিন্তু দধি নির্জ্জল হওয়া চাই। তিল ও শ্বেত সর্ষপ একত্র করতঃ দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণরোগ দূরীভূত হয়। গোরোচনা ও মরিচ একত্র করতঃ মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণরোগ নষ্ট হয়।

সু—বাঘী ফাটাইবার ঔষধ বলিবেনা ?

হ—বলিব;—

মসূর ডাইল সৈন্ধব লবণসহ বাঁটিয়া প্রলেপদিলে অথবা তেকলের বিচি হুকার জলে বাঁটিয়া ২।৩ দিন দিলে বাঘী, ফোড়া সকলই ফাটিয়া যায়।

সু—উহা বসাইবার উপায় বল।

হ—বাঘী, উরুস্তম্ভ ফোড়া প্রভৃতির প্রথম অবস্থায় এক অষ্টমাংশ রসুনবাঁটা মিশ্রিত করতঃ ২।১ দিন প্রয়োগ করিলে বসিয়া যায়। বটের আঠাদিলে

বসিয়া যায়। ভেলার আঠায় নেকড়া ভিজাইয়া তাহার উপরে কলিচুণ অল্পমাত্রায় ছড়াইয়া বাঘীর উপর পট্টি বান্ধিলে ১ দিনেই বাঘী বসিয়া যায় ও যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। গিলারশাঁস ১০।১৫টী গোলমরিচসহ বাঁটিয়া প্রলেপদিলে বাঘী ও ফোড়া নিশ্চয় বসিয়া যাইবে।

সু—অন্তর্বিদ্রধি বা পেটের ভিতরে মারাত্মক স্ফোটকের ঔষধ জান?

হ—সজিনা ছালের রস ৩ ঘণ্টা অন্তর এবং সজিনাছালের ক্কাথ সকাল সন্ধ্যা ২ বার খাইবে এবং আদা, সজিনাছাল ও মুসব্বর প্রলেপদিলে। আশ্চর্য্যরূপে বেদনা কমিয়া যায়। ৪।৫ দিনে আরোগ্য হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুতমুক্তি! (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, রাজাবাড়ী (ঢাকা)।

আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ বিবরণী।

৫। ভেলসংহিতা।

ভেলসংহিতা, আয়ুর্ব্বেদের একখানি মৌলিক আর্যগ্রন্থ। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভেল ও জতূকর্ণ প্রভৃতি আর্যগ্রন্থ এখন কেবল নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। চরক সংহিতা ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল সংহিতার নাম মাত্রই অবগত হওয়া যায়। চরকে আমরা দেখিতে পাইতেছি;—

"অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ॥"
"তন্ত্রস্যকর্ত্তা প্রথমোঽগ্নিবেশো—হভবৎ।"
"অথ ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং"—

অগ্নিবেশ ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর হারীত ও ক্ষারপাণি মহর্ষি আত্রেয় পুনর্ব্বসুর শিষ্য ছিলেন। অগ্নিবেশই সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থ রচনা করেন, তদনন্তর ভেল প্রভৃতি ও পৃথক ২ সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে নয়নদুর্ল ভ হইলেও আমরা যে ভেলসংহিতা দেখিতে পাইয়াছি উহা সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রুতসংহিতার ইংরাজীঅনুবাদক কবিরাজ—শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভিষ্‌গরত্ন মহাশয়, বহু আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক সুদূর তাঞ্জোর হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, এইজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। শুনিয়াছি, কুঞ্জবাবু আদর্শ অনুরূপই এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। এবিষয়ে কুঞ্জবাবুর এইরূপ অদম্য উৎসাহ যে তিনি অন্যত্র (পঞ্জাবে) ভেলসংহিতার সন্ধান পাইয়া তাহাও সংগ্রহ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যে ভেলসংহিতা দেখিতে পাইয়াছি, ইহা অসংপূর্ণ পুস্তক, আদি ও অন্তে খণ্ডিত, অধিকন্তু মধ্যভাগেও ইহার অনেক পত্রাভাব বর্ত্তমান আছে। গ্রন্থে অনেক অশুদ্ধি পরিদৃষ্ট হইলেও মোটের উপরে গ্রন্থ যত দূর আছে, তাহার অবস্থা ভালই বলা যাইতে পারে।

চরকের সহিত ভেলকৃত সংহিতার স্থানও অধ্যায়াদির ঠিক অনুরূপতাই পরিলক্ষিত হয়।

যথা;—ভেলসংহিতায়—

"* * * * স্থানেষষ্টসু তত্ত্বতঃ।
সূত্রস্থানং চিকিৎসা চ ত্রিংশত্ত্রিংশদিহোচ্যতে ॥
অষ্টৌ নিদানান্যুক্তানি বিমানানি তথৈব চ।
শারীরাণ্যথবাপ্যষ্টৌ * * যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
সিদ্ধয়ো দ্বাদশপ্রোক্তাস্তথা কল্পেন্দ্রিয়াণিচ ॥"

গ্রন্থোক্ত অষ্টস্থানের মধ্যে সূত্র ও চিকিৎসা প্রত্যেকস্থানে ত্রিশ অধ্যায়; নিদান, বিমান ও শারীর প্রত্যেকস্থানে আট অধ্যায়; এবং সিদ্ধি কল্প ও ইন্দ্রিয় প্রতিস্থানে ১২ অধ্যায়; এইরূপে সমগ্রগ্রন্থে মোট ১২০ অধ্যায় আছে।

চরকে দেখিতে পাই;—

"তন্ত্রমষ্টৌস্থানানি। তদ্‌যথা—শ্লোকনিদান বিমানশারীরেন্দ্রিয়চিকিৎসিত-কল্পসিদ্ধিস্থানানি। তত্র ত্রিংশদধ্যায়ং শ্লোকস্থানং। অষ্টাধ্যায়কানি নিদানবিমানশারীরস্থানানি। দ্বাদশকমিন্দ্রিয়াণাং। ত্রিংশকং চিকিৎসিতানাং। দ্বাদশকে কল্পসিদ্ধিস্থানে।"

চরকের আটস্থানের মধ্যে শ্লোক (সূত্র) স্থানে ৩০, নিদানে ৮, বিমানে ৮, শারীরে ৮, ইন্দ্রিয়ে ১২, চিকিৎসিতে ৩০, কল্পে ১২ এবং সিদ্ধিস্থানে ১২ অধ্যায়, সমষ্টিতে ১২০ অধ্যায় "সবিংশমধ্যায়শতং" আছে।

যখন ভেলকৃত সংহিতায় ১২০ অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে, এবং চরকেও ঠিক উহাই আছে, তখন অগ্নিবেশকৃত মূল সংহিতাতেও যে, ইহার কোন বিপর্য্যয় ছিল না, ইহা একরূপ নিঃসন্দেহেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

আমরা ভেলসংহিতার প্রতিস্থানে যেরূপ অধ্যায়ের সমুল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি, চরকের সহিত তাহার তুলনা করিয়া এস্থলে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতেছি।

(১) সূত্রস্থান।

আদর্শে সূত্রস্থানের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ের আদ্যাংশ বিংশ অধ্যায়ের শেষাংশ, একবিংশের প্রথমাংশ, চতুর্ব্বিংশের মধ্যাংশ ও পঞ্চবিংশাধ্যায় সম্পূর্ণ এবং অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ের শেষ হইতে ২৯ ও ৩০ অধ্যায় পর্য্যন্ত নাই।

ভেলে—	চরকে—
১। * * *	১। দীর্ঘঞ্জীবিতীয়।
২। * * *	২। অপামার্গ তণ্ডুলীয়।
৩। * * *	৩। আরগ্বধীয়।
৪। (কুষ্ঠহর যোগ।)	৪। ষড়্ বিরেচন শতাশ্রিতীয়।
৫। অত্যাশীতীয়।	৫। মাত্রাশিতীয়।
৬। নবেগান্ ধারণীয়।	৬। তস্যাশিতীয়।
৭। ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়।	৭। নবেগান্ ধারণীয়।
৮। মাত্রাশিতীয়।	৮। ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়।
৯। চতুষ্পাদ ভিষগ্ জাতীয়।	৯। খুড্ডাক চতুষ্পাদ।
১০। আমপ্রদোষীয়।	১০। মহাচতুষ্পাদ।
১১। সমশয়ন পরিধানীয়।	১১। তিস্রৈষণীয়।
১২। আত্রেয় খণ্ডকাপায্য।	১২। বাতকলাকলীয়।
১৩। জনপদ স্নিভক্তীয়।	১৩। স্নেহাধ্যায়।

ভেলে		চরকে	
১৪।	চিকিৎসা প্রাভৃতীয়।	১৪।	স্বেদাধ্যায়।
১৫।	তিস্রৈষণীয়।	১৫।	উপকল্পনীয়।
১৬।	বাতকলাকলীয়।	১৬।	চিকিৎসা প্রাভৃতীয়।
১৭।	দশ প্রণায়তনীয়।	১৭।	কিয়ন্তঃ শিরসীয়।
১৮।	অন্নপান রক্ষণীয়।	১৮।	ত্রিশোথীয়।
১৯।	বিধি শোণিতীয়।	১৯।	অষ্টোদরীয়।
২০।	অর্থে দশমূলীয়।	২০।	মহারোগাধ্যায়।
২১।	(সংশোধনাধ্যায়)	২১।	অষ্টৌ নিন্দিতীয়।
২২।	স্বেদাধ্যায়।	২২।	লঙ্ঘন বৃংহনীয়।
২৩।	গাঢ়পুরীষীয়।	২৩।	সন্তর্পনীয়।
২৪।	ঋতু বিভাগীয়।	২৪।	বিধি শোণিতীয়।
২৫।	* * *	২৫।	যজ্জঃ পুরুষীয়।
২৬।	অষ্টাবুদরীয়।	২৬।	আত্রেয় ভদ্রকাপ্যীয়।
২৭।	অন্নপান বিধীয়।	২৭।	অন্নপান বিধি।
২৮।	ভোজন বিধীয়।	২৮।	বিধি শোণিতীয়।
২৯।	* * *	২৯।	দশপ্রাণায়তনীয়।
৩০।	* * *	২৯।	অর্থে দশমূলীয়।

(২) নিদানস্থান।

নিদানস্থানের শেষ অধ্যায়ের অন্তভাগে দেখিতে পাইতেছি ;—

"জ্বরস্য শোষগুল্মানাং কাসানামপি কুষ্ঠিনাং।
প্রমেহোন্মাদিনাঞ্চৈব তথাপস্মারিণামপি ॥
ইত্যষ্টৌ চ প্রদিষ্টানি নিদানানি শরীরিণাং।
বিমানানি প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥"

এইস্থানের প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয়ের প্রথমাংশ, ষষ্ঠের শেষাংশ ও সপ্তমের প্রথমাংশ আদর্শে নাই।

নিদানস্থানে ভেলে আছে কাস নিদান, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে চরকে আছে রক্তপিত্ত ; তদ্ভিন্ন অন্যান্য অধ্যায় গুলির নির্দ্দেশে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভেলে—	চরকে—
১। জ্বর।	১। জ্বর।
২। শোষ।	২। রক্তপিত্ত।
৩। গুল্ম।	৩। গুল্ম।
৪। কাস।	৪। প্রমেহ।
৫। কুষ্ঠ।	৫। কুষ্ঠ।
৬। প্রমেহ।	৬। শোষ।
৭। উন্মাদ।	৭। উন্মাদ।
৮। অপস্মার।	৮। অপস্মার।

(৩) বিমানস্থান।

প্রথমের শেষাংশ, দ্বিতীয়, তৃতীয়ের প্রথমাংশ ও পঞ্চমের শেষাংশ, নাই। "ঋতুমান" নামক অধ্যায়ের মধ্যাংশ নাই, অধিকন্তু ইহা কোন্ অধ্যায় তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

ভেলে—	চরকে—
১। রসবিমান।	১। রসবিমান।
২। * * *	২। ত্রিবিধকুক্ষীয়।
৩। ?	৩। জনপদোদ্ধংসনীয়।
৪। রোগ প্রকৃতি বিনিশ্চয়।	৪। ত্রিবিধরোগ বিজ্ঞানীয়।
৫। ব্যাধীতরূপীয়।	৫। স্রোতোবিমান।
(৬ ?) ঋতুমান।	৬। রোগানীক।
৭। * * *	৭। ব্যাধিতরূপীয়।
৮। * * *	৮। রোগভিষগ্জিতীয়।

৪। শারীরস্থান।

শারীরস্থানের যাহা আছে, তাহার সর্ব্বত্রই অধ্যায়ের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা নাই।

ভেলে—	চরকে—
১। * * *	১। কতিধা পুরুষীয়।
(২?) সমানগোত্রীয়।	২। অতুল্য গোত্রীয়।
(৩?) পুরুষ নিচয়।	৩। খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তি।
(৪?) শরীর নিচয়।	৪। মহতী গর্ভাবক্রান্তি।
(৫?) কুণ্ডিকা গর্ভাবক্রান্তি।	৫। পুরুষবিচয়।
(৬?) শরীর সংখ্যা।	৬। শরীরবিচয়।
(৭?) জাতিসূত্রীয়।	৭। শরীর সংখ্যা।
৮। * * *	৮। জাতি সূত্রীয়।

৫। ইন্দ্রিয় স্থান।

ভেলে—	চরকে—
১। * * *	১। বর্ণস্বরীয়।
(২?) তস্যয়ণ (?)	২। পুষ্পিত।
৩। * * *	৩। পরিমর্ষণীয়।
৪। সদ্যোমরণীয়।	৪। ইন্দ্রিয়ানীক।
৫। যস্য শ্যাবীয়।	৫। পূর্ব্বরূপীয়।
৬। পূর্ব্বরূপীয়।	৬। কতমানিশারীরীয়।
৭। ইন্দ্রিয় নিকীয়।	৭। পন্ন রূপীয়।
৮। দূতাধ্যায়।	৮। অবাক্ শিরসীয়।
৯। গোময় চূর্ণ।	৯। যস্য শ্যাবনিমিত্তীয়।
১০। ছায়াধ্যায়।	১০। সদ্যো মরণীয়।
১১। পুষ্পীয়।	১১। অণুজ্যোতীয়।
১২। বাঞ্ছিত শীর্ষীয়।	১২। গোময় চূর্ণীয়।

৬। চিকিৎসিতস্থান।

তৃতীয়াধ্যায়ের শেষাংশ, চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাংশ, পঞ্চমাধ্যায়ের শেষাংশ, ষষ্ঠের পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ, সপ্তমের প্রথমাংশ, নবমের শেষাংশ, দশমের প্রথমাংশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশের পরার্দ্ধ ও পূর্ব্বার্দ্ধ, সপ্তদশের পরার্দ্ধ, অষ্টাদশের পূর্ব্বার্দ্ধ নাই। ১৯ অধ্যায়ের প্রারম্ভ আছে, তৎপরে

একেবারেই ২৪ অধ্যায়ের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত নাই। ২৪ অধ্যায়ের শেষার্দ্ধ আছে। মধ্যবর্ত্তী অধ্যায়গুলির কতক আছে, কতক নাই। ২৬ অধ্যায়ের শেষাংশ,২৭ অধ্যায়ের সংপূর্ণ ও ২৮ অধ্যায়ের পূর্ব্বার্দ্ধ নাই ২৯অধ্যায় নাই।

ভেলে—	চরকে—
১। একাদশসর্পিষ্ক (জ্বরচিকিৎসা)	১। রসায়ন।
২। বিষমজ্বর।	২। বাজীকরণ।
৩। রক্তপিত্ত।	৩। জ্বর।
৪। রাজযক্ষ্মা।	৪। রক্তপিত্ত।
৫। গুল্ম।	৫। গুল্ম।
৬। কুষ্ঠ।	৬। প্রমেহ।
৭। প্রমেহ।	৭। কুষ্ঠ।
৮। উন্মাদ।	৮। রাজযক্ষ্ম।
৯। অপস্মার।	৯। অর্শ।
১০। অতীসার (২৬ ?)।	১০। অতীসার।
১১। গ্রহণী।	১১। বিসর্প।
১২। উদর।	১২। মদাত্যয়।
১৩। উরুস্তম্ভ।	১৩। দ্বিব্রণীয়।
১৪। বিসর্প ও বাতশোণিত।	১৪। উন্মাদ।
১৫। অর্শ।	১৫। অপস্মার।
১৬। শ্বযথু।	১৬। ক্ষতক্ষীণ।
১৭। উদাবর্ত্ত।	১৭। শ্বযথু।
১৮। হৃদ্রোগ।	১৮। উদর।
১৯। কাস।	১৯। গ্রহণী।
২০। * * *	২০। পাণ্ডু।
২১। * * *	২১। হিক্কশ্বাস।
২২। * * *	২২। কাস।
২৩। * * *	২৩। ছর্দ্দি।

ভেলে—	চরকে—
২৪। বাত।	২৪। তৃষ্ণা।
২৫। প্লীহা ও হলীমক।	২৫। বিষ।
২৬। * * *	২৬। ত্রিমর্ম্মীয়।
২৭। * * *	২৭। উরুস্তম্ভ।
২৮। ব্রণ।	২৮। বাতব্যাধি।
২৯। * * *	২৯। বাতশোণিত।
৩০। পানাত্যয়।	৩০। যোনিব্যাপৎ।

৭। কল্পস্থান।

১ (?) অধ্যায়ের শেষাংশ, দ্বিতীয়াধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নাই। নবম অধ্যায় হইতে যতদূর আছে, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে আছে।

ভেলে—	চরকে—
১ (?) মদনকল্প।	১। মদন কল্প।
২। * * *	২। জীমূত কল্প।
৩। ইক্ষ্বাকু কল্প।	৩। ইক্ষ্বাকু কল্প।
৪। ধামার্গব কল্প।	৪ ধামার্গব কল্প।
৫। কুটজ কল্প।	৫। বৎসক কল্প।
৬। চতুরঙ্গুলীয় কল্প।	৬। কৃতবেধন কল্প।
৭। দন্তী কল্প।	৭। শ্যামাত্রিবৃৎ কল্প।
৮। শঙ্খিনীকল্প।	৮। চতুরঙ্গুল কল্প।
৯। শ্যামাত্রিবৃৎ।	৯। তিল্বক কল্প।
১০। * * *	১০। সুধাকল্প।
১১। " " "	১১। সপ্তলাশঙ্খিনী কল্প।
১২। " " "	১২ দন্তীদ্রবন্তী কল্প।

৮। সিদ্ধিস্থান।

সিদ্ধি স্থানে সংপূর্ণ বিশৃঙ্খলতাই বর্ত্তমান। ইহার অধ্যায় সমূহের কোনরূপ সামঞ্জস্যই বর্ত্তমান নাই।

ভেলে—	চরকে—
১। * * *	১। কল্পনাসিদ্ধি।
২। পঞ্চকর্ম্ম।	২। পঞ্চকর্ম্মীয় সিদ্ধি।
৩। * * *	৩। বস্তিসূত্রীয় সিদ্ধি।
৪। বমন বিরেচন সিদ্ধি।	৪। স্নেহব্যাপাদিকা সিদ্ধি।
৫। * * *	৫। নেত্রবস্তি ব্যাপদিকা সিদ্ধি।
৬। উপকল্প সিদ্ধি।	৬। বমন বিরেচন সিদ্ধি।
৭। ফল মূত্রসিদ্ধি।	৭। বস্তিব্যাপৎ সিদ্ধি।
৮। * * *	৮। প্রস্তৃতযোগিকা সিদ্ধি।
৯। * * *	৯। ত্রিমর্ম্মীয় সিদ্ধি।
১০। * * *	১০। বস্তিসিদ্ধি।
১১। * * *	১১। ফল মাত্রাসিদ্ধি।
১২। * * *	১২। উত্তর বস্তিসিদ্ধি।

গ্রন্থের মোট শ্লোকসংখ্যা—

আমরা এই গ্রন্থের যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে ইহাতে নিম্নলিখিতরূপ শ্লোকসংখ্যা আছে, এইরূপ ঠিক করিতে সমর্থ হইয়াছি।

১। সূত্রস্থানে ——— ৬০৯ শ্লোক।
২। নিদান " ——— ১৩৭ "
৩। বিমান " ——— ১৫ "
৪। শারীর " ——— ১০৯ "
৫। ইন্দ্রিয় " ——— ১৯২ "
৬। চিকিৎসিত ———১১৫১ "
৭। কল্প " ——— ১৭০ "
৮। সিদ্ধি " ——— ১৫০ "

মোট শ্লোকসংখ্যা———২৫৬৩

(ক্রমশঃ)

৪১নং বিডনরো, কলিকাতা, } শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

আচার্য্য গঙ্গাধরের জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গঙ্গাধর চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকা তত্ত্বচন্দ্রিকা লিপিবদ্ধ করিয়া শেষে স্বাভীষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক যে লিপিকাল বর্ণন করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীদুর্গাচরণারবিন্দযুগলং ধ্যাত্বা হৃদা স্বো ময়া
গ্রন্থো ভূজলধিস্থিরাধরধরা মানে শকেঽসাবহো।
সানন্দং লিখিতো বৃষে গিরিশজং কর্মাস্তমস্তু প্রসূন্
নত্বা সত্যমিহেতি লব্ধবিভিয়া গঙ্গাধরেণৈব চ ॥

এই শ্লোক পাঠে এই গ্রন্থখানিও ১৭৪১ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ হইয়াছে বলিয়া আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কারণ এই শকাব্দারই শ্রাবণ মাসের তৃতীয় দিবসের শনিবারে দশমী তিথির অতীত হইলে চক্রদত্ত লেখাও শেষ হইয়াছিল যথা—

চক্রাদিং চক্রপাণির্নিখিল গদগদত্তন্ত্রতত্ত্বপ্রবোধী
আয়ুর্ব্বেদাদিবাব্ধের্ব্বহু সুমথিততো গ্রন্থমগ্রন্থদুগ্ধম্।
মঞ্জুং পীযূষবত্তু ব্যলিখদথিলতঃ শ্রীল গঙ্গাধরোঽয়ম্ ॥
বৈদ্যঃ স্বীয়ং স্বয়ং তাং প্রকৃতি মনুতরামেঁা প্রবেশ্যাত্মচেতঃ ॥

নভসি গগণসিন্ধুত্রীন্দুসংখ্যে শকাব্দে
গতবতি সিতপক্ষে চাপ্যতীতে তিথৌচ।
দহন মিতদিনে চাত্তীগতায়াং দশম্যাং
দশশতকর সূনোর্ব্বারকে চাসমাপ্তেঃ ॥

পঞ্চভিঃ কুলকং বিদ্যাদ্দ্বাভ্যাংযুগ্মকমিষ্যতে।

নমামি পাদপঙ্কজং বিরিঞ্চিবিষ্ণুশম্ভুভি
র্মদীয়পাদসম্ভবং তনিষ্ঠপাংশুসঞ্চয়ম্।
প্রকৃত্য পিষ্টপং সৃজত্যদঃ স্ব-পাতি-নাশয়েৎ
জগত্রয়ৈক কারণং তদেব চেতসা স্বয়ম্ ॥

এই কয়খানি গ্রন্থ লিখিবার পর গঙ্গাধর কবিকল্পদ্রুম লিখিয়াছেন। কবিকল্পদ্রুম লিখিবার কাল ব্যাকরণের পরবর্ত্তী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; উহা চক্রদত্তের পরবর্ত্তী হইবার কারণ কি? হইার কারণ হয় তিনি উক্ত পুস্তক অপর কাহার ও নিকট হইতে লইয়া পড়িয়াছিলেন, কিম্বা পূর্ব্বে উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই, পরে করিয়াছিলেন। নতুবা কবিকল্পদ্রুমের লিখিবার কাল ১৭৪২ শকাব্দা হইবে কেন? যথা।

শাকে দ্বিপাথোধিগিরীন্দু মানে
গঙ্গাধরঃ শ্রীলভিষক্ লিলেখ।
পুস্তীং বিচিত্রাং মিহিরে কবীনাং
কল্পদ্রুমাহ্বাং মধুমাসি সৌরে॥

এই সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে সাধারণতঃ কতদিন অতি বাহিত হয় অনুমান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অন্ততঃ চারি বৎসরের ন্যূনকল্পে কোন মতেই নিদান, মধুকোষ চক্রদত্তটীকা, চক্রদত্ত এবং কবিকল্পদ্রুম লিখিত হইতে পারে না। অনন্যকর্ম্মা হইয়া লিখিলেও বোধ হয় তিন বর্ষ অতি-বাহিত হয়। কিন্তু গঙ্গাধর উহা বৎসরে লিখিয়া ও পড়িয়া শেষ করিয়া-ছিলেন। ইহাতে তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের যে কি অসাধারণত্ব প্রতিপাদিত হয় তাহা ভুক্তভোগ না হইলে অনুমিত হইতে পারে না।

এই লিপিচাতুর্য্য তাহাঁর শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ১০ম বর্ষে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র সহ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক একবিংশতি বর্ষ বয়ঃমক্রকালে চিকিৎসক হওয়া বিচিত্র নহে কি? কিন্তু গঙ্গাধরের অনুপমেয় মেধা এই দুরূহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি?

গঙ্গাধরের পাঠসমাপ্তির অব্যবহিত কাল পরে ভবানিপ্রসাদ, পুত্রের বিবাহের উপযুক্ততা বিষয়ের কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত খরড়িয়ার বিষ্ণুদাসবংশে প্রেম নারায়ণ দাশের কন্যা দিগম্বরী দেবীর সহিত গঙ্গাধরের বিবাহ দিলেন। অতঃপর গঙ্গাধরের ব্যবসায়-জীবন আরম্ভ হইল।

ব্যবসায়ের স্থান নির্ব্বাচন।

আয়ুর্ব্বেদ পাঠ ও বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে গঙ্গাধরের ব্যবসায়ের (চিকিৎসাকর্ম্মের) স্থান মনোনয়ন বিষয়ে ভবানিপ্রসাদ ও নন্দকুমারের বিশেষ ঐকান্তিকতা উপস্থিত হইল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা ব্যবসায়ের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া সকলেরই এই দুইটী স্থানের উপর অগ্রদৃষ্টি পতিত হইত। বস্তুতঃ তখন মুর্শিদাবাদের অধঃপতন বর্ত্তমানের ন্যায় সপ্রকট না হইলেও কলিকাতার সপ্রকাশ বালসূর্য্যের নিকট উহা অস্ত-গমনোন্মুখ ও মেঘান্তরিত বলিয়াই বিবেচিত হইত। কলিকাতা তখন উন্নতির ক্রমবিকাশে অগ্রসর এবং মুর্শিদাবাদ তখন অবনতির অনতি উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল। ভবানিপ্রসাদের মতে মুর্শিদাবাদ পণ্ডিত বহুল ও বহু ধনীর নিবাসভূমি বলিয়া গঙ্গাধরের উপযোগী, নন্দকুমার তাহাতে বীতশ্রদ্ধ। এইরূপ মতান্তরে বৃদ্ধ ভবানিপ্রসাদ গঙ্গাধরকে মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করিয়াও উপযুক্ত ভাগিনেয়ের অমতে তথায় পাঠাইতে পারিলেন না। গঙ্গাধর কলিকাতা গমনে অভিলাষী হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তরে কোনরূপ মত প্রকাশে সাহসী হইলেন না। কিন্তু গঙ্গাধরের কলিকাতা গমন বিষয়ে একটী প্রধান কৌতূহলের কারণ ছিল। তিনি পরম্পরাশ্রুত হইয়াছিলেন যে, কলিকাতায় বেচারাম বাবু নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে একখানি সমগ্র চরকসংহিতা আছে, সেই খানি লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে তাহার সহিত স্বকীয় চরকসংহিতার পাঠের সামঞ্জস্য নির্ণয়ে সুবিধা হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় নন্দকুমারের মতে ভবানিপ্রসাদের মত হইল। গঙ্গাধর কলিকাতা গমনে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

তখন কলিকাতা গমন বহু আয়াস সাধ্য ছিল। গঙ্গাধর নানারূপ যানের সাহায্যে নাটোর হইতে প্রায় একমাসে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। কলিকাতার পথ বাহুল্যে অভিভূত হইয়া গঙ্গাধর বহু অনুসন্ধানের পর বেচারাম বাবুর আবাস নির্ণয় করিয়া চরকসংহিতা সংগ্রহ করিলেন। ছয়মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে চরকসংহিতা লেখা সমাপ্ত হইল। এই ছয়মাসের মধ্যে তিনি ব্যবসায়ে ও সুবিধা অসুবিধার বিষয় স্থির করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা তখন উন্নতির

প্রাথমিকাবস্থার মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই; পূতিগন্ধতা ও জলবায়ুর দোষ তখনও উহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই কারণে গঙ্গাধরকে সহসা দুরন্ত চাতুর্থক জ্বর ও উদরাময় রোগে আক্রমণ করিল। আত্মীয়স্বজন বিরহিত স্থানে এমতাবস্থায় একাকী অবস্থান অসম্ভব বিধায় অগত্যা তাঁহাকে ব্যবসায়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া নাটোর প্রত্যাগমনে বাধ্য হইতে হইল।

কিয়ৎকাল পিতৃসন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক নিরাময় হইয়া পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গঙ্গাধর মুর্শিদাবাদ গমনে উদেযাগী হইলেন। গঙ্গাধরের মুর্শিদাবাদ গমন সময়ে ভবানিপ্রসাদ বালক গঙ্গাধরের তত্ত্বাবধানের আশায়, জয়শঙ্কর মজুমদার নামক একজন ধনবান্ ও মাননীয় বন্ধুর নিকট একখানি পত্র গঙ্গাধরের সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্র খানিতে ভবানিপ্রসাদ এই মাত্র লিখিয়াছেন—"কেবল মাত্র আপনার অবস্থিতি স্মরণ করিয়া অভিভাবকহীন স্থানে বালক পুত্রকে পাঠাইতেছি।"......ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া গঙ্গাধর প্রথমতঃ নশীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।* তৎকালে নশীপুর ন্যূনাধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিয়দ্দিবস অতীত হইলেও আয়ের সম্ভাবনা হইলনা। অপিচ পিতৃদত্ত আনীত অর্থাদি ক্রমশঃ ব্যয়িত হইয়া যখন কেবল একটী মাত্র টাকা অবশিষ্ট রহিল, তখন সৈদাবাদের কোন ধনীর চিকিৎসা জন্য তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে আহূত হইলেন। সৈদাবাদে আসিয়া চিকিৎসা ব্যপদেশে কতকগুলি ভদ্র লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইহাঁরা প্রত্যহই এই ধনি ব্যক্তির আলয়ে আগমন করিতেন। রোগীও ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া উক্ত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে সৈদাবাদে অবস্থানের বিষয়ে পরামর্শদান করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধর ও সে সুযোগই অনুসন্ধান করিতেছিলেন এ দিকে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইল। তখন তিনি সৈদাবাদেই বাসস্থান মনোনীত করিলেন।

---

* রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তদীয় গুরুদেব গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয়ের নিকট অধ্যয়ন করিবার কালে কথা পরম্পরা এই ঐতিহ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ও জিজ্ঞাসু হইলে আমাকে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। লেখক

বাসস্থান স্থিরীভকৃত হইলে তাঁহার পিতৃবন্ধু জয়শঙ্কর বাবুর কথা মনে পড়িল। বহু অনুসন্ধানেও জয়শঙ্কর বাবুর কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ না হওয়ায় হতাশ হইলেন। একদিন কোন একজন বৃদ্ধ, দোকানদার তাঁহার এই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কায়স্থ মাঝিদের শরণাপন্ন হইতে পরামর্শ দিল। তৎকালে সৈদাবাদে বহু বঙ্গজ কায়স্থ নাবিকতা করিত। সহরের প্রধান অপ্রধান ব্যক্তিগণের বাসস্থানাদির বিষয় ইহারা সম্যক অবগত ছিল। বৃদ্ধ দোকানদার আরও বলিয়া দিল যে, আপনি যাহাঁর নিকট যাইবেন তাহাঁর নাম বলিলেই কেহ না কেহ আপনাকে তথায় লইয়া যাইবে এবং অল্প জিনিষ পত্র থাকিলে তাহাও উহারা বহন করিয়া দিবে। গঙ্গাধর এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। কায়স্থ মাঝির নিকট জয়শঙ্কর বাবুর নাম করিবা মাত্র তাহারা উক্ত বাবুকে চিনিতে পারিল এবং গঙ্গাধরকে নৌকায় লইয়া উক্ত বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। এমন কি গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া বাবুকে দেখাইয়া দিলেন। গঙ্গাধর জয়শঙ্কর বাবুকে প্রণামপূর্ব্বক পিতৃদত্ত পত্রখানি তাহাঁর হস্তে দিলেন। বাবু পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন—"আমার বাটীতে কবিরাজের প্রয়োজন হইলে তোমাকে সংবাদ দিব, এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই।

বাবু এইরূপে বন্ধুর পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে গঙ্গাধর পিতৃবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নৌকায় বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সৈদাবাদই তখন গঙ্গাধরের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও পরিণামে নিবাস-ভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

ব্যবসায় ও চতুষ্পাঠী স্থাপন।

অত্যল্পকাল মধ্যেই গঙ্গাধরের ছাত্র সমাগম আরব্ধ হইল। বিদ্যাবত্তার প্রসিদ্ধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সাময়িক শুভাগমনে সহরের তাৎকালিক ঘটনা গঙ্গাধরের নিকট সবিস্তার উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রমুখাৎ পিতৃবন্ধু জয়শঙ্কর বাবুর প্রশংসা ব্যপদেশে গঙ্গাধর শুনিলেন জয়শঙ্কর বাবু বলিয়াছেন "আমার নিকট অনেক বিষয়ের উমেদার আসিয়া থাকে, কবিরাজীর

উমেদার বাকী থাকায় ভবানিপ্রসাদের পুত্র গঙ্গাধর তাহাও শেষ করিয়া গিয়াছে।" এই কথা গঙ্গাধরের শেষ জীবন পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল। এই জন্য তিনি ধনিগণের গৃহে বিনা আহ্বানে গমন করিতেন না। ছাত্রদিগকেও উপদেশচ্ছলে ধনিগণের গৃহে গমন বিষয়ে তাঁহার পিতৃবন্ধুর দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া সাবধান করিয়া দিতেন।

গঙ্গাধর, ধনাঢ্যব্যক্তিগণের নিকট এইরূপ ব্যবহার লাভ করায় অধিক দিন অসুখের লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই। প্রত্যুত সর্ব্বদা তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া শাস্ত্র চর্চ্চাও সদসৎ মতের সুমীমাংসায় সময়াতিপাত করিয়া সুখী হইতেন। চিকিৎসা কর্ম্মে সমদর্শিতা হেতু তিনি দরিদ্রগণের প্রধান আশার স্থল ছিলেন। শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ বৈদ্যবৃত্তিই তাঁহাতে সমভাবে অবস্থিত ছিল। আয়ুর্ব্বেদে চরকসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

মৈত্রী কারুণ্যমার্ত্তেষু শক্যে প্রীতিরুপেক্ষণম্।
প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবৃত্তিশ্চতুর্ব্বিধা॥

বিশেষতঃ বৈদ্যের ষড়্ গুণই তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ প্রতিভাত হইত। যথা

বিদ্যা বিতর্কো বিজ্ঞানং স্মৃতিস্তৎপরতা ক্রিয়া।
যস্যৈতে ষড়্ গুণাস্তত্র ন সাধ্যমতি বর্ত্ততে॥

এই সমস্ত গুণে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী নির্ধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পমাল্যে পূজা করিতে লাগিল। সকলেই সমভাবে তাঁহার নিকট ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যাহার যাহা সাধ্য সে তাহাই দিত, তাহতে তাঁহার কোনরূপ নিরানন্দতা পরিলক্ষিত হইত না।

তৎকালে সৈদাবাদের বহুস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদির আলোচনা হইত। সৈদাবাদের বহু ভাষাভিজ্ঞ রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য তৎকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায়কর্ম্ম ওকালতি হইলেও শাস্ত্রবাদে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। সন্ধ্যার পর কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রত্যহ তাঁহার বাসভবনে সমাসীন হইয়া শাস্ত্রালাপে সময়াতিবাহিত করিতেন। গঙ্গাধর ইহাঁদের অন্যতম ছিলেন। দিবাভাগে চিকিৎসাকর্ম্ম এবং অধ্যাপনা করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গঙ্গাধর, ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইতেন।

শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রায় দ্বিপ্রহর রজনী অতিবাহিত হইত। রাধাকান্ত বাবু পাঠ করিতেন, গঙ্গাধর ব্যাখ্যা করিলে পর পণ্ডিত মণ্ডলী বিচার বিতর্কাদি দ্বারা ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিতেন। একখানি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এইরূপে সুব্যাখ্যাত হইলে অন্যগ্রন্থ আরম্ভ হইত। এইরূপে সংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ্ এবং দর্শনাদি অলৌকিক গ্রন্থের আলোচনা হইত। প্রত্যহ প্রায় রাত্রি ২। ৩ টার সময় তাহাঁকে শয়ন করিতে হইত। এইজন্য গঙ্গাধর তৎকালে রাত্রিকালীন আহার অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর রায়।

আলোচনা—

পাচকপিত্তের স্থান কোথায় ?

আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই ; উদরস্থিত পিত্ত দ্বিবিধ ,—সাম ও নিরাম। সাম শব্দে অপক্ক ও নিরাম শব্দে পক্ক। সাম পিত্ত—নীলবর্ণ ও নিরাম পিত্ত পীতবর্ণ। নীলবর্ণ সামপিত্তের স্থান যকৃৎ যকৃতের উপরে যে পিত্তেরথলী দৃষ্ট হয়, তাহাই নীলবর্ণ সাম পিত্ত। পাশ্চাত্যচিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত-গণের মতে ইহাই পাচক পিত্ত। তাহাঁরা বলেন, ঐ থলির মুখ হইতে ভুক্ত পদার্থের মধ্যে টুপ্ টুপ্ করিয়া পিত্ত নিঃসৃত হয়। তাহাতেই ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয়। বলা বাহুল্য, তাহাঁদিগের এই মত এক্ষণে জগদ্ব্যাপী হইয়াছে। এদেশের ডাক্তারগণের ত কথাই নাই,আধুনিক কবিরাজী চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই এই মত পোষণ করেন। আয়ু-র্ব্বেদে কিন্তু ইহার বিপরীত মত দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে যকৃতের উপরে যে পিত্তের থলী বিদ্যমান, তাহা রঞ্জক পিত্ত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মত এই—

অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ।
তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতং॥
রঞ্জকং নাম যৎপিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ।

অর্থাৎ হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃতের স্থিতি। ইহাই রঞ্জকপিত্তের স্থান। রঞ্জকপিত্ত ভুক্তদ্রব্যের রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করে।

আমরা দেখিলাম, পাশ্চাত্য মতে যাহাকে পাচক পিত্ত বলা হয়, আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহাই রঞ্জক পিত্ত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি আয়ুর্ব্বেদের মতের কোনই মূল্য নাই? বিষম সমস্যা! একদিকে বিশ্ব-বিজয়ী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত, অপর দিকে সর্ব্বদর্শী মুনি ঋষিগণের মত ইহার কোন্‌টী প্রকৃত, বিচার দ্বারা তাহার নির্ণয় করিতে হইবে, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবে যুক্তি বিচার কেহ আর শুনিতে চাহেনা। অনুবীক্ষণদ্বারা যখন স্পষ্টই দৃষ্টহইতেছে, যকৃতের উপরিস্থ থলী হইতে টুপ্ টুপ্ করিয়া পিত্ত নিঃসৃত হইয়া আমাশয়স্থিত ভুক্তদ্রব্যের মধ্যে পতিত হয়, এবং তাহাতেই ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয় তখন আর যুক্তিতর্ক শুনিবে কে? কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল, বিচার ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারেনা। যুক্তি বিচারের স্থান মন। মন এক অদ্বিতীয় অসাধারণ পদার্থ। মনের অসাধ্য কোন কার্য্য নাই। এই যে অনুবীক্ষণ নামক অণুদর্শন যন্ত্র, ইহাও সেই অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন মন প্রস্তুত করিয়াছে। মনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, মনই সকল যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ও পরিচালক। সুতরাং যুক্তি বিচার মানিব না, একথা বলিলে চলিবে কেন? যুক্তিই শাস্ত্র, যুক্তিব্যতীত শাস্ত্র বিজ্ঞান রচিত হইতে পারেনা। যুক্তিই বিধিনিয়ম যুক্তিব্যতীত বিধি নিয়ম প্রণয়ন করা যায় না। অতএব যাঁহারা যুক্তি বিচার মানিবেন, তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, ডাক্তারগণ যাহাকে পাচক পিত্ত আখ্যা প্রদান করেন, তাহা বস্তুতঃ পাচক পিত্ত নহে, রঞ্জক পিত্ত। সত্য বটে, পদার্থের ক্রিয়া একবিধ নহে, বহুবিধ। আমরা চন্দ্র সূর্য্যের ক্রিয়ার আলোচনা করিলে, দেখিতে পাই, চন্দ্রের গুণ বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ ও সূর্য্যের গুণ আদান বা গ্রহণ। সূর্য্য পৃথিবীর রস গ্রহণ বা শোষণ করেন এবং চন্দ্র পৃথিবীতে রস বর্ষণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, চন্দ্রের কি গ্রহণ করিবার শক্তি নাই? সূর্য্যের কি প্রদান, করিবার শক্তি নাই? কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যাহার গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, তাহাঁর প্রদান করিবার শক্তিও অবশ্যই

থাকিবে। * অন্যথা জগতের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। যে গ্রহণ করে, সে যদি দান করিতে না পারে, তাহা হইলে, অল্পকালেই তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া যায়। আবার যে দান করে, গ্রহণ করিতে না পারে। তাহা হইলে অল্পকালেই তাহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুরই আদান প্রদানের শক্তি আছে। তদ্রূপ সূর্য্যের রস বর্ষণের এবং চন্দ্রের রস-গ্রহণের শক্তিও আছে, তবে এই দুইটি অপ্রধান ক্রিয়া। এইরূপ নীলবর্ণ রঞ্জক পিত্তের রঞ্জন-শক্তি ও পচন-শক্তি, উভয়ই বিদ্যমান, কিন্তু রঞ্জক পিত্তের রঞ্জন ক্রিয়া মুখ্য ক্রিয়া এবং পচনক্রিয়া গৌণ ক্রিয়া। বস্তুতঃ এই নীলবর্ণ পিত্ত অপক্ক পিত্ত, অপক্ক পিত্তের দ্বারা কখনও ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হইতে পারে না। যে নিজেই অপক্ক বা নিস্তেজ সে কখনও অন্যকে পরিপাক করিতে পারে না। শীতল জলে কি কখনও ডাল ভাত মাংস সিদ্ধ হইতে পারে ? কখনই নহে। তদ্রূপ নীলবর্ণ পিত্তদ্বারা কখনই ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হইতে পারে না, কিন্তু নিরাম পীতবর্ণ পিত্তদ্বারা পরিপক্ক হইতে পারে। নিরাম পীতবর্ণ পিত্ত উষ্ণজল। ঐপিত্তের স্থান আমাশয়। এই পিত্তের দ্রবাংশ ও উষ্মাদ্বারাই প্রকৃত পক্ষে ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, সুস্থশরীরে শ্বেতসার দ্রব্য আহার করিলে, পীত বর্ণ মল বহির্গত হয়, ইহাই ভুক্তদ্রব্যের সহিত নিরাম পীতবর্ণ পিত্ত মিশ্রণের ফল। পীতবর্ণের মল নলাকারে বহির্গত হইলে, বুঝা যায়। দেহস্থ পিত্ত সুস্থ আছে। উদরাময় রোগীর মল যাবৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ না করে' তাবৎ তাহার উদরাময় প্রশমিত হয় না। পক্ষান্তরে সাম নীলবর্ণ অপক্ক পিত্ত আমাশয় রোগে অর্থাৎ অপক্ক মলের সহিত নির্গত হইতে দেখাযায়। বস্তুতঃ ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। সাম বা অপক্ক পিত্তদ্বারা কখনও ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হইতে পারে না। কারণ সাম নীলবর্ণ পিত্তে তেজের অংশ অত্যল্প। চন্দ্র যেমন রস শোষণ করিতে সমর্থ নহে তদ্রূপ সাম পিত্ত ভুক্তদ্রব্যের রস শোষণ করিতে সমর্থ নহে। পরন্তু রস শোষণ ব্যতীত ভুক্তপদার্থ কখনও পরিপক্ক হইতে পারে না। পদার্থ পরিপক্ক হইয়া লঘু ও

* এই জাগতিক গ্রহাদির পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ রীতি স্বতন্ত্র। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা অন্তরূপ ও এস্থানে অনালোচ্য। আঃ বিঃ সঃ।

কোমল হয়। কিন্তু শোষণ ও দহন ক্রিয়া ব্যতিত কোন পদার্থ লঘু ও কোমল হইতে পারে না। সূর্য্যের তেজ বা অগ্নির দহন ও শোষণ গুণে জগতের যাবতীয় পদার্থ পরিপক্ক হইয়া লঘু ও কোমল হয়। এই জন্য ডাল তরিতরকারী ও মাংসাদি দ্রব্য আমরা অগ্নি সিদ্ধ করিয়া আহার করি। অগ্নি, সূর্য্যালোক ও দীপালোকের সহিত পাচক পিত্তের বেশ সামঞ্জস্য আছে। পাচকপিত্ত পীতবর্ণ এবং দীপালোক,সূর্য্যালোকও পীতবর্ণ। পাচকপিত্ত উষ্মা-বিশিষ্ট, উহারাও উষ্মাবিষ্ট। সাম ও নিরাম উভয়বিধ পিত্তই উষ্মাত্মক দ্রব পদার্থ গুরুত্ব বশতঃ অধোগামী। উভয়বিধ পিত্তও অধোগামী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অপক্ক মলে অপক্ক পিত্ত নিঃসৃত হয় এবং পক্কমলে পক্কপিত্ত নিঃসৃত হয়। পাণ্ডু ও কামলা রোগে পক্ক বা পীতবর্ণ পিত্তের অধোগমন ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়, তজ্জন্য ঐ পিত্ত উর্দ্ধগামী হইয়া ত্বক্, নেত্র, মূত্র ও নখ প্রভৃতিকে পীতবর্ণ করে। এই অবস্থায় অনেক চিকিৎসকই বলেন, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া উত্তমরূপে হইতেছে না। ইহাতেও স্পষ্টই বুঝা যায়, নীলবর্ণ পিত্ত পাচকপিত্ত নহে, উহা রঞ্জকপিত্ত। রঞ্জকপিত্তের প্রধান গুণ বা মুখ্য ক্রিয়া ভুক্তদ্রব্যের রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করা এবং গৌণ বা অপ্রধান ক্রিয়া পরিপাকের সাহায্যকরা। পীতবর্ণ পিত্তের প্রধান বা মুখ্য ক্রিয়া পরিপাকের সাহায্যকরাও অপ্রধান বা গৌণ ক্রিয়া ভুক্তদ্রব্যের রসকে রঞ্জিত করা। পাচকপিত্তের স্থান এই—

নাভৌ মধ্যে শরীরস্য বিশেষাৎ সোমমণ্ডলম্।
সোমমণ্ডলমধ্যস্থং বিদ্যাৎ সূর্য্যস্য মণ্ডলম্॥
প্রদীপবত্তত্র নৃণাং স্থিতো মধ্যে হুতাশনঃ।
সূর্য্যো দিবি যথা তিষ্ঠং স্তেজোযুক্তৈর্গভস্থিভিঃ॥
বিশোষয়তি সর্ব্বানি পল্বলানি সরাংসিচ।
তদ্বচ্ছরীরিণাং ভুক্তং জ্বলনো নাভিমাশ্রিতঃ॥
ময়ুখৈঃ পচতে ক্ষিপ্রং নানা ব্যঞ্জন সংস্কৃতম্।
স্থূলকায়েষু সত্ত্বেষু যবমাত্রঃ প্রমাণতঃ॥
হ্রস্বকায়েষু সত্ত্বেষু তিলমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
কৃমিকীট পাতঙ্গেষু বালুমাত্রোহবতিষ্ঠতঃ॥

নাভির মধ্যে সোমমণ্ডল, সোমমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের ন্যায় জঠরাগ্নি অবস্থিত। যেমন সূর্য্যমণ্ডল, আকাশে থাকিয়া তেজোযুক্ত কিরণদ্বারা সমস্ত পল্বল ও সরোবরাদি শোষণ করেন, তদ্রূপ নাভিসংশ্রিত অগ্নি স্বীয় শিখাদ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি সংযুক্ত ভুক্তদ্রব্য পাককরে। এই অগ্নি স্থূল শরীরে যব প্রমাণ; ক্ষীণ দেহে তিল প্রমাণ এবং কৃমিকীট ও পতঙ্গাদির শরীরে বালুকা প্রমাণ।

এই অগ্নিই পাচক পিত্ত। আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ নিম্নে এই পিত্ত অবস্থিত। ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ এই থলীতে পতিত হয় ও এই পিত্তের সাহায্যে পরিপক্ক হইয়া নিম্নে ক্ষুদ্র অন্ত্রে গমন করে এবং তথায় সম্যক্ পরিপক্ক হইয়া বৃহৎ অন্ত্র দ্বারা মলরূপে বহির্গত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র গ্রহণী নাড়ী।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ঊর্দ্ধাধো গতিতে আমাশয়স্থ পাচক পিত্ত সর্ব্বদা জ্বলনোন্মুখ থাকে এবং চন্দ্রমণ্ডল মধ্যস্থ সূর্য্যের ন্যায় আমাশয়রূপ চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহাই পাচক পিত্ত। ইহার স্থান যকৃৎ নহে, আমাশয়।

১৭নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট্
নিমতলা, কলিকাতা।　　শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠ।

বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষার্থীর প্রতি আবশ্যক জ্ঞাতব্য।

সময়—

আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাপীঠের প্রাকৃতবৈদ্যপরীক্ষা, আয়ুর্ব্বেদবিশারদ ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পরীক্ষা আগামী কার্ত্তিক মাসের ১৪ ই, ১৫ ই এবং ১৬ ই তারিখ (ইংরাজী ৩১শে অক্টোবর ও ১লা, ২রা সেপ্টেম্বর) শনিবার, রবিবার ও সোমবার দিবসত্রয় গৃহীত হইবে।

স্থান—

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কেন্দ্র—প্রয়াগ, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর, আজমীর, বোম্বাই, পুণা, লাহোর, এবং দিল্লী নগরীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরীক্ষার্থিগণ ইহার যে কোন স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বুঝিয়া লিখিত আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পরীক্ষা কেবল প্রয়াগ এবং কলিকাতা কেন্দ্রেই গৃহীত হইবে।

বিষয় ও প্রশ্নপত্র—

এবৎসরে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইবে এবং ষষ্ঠ বিষয়ের (প্রত্যক্ষ রোগ নিদান ও ভেষজ পরিচয়) পরীক্ষা পরীক্ষাস্থানের ব্যবস্থাপক পরীক্ষাস্থানেই পুস্তকাদি হইতে অথবা কোন ঔষধালয়ে প্রত্যক্ষ রোগী ও বনৌষধি প্রদর্শন পূর্ব্বক মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষিতব্য বিষয় ছয়টি এই:—(১) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (ইহা সূত্রস্থান সমন্বিত হইবে) (২) নিদান এবং রোগপরীক্ষা, (৩) শারীর-বিজ্ঞান, (৪) নিঘণ্ট, (৫) চিকিৎসা এবং রসবিদ্যা, (৬) প্রত্যক্ষ রোগ নিদান ও ভেষজ পরিচয়।

পরীক্ষাক্রম—

পরীক্ষার প্রথমদিন অর্থাৎ ১৪ই কার্ত্তিক শনিবার বেলা ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত শারীর বিজ্ঞানের পরীক্ষা হইবে। দ্বিতীয় দিবস ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত নিদান এবং রোগ পরীক্ষা, পরে ২টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত নিঘণ্ট পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তৃতীয় দিবস সাত

ঘটিকা হইতে দশঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ রোগ নিদান এবং ভেষজ-পরিচয়, পরে দ্বিতীয় বেলা দুই ঘটিকা হইতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত চিকিৎসা এবং রস-বিদ্যার পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

পাঠ্যক্রমের নির্দ্ধারণ—

প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক তাহার বর্ণনা বৈদ্য সম্মেলনের নিয়মাবলিতেই লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু কোন বিষয়ে কাহারো ভ্রম ঘটিতে পারে এজন্য পুনঃ পরিষ্কার রূপে জানান যাইতেছে :—প্রাকৃত-বৈদ্য পরীক্ষার পরীক্ষার্থীকে শারীরজ্ঞানের নিমিত্ত বাগ্‌ভটের শারীরস্থান অথবা কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন (লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা) কৃত বৈদ্যক শিক্ষা পড়িলেই চলিবে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান জ্ঞানের নিমিত্ত "ভারতমে মন্দাগ্নি" (জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল বৈদ্য, দারাগঞ্জ, প্রয়াগ) অথবা "আরোগ্য রক্ষা" (বৈদ্যরাজ কল্যাণ-সিংহ, হিন্দু ঔষধালয়, আজমীর) ইহার অন্যতম পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ পরীক্ষার্থী শারীরজ্ঞানের নিমিত্ত সুশ্রুতের শারীর ভাগ "প্রত্যক্ষ শারীর" (কবিরাজ গণনাথ সেন কৃত ৬৫ বীডনষ্ট্রিট্ কলিকাতা) নামক গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিবেন। নিঘণ্ট-জ্ঞানের নিমিত্ত যাহারা "নিঘণ্ট শিরোমণি" প্রাপ্ত হইতে না পারিবেন। অথবা যাহারা তাড়াতাড়ি উহাতে প্রস্তুত হইতে না পারিবেন। তাহারা ভাব প্রকাশের অন্তর্গত হরীতক্যাদি নিঘণ্ট পাঠ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। নাড়ী জ্ঞানের নিমিত্ত রাবণকৃত নাড়ী পরীক্ষা অথবা কণাদকৃত নাড়ী পরীক্ষা পড়িতে পারেন। স্বাস্থ্য জ্ঞানের নিমিত্ত বাগ্‌ভটের সূত্রস্থান এবং স্বাস্থ্যরক্ষা (প্রকাশক হরিদাস এণ্ড কোম্পানী ২০১ হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা) অথবা "ভারত মে মন্দাগ্নি" (জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল, দারাগঞ্জ, প্রয়াগ) পাঠ করা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পরীক্ষার গ্রন্থ সমুদয় নিয়মাবলীতে যেরূপ আছে ঠিক সেরূপই থাকিবে।

প্রশ্ন পত্র ও অঙ্কপ্রাপ্তি—

প্রত্যেক প্রশ্ন পত্রে ১০০ নম্বর নির্দ্দিষ্ট আছে। এতন্মধ্যে অন্যূন ৩৩ নম্বর পাইলেই উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে। গড়পড়তা শত করা ৪০ হইতে

৫০ নম্বর পাইলে তৃতীয় শ্রেণীতে, ৫১ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং এতদূর্দ্ধে নম্বর পাইলে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য—

পরীক্ষার্থিগণ দোয়াত এবং কলম সঙ্গে আনিবেন। দোয়াতের কালী, উত্তর লিখিবার কাগজ ও চোষকাগজ (ব্লটিংপেপার) পরীক্ষার স্থান হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

জগন্নাথপ্রসাদ শুক্লবৈদ্য।
মন্ত্রী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠ।

মথুরার বিরাট আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

কতিপয় বৎসর যাবৎ নানাস্থানেই ভারতীয় বৈদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে কিন্তু তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ জগতের এমন কি উপকার সাধিত হইতেছিল অথবা আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন অভাব পূর্ণ হইতে পারে তাহা উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল বিচার করিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের তুচ্ছ সেবক হইয়াও পঞ্চম বৈদ্যসম্মেলমের স্বাগতকারিণী সভার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, মথুরার সম্মেলনের সহিত এক আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনী খোলা যায় কি না, যাহাতে সমস্ত টাট্‌কা ও শুখনা গাছ গাছড়া লতা পতা ফল মুলাদি ঔষধিদ্রব্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতে পারে, যেহেতু বৈদ্যগণ প্রায়ই পসারীর প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। ঔষধাদি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ধার ধারে না, কাজেই দ্রব্য পরিচয় না হওয়ার দরুণ পসারীগণ যা' কেন না দেয় তদ্দ্বারাই কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, ইহা যে কত অনিষ্টের কারণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইপ্রকার শারীর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অভাব বৈদ্যক জগতে ততোঽধিক বলিতে হইবে। এই অভাব দূরী-করণও অধুনা একান্ত আবশ্যক। এতদর্থে অস্থিপঞ্জরাদির প্রতিকৃতি ও শারীরিক

বহুবিধ চিত্রাদি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ডাক্তারদ্বারা প্রত্যেক অঙ্গবিভাগ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তাহার ব্যাখ্যান দেওয়া যাইতে পারে। কতিপয় লোকের ধারণা এই যে, শস্ত্রবিদ্যা আজকালই উন্নতি লাভ করিয়াছে এই ভ্রম দূরীকরণের নিমিত্ত বৈদ্যগণকে নিজেদের প্রাচীন জ্ঞান-গৌরবের পূর্ণ অপূর্ব্ব কাহিনীর সংবাদ দেওয়া অতীব প্রয়োজন। যাবতীয় ব্যবহার-প্রাপ্ত শস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ লিখিত লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইতে পারে। এবং যন্ত্রসমূহও একস্থানে সমাবেশ করিয়া দেখাইতে পারিলে লোকের ভ্রান্তধারণা দূর হইতে পারে। এই প্রকার যে সকল প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় অমুদ্রিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ আছে তাহা মিলিত হইলে চিকিৎসক বর্গের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে। উক্ত বিচারকে কৃপাপূর্ব্বক প্রশংসনীয় স্থির করিয়া অনুমোদনপূর্ব্বক সদস্য বৃন্দ তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

বোম্বাই নিবাসী আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সম্পাদক পরমশ্রদ্ধেয় বৈদ্যরাজ যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য মহোদয় স্বকীয় গ্রন্থরাজি সর্ব্বপ্রথমে প্রেরণ করিয়া এমন উৎসাহিত করেন যে, এই কার্য্যটি অবশ্যই আমাদের সম্পাদন করিতে হইবে। আহম্মদাবাদের হিন্দীবৈদ্যকল্পতরু সম্পাদক বৈদ্যরাজ জটাশঙ্কর লীলাধর ত্রিবেদী মহোদয় অত্যুত্তম প্রকারে আপন ঔষধালয় এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুসজ্জিত করার নিমিত্ত বহু পূর্ব্বেই আপন যোগ্যপুত্র পণ্ডিত রতীলালকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর বস্তুজাতের সমাবেশ অতি সুন্দর হইয়াছিল। রায় সাহেব জয়কৃষ্ণ ইন্দ্রজী পোরবংদর বনবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহোদয় বহু সংখ্যক বনৌষধিদ্রব্য প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট সাহস প্রদান করিয়াছেন যে, একার্য্যে কিছু মাত্র বিলম্বের প্রয়োজন নাই। মথুরার স্থানীয় ব্যক্তিগণও সংগ্রহ কার্য্যে যথেষ্ট সংলিপ্ত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন ইহাও কর্ত্তব্যের খাতিরে বলা উচিত। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে এত বানৌষধি দ্রব্য আসিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে, নিঘণ্টুর অতিরিক্ত ও অনেক ঔষধি মূলক গাছ গাছড়াও বহুল পরিমাণে ছিল। এমন কি প্রদর্শনীর বিশাল স্থানও দ্রব্য জাতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। একটি ঘর কেবল পুস্তক রাশিতেই ভারিয়া গিয়াছিল।

মাইসোর (মহীশূর) গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী এবং পণ্ডিত যাদবজী আচার্য্যের পুস্তক সংগ্রহই সমধিক উল্লেখ যোগ্য। ভরতপুরের রাজবৈদ্য পণ্ডিত বিহারীলাল দেবীপ্রকাশের আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। শারীর বিভাগে প্রত্যহ ২ ঘণ্টা করিয়া মথুরার ডাক্তার রাধা বল্লভ পাঠকজী দেহপ্রতিকৃতি ও অন্যান্য চিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ শারীরের সুন্দর ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কথা এই যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ মহোদয় একদিন সর্ব্বশারীর-উপ-করণের সভা মণ্ডলে এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়া প্রত্যক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন। এইরূপ তিনি আর এক দিন অদ্যাপি আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত যাবতীয় শস্ত্রসমুহের সভাক্ষেত্রে এক একটি শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আয়ু-র্ব্বেদীয় সংহিতাদির সহিত মিলিত করিয়া বৈদ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে "এই সমুদয় শস্ত্র আপনাদেরই শাস্ত্রীয় লক্ষণা-নুসারে প্রস্তুত হইয়াছে। আপনারা সম্প্রতি এই সুযোগে প্রাচীন শস্ত্র বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন পারায়ণ ও সম্মিলিত ভাবে কার্য্যে তৎপর হউন—"ইত্যাদি। উক্ত কবিরাজ মহাশয় নিজেও "প্রত্যক্ষ শারীর" নামে একখানা শারীর বিদ্যা সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

এই বিরাট প্রদর্শনীর বিস্তারপূর্ব্বক বড় এক রিপোর্ট (কার্য্য বিবরণী) ছাপা হইতেছে শীঘ্রই মুদ্রিত হইয়া জন সাধারণে প্রকাশিত হইবে। বিস্তৃত বিষয় জানিবার জন্য সজ্জনবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক রিপোর্টের জন্য পত্র লিখিবেন ও উহা পাঠে কার্য্যকর্ত্তৃগণের পরিশ্রম সফল করিবেন।

প্রদর্শনক্ষেত্রে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি আপন আপন বস্তুজাতদ্বারা শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাঁদিগকে এক "জজকমিটি" যাহাতে প্রয়াগের প্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন মেজর বী, ডী, বসু আই, এম, এস, (পেন্সন প্রাপ্ত) এবং বোম্বাই বৈদ্যসভার উপসভাপতি আয়ুর্ব্বেদভূষণ বৈদ্যরাজ ত্র্যম্বকলাল ত্রিভুবনদাস মুনি প্রভৃতি সদস্যছিলেন ইহাঁদের দ্বারা নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মথুরার বিরাট আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনীর পুরস্কার বিবরণ।

রজতময়ী "আয়ুর্ব্বেদোদ্ধার পদক" এবং সার্টিফিকেট—

(১) বৈদ্যরাজ পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য বোম্বাই (অমুদ্রিত ও মুদ্রিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এবং খনিজ দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য)

(২) রায়সাহেব জয়কৃষ্ণ ইন্দ্রজী, পোরবন্দর (কাঠিয়াবাড়) (বনস্পতি-শাস্ত্র পুস্তক ও বনৌষধি দ্রব্যের জন্য)

(৩) কবিরাজ "বৈদ্যরত্ন" শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, (বনৌষধি এবং চিত্রের জন্য)

(৪) কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস বিদ্যানিধি কবিভূষণ, কলিকাতা (অস্থিপঞ্জর,শারীর চিত্র ও শস্ত্র সমূহের জন্য)

(৫) বৈদ্যরাজ পণ্ডিত জটাশঙ্কর লীলাধর ত্রিবেদী আহম্মদাবাদ (স্বরচিত বৈদ্যক গ্রন্থ, বনৌষধির নমুনা এবং রসৌষধির জন্য)

(৬) বৈদ্যরাজ পণ্ডিত জগন্নাথপ্রসাদজী শুক্ল প্রয়াগ, (বৈদ্যক গ্রন্থ ও বনৌষধির জন্য)

এতদ্ব্যতীতও কোন ২ সজ্জনবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদক ও সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা,
উপমন্ত্রী প্রদর্শন কমিটি—মথুরা।

বিবিধ সংগ্রহ।

হাসির উপকারিতা

আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরের বিখ্যাত ডাক্তার কারলটন বেকার বলেন যে, অজির্ণ দোষ হইতে উৎপন্ন এপেণ্ডিসাইটিস প্রভৃতি ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষার সর্ব্বপ্রধান ও সুলভ উপায় হাস্য করা। তিনি পরামর্শ দেন যে ঘণ্টায় অন্ততঃ ছয়বার মুখগহ্বরের মাংস পেশী গুলি বিস্তৃত করিয়া উজ্জল হাস্য করিবে তাহা হইলে ডাক্তারের সহিত তোমার আলাপ করিবার খুব কমই প্রয়োজন বোধ করিবে। তিনি বলেন, উদরের অধিকংশ পীড়ার কারণ প্রায়ই দুঃখ পুর্ণ, উদ্বেগ জনক ও অশান্তিকর চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। মনকে কোন রূপে কষ্ট দিলেই প্রায় পার্শ্ব বেদনার উৎপত্তি হয়। তাঁহার মতে যত হাসিবে তত সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে। এবং উদরের বেদনাদি উপসর্গে ভুগিবার তত কম সম্ভাবনা থকিবে। তিনি বলেন যে, যেরূপ অত্যন্ত ভারী দ্রব্য উঠাইলে শরীরের উপর বিষম টান পড়ে, সেইরূপ মনকে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট করিলে শরীরের উপর বিষম ক্রিয়া ও উত্তেজনা উপস্থিত করাইয়া এপেণ্ডি সাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। চর্ব্বণের অভাবেও অবশ্য অনেক ঔদরিক পীড়া জন্মায় এবং যাহারা দ্রুত দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করে তাহাদের জীবনে বড়ই আনন্দের অভাব। তিনি বলেন ঠিক সময়ে আহারের সময় যাহারা খুব হাসি খুসিতে ও গল্প গুজবে কাটান, তাহাদের পাকস্থলীর পীড়া খুব কমই হয়। অনেকে মনে করেন এপেণ্ডিসাইটিস বংশানুক্রমিক ব্যাধি কিন্তু ঐ ডাক্তারের মতে, তাহা ভুল। ইহাঁর মতে ইহার মূল কারণ দ্রুত আহার, অযোগ্য দ্রব্য আহার ও মানসিক দুশ্চিন্তা। উক্ত ডাক্তার এপেণ্ডিসাইটিস ব্যারাম নিবারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্ন-লিখিত উপদেশ দেন।

(১) সমস্ত দ্রব্য বেশ চিবাইয়া খাইতে অভ্যাস করিবে। (২) দন্তের পীড়া থাকিলে অগ্রে তাহার চিকিৎসা করিবে। (৩) শক্ত মাংস আহার করিবেনা। (৪) কোন দ্রব্য ডেলা বাঁধিয়া থাকিলে তাহা গলাধঃ করণ না করিয়া চিবাইয়া খাইবে। (৫) খোলা বাতাসে ব্যায়াম

করিবে। (৬) মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে ও আনন্দ-দায়ক ক্রীড়া কৌতুকাদি সর্ব্বদা দর্শন করিবে। (৭) প্রাতে উঠিয়াই এক গ্লাস জল পানে কদাচ ভীত হইবেনা। (৮) প্রাতে ও সায়াহ্নে ১০ বার উঠা বসা করিবে। প্রথমে বসিবে পড়ে সোজা হইয়া উঠিবে পরে হাটু না নোয়াইয়া সোজা ভাবে দেহ বক্র করিয়া পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। ১০ প্রকারে দশবার উঠা বসা করিবে। (৯) আর সকল কাজ ফেলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার সকল উপায়ের প্রকৃষ্ট উপায় কেবল হাসিবে। যখনই হাসিবার অবসর পাইবে তখনই প্রাণ ভরিয়া হাসিবে।

তিন শতাব্দীজীবী মনুষ্য—টমাসমীরস এক্ষণে আমেরিকাবাসী। তাহাঁর জন্মস্থান ওয়েলস দেশে। তিনি ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা তৃতীয় জর্জ্জের আমলে ১৬৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখন তাহাঁর বয়স ২০০ তিনি একজন কৃষকের পুত্র। তাহাঁর তিন বৎসর বয়সের সময় পিতা পরলোক গমন করেন। ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি এখনও লাঠিতে ভর দিয়া বেশ চলিতে পারেন এবং চশমা দ্বারা বেশ দেখিতে পান। ১০০ বৎসর বয়সের পর হইতে তিনি চশমা ব্যবহাব করিতেছেন। পূর্ব্বে তিনি বিনা চশমাতেই লেখা পড়া করিতে পারিতেন। তাহার শ্রবণ শক্তি এখনও অটুট।

নাসিকা গঠন—আজ কাল আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ডাক্তারের নাসি-কার বিকৃতি গঠন হইলে চাঁচিয়া ছুলিয়া ঠিক করিয়া দেন এবং ক্ষুদ্র নাসিকা হইলে নূতন নাসিকা বসাইয়া দেন।

ভারতে অন্ধ জনসংখ্যা।—কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিষ্টর এ, কে, সাহা, ইদানীং বিলাতে অন্ধজন সম্পর্কে যে এক আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়া-ছেন, এবং তথায় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। মিষ্টর সাহা তাহাঁর প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতসাম্রাজ্যে মোট ৪৪৩৬৫৩ সংখ্যক অন্ধ ব্যক্তি বিদ্যমান। দেশীয় রাজ্য ধরিলে মোট সংখ্যা ৬০০০০০ হইবে পৃথিবীর আর কোনও একটি দেশে এত অধিক সংখ্যক অন্ধ লোক নাই। ভারতের কোন্ স্থানে অন্ধের সংখ্যা কত তৎসম্বন্ধে মিষ্টার গেইট এক

সুন্দর মত স্থির করিয়াছেন। তিনি তাঁহার আদম সুমারির রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যত বেশী সেখানে অন্ধের সংখ্যা তত কম। পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, যুক্তপ্রদেশ এবং রাজপুতনায় অন্ধের প্রবল্য দৃষ্টি হয়, আবার আসাম, বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজে, অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টিপাত খুব প্রচুর পরিমাণে হয় তাদৃশ স্থলে, অন্ধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব কম। ইহা ছাড়া স্থানভেদে অন্ধতা বা দৃষ্টিহীনতা হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণের আরও উপায় আছে। দেখা যায়, যে স্থানে গৃহস্থদিগের বাস-গৃহগুলি মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত ও আলো বাতাসপ্রবেশের ব্যবস্থাবিরহিত সে স্থানের লোক অধিকতর সংখ্যায় অন্ধ বা হীনদৃষ্টি।

আমিষ ও নিরামিষ।—আমিষভোজী অপেক্ষা নিরামিষ ভোজীরা যে অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু ও বলশালী হইয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" নামক সংবাদপত্র বলেন, যে সকল প্রাচীন রোমক সৈন্য ইটালী দেশে পাহাড় পর্ব্বত কটিয়া রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা কেবল রুটি ও অম্ল সুরাপান করিয়া জীবন ধারণ করিত, তাহারা যেরূপ গুরুভার-বর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্রুতপদে গমন করিত এখনকার একজন সাধারণ সৈনিক সেরূপ গুরুভার বর্ম্ম বহন করিতে পারে কি না সন্দেহ। তাহারা আহারে সংযমী ছিল এবং প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম করিত। স্পেন দেশের কৃষকগণ সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করে এবং প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি নৃত্য করিয়া অতিবাহন করে, অথচ তাহারা একটুক্রা রুটি, ২।১টা পলাণ্ডু ও এক টুকরা তরমুজ ভিন্ন কিছুই ভোজন করে না। স্মার্ণানগরের ভারবাহী কুলীরা ২।৪টা ফল ভক্ষণ করিয়া ১৷৷০ মণ দুই মণ মোট মাথায় করিযা সমস্ত দিন পদব্রজে গমন করিতে পারে। ভারতবর্ষের সাধারণ কুলীরা কেবল অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, অথচ তাহাদের মত পরিশ্রমী অতি অল্পই দেখা যায়। যে কাফ্রী কুলী মাংস ও চর্ব্বি ভোজন করে, সে ভারতীয় নিরামিষাশী কুলির মত পরিশ্রম করিতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসী মাছ মাংস খাইতে পায় না বলিয়াই দুর্ব্বল তাঁহাদের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

"প্রাণোবা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র।)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ } কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩২১ { ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

বিদেশীয় চিকিৎসা তত্ত্ব।

লংঘন-চিকিৎসা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সুস্থদেহীর খাদ্যের পরিমাণ

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের গতপূর্ব্ব ভাদ্র সংখ্যায় আমরা সুস্থদেহীর খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ আলোচনা করিয়া প্রকৃত লংঘন-চিকিৎসার অবতারণা করিব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় "সুস্থ-দেহের পথ্যাপথ্য" বিচার করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সুস্থদেহীর আহারীয়ের পরিমাণ অলোচিত হইতেছে।

"চিকিৎসা রুক্ প্রতিক্রিয়া" (১) রোগের প্রতিকারকে চিকিৎসা বলে। সুতরাং রুগ্নব্যক্তির নিরোগী হওয়ার জন্য অবলম্বিত উপায়ের

(১) "যাক্রিয়া ব্যাধিহারিণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে।
দোষ ধাতু মলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগ হৃৎ"—

ভাবপ্রকাশ

নাম চিকিৎসা। সুস্থদেহীর লক্ষণ প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥"

কিন্তু বলিতে গেলে প্রকৃত স্বাস্থ্য অধুনাতন সভ্যজগতে বিরল। তাহার প্রধান কারণ অতি-ভোজন। সুস্থদেহে অভোজন যেমন অপকারী, অতিভোজনও তদ্রূপ রোগের নিদান।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, অভোজনে বা অত্যল্পভোজনে দেহের যে পরিমাণ অনিষ্ট হয়, অতিভোজনে তাহার অনেক অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে।

আমরা জগতের কার্য্যাবলীর প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে "প্রকৃতির" সংসারে অমিতব্যয় নাই। মিতাচারই প্রকৃতির মূলমন্ত্র। যে কার্য্যের জন্য যে শক্তিটুকু ব্যয় করা আবশ্যক, প্রকৃতি তাহার এক বিন্দুও অতিরিক্ত ব্যয় করেন না। সমস্ত জগৎ এই নিয়মের বশে পরিচালিত হইতেছে।

তাই মহর্ষি চরক স্বাস্থ্যরক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"মাত্রাশী স্যাৎ। আহারমাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী"—

সূত্রস্থান—৫ম অধ্যায়।

পরিমিত ভোজী হইবে। আহারের মাত্রা অগ্নির বল অপেক্ষা করে।

আবার, "যাবদ্ যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিঃ যথাকালং জরাংগচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি"—ঐ—

যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভোজন করিলে তাহা তাহার প্রকৃতির ব্যাঘাত না করিয়া যথাকালে জীর্ণ হয়, তাহার সেই পরিমাণ ভোজনকে মাত্রানুযায়ী ভোজন কহে। এবং যে ভোজনের পর উদ্গার হয় না, শরীরের লঘুতা, প্রফুল্লতা, যথোচিত মল মূত্র ত্যাগ, তৎপর ক্ষুধার ও পিপাসার উদয় হয় তাহাকেই জীর্ণাহার কহে। (১)

(১) "উদ্গার শুদ্ধিরুৎসাহোমলোৎসর্গো যথোচিতঃ।
লঘুতা ক্ষুৎপিপাসাচ জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্"॥—ভাব প্রকাশ

সুতরাং পরীক্ষাদ্বারা যে স্বল্প পরিমাণ খাদ্যে দেহযন্ত্র অবিকল থাকে তাহার অতিরিক্ত একবিন্দু আহারও গ্রহণ করা উচিত নহে। কথায় আছে :—

"উন ভাতে দুনো বল
ভরা ভাতে রসাতল।"

প্রবাদটী একটী অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা অতিভোজনেই অভ্যস্ত। আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোজনের কুফল ডাক্তার লিউইক সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"আমরা যদি কেবল আহারেই রত থাকি, তবে শরীর অতিমাত্র আহার্য্য গ্রহণ ও নিষ্কাসন করিতে অভ্যস্ত হয় এবং সেইহেতু যে শক্তি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত তাহা বৃথা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।" (১) একটী সাধারণ উদাহরণ দিতেছি। অগ্নির উপর কাষ্ঠ স্তূপীকৃত করিলেই তাহা উত্তম প্রজ্জ্বলিত হয় না বরং প্রধূমিত হইয়া কালে নির্ব্বাণ হয়। জঠরাগ্নি এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। অতিভোজনের ফল যে মন্দাগ্নি, Dyspepsia and Gastric irritation ইহা কি আজ কালও আমাদিগকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে?

ডাক্তার ক্যারিংটন বলেন :—

"ইহা নিশ্চিত যে আমাদের খাদ্যের পরিমাণ দ্বারাই আমাদের পুষ্টি সাধন হয় না, প্রত্যুত যাহা আমরা জীর্ণ করিতে পারি তাহাই আমাদের সুখাদ্য।" (২) বস্তুতঃ ইহা দেহতত্ত্বের একটী ধ্রুব সত্য যে, যে-পরিমাণ খাদ্য জীর্ণ করিলে আমাদের দেহ ধারণ হইতে পারে মাত্র সেই পরিমাণ পাচক রস পাকাশয় হইতে নিঃসৃত হয়; ভুক্ত

(১) "If we give ourselves up to eating, the system soon learns the habit of receiving and disposing of a very large amount of food, but it does this at the expense of brain and muscle." —New Gymnastics.

(২) "We are not nourished by the amount of food we eat, but by the amount we can properly use and assimilate." —Vitality Fasting and Nutrition p. 118.

দ্রব্যের পরিমাণে নহে। (১) এখানেও আমরা পূর্ব্বকথিত প্রকৃতির মিতব্যয়িতাই লক্ষ্য করিতেছি। প্রকৃতি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতটুকুও ব্যয় করিতে নারাজ। তবেই দেখা যাইতেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য দেহে পাচিত না হইয়া অসার ইন্ধনরূপে দেহেই অবস্থান করে এবং দেহযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এস্থলে মন্দাগ্নি আর অজীর্ণই প্রকৃতির পরিশোধ। ইহাদ্বারা দেহযন্ত্র বিকল হইয়া মন অবসন্ন হয় এবং পরিশেষে মানুষ একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবনকে ভার বোধ করে।

ডাক্তার ক্যারিংটন পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে অতিভোজনের কুফলও জলন্ত ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে আহার্য্য তাহা অনাবশ্যকীয় এবং দেহ যন্ত্রের বিঘ্ন স্বরূপ। সুতরাং তাহা জীর্ণ করা কিম্বা অজীর্ণ অবস্থায় শরীর হইতে নিষ্কাসিত করিতে জীবনী শক্তির অপব্যয় হইয়া থাকে। ইহার ফল নিতান্তই অনিষ্ট জনক। ইহাদ্বারা জীবনীশক্তিরই কেবল অত্যধিক অপচয় হয় এমন নহে, পরন্তু মলনিঃসারক যন্ত্রগুলির অতিমাত্র ক্লান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহা একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অতিভোজনের সঙ্গে সঙ্গে এই মহা অনিষ্টকর ক্রিয়াও সংসাধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ শরীর নিস্তেজ, দেহযন্ত্র বিকল এবং বিষ-জর্জ্জর হইয়া যায়। (২) ইহাই রোগের মূল নিদান, ইহাই অকাল জরা মৃত্যুর প্রসূতি।

---

(১) "In accordance with a universal law of Nature—the conservating of energy—gastric juice upon which digestion depends, is secreted......by the glands of the stomach in proportion to the needs of the organism for food and *not* in propoition to the food swallowed"...... Dr. Page's 'Natural cure'.

(২) "It is superfluous; it is useless; it is unnecessary; it is an encumbrance; and as such must necessarily call for an undue and excessive expenditure of the vital forces, in order to dispose of this great bulck of food material which is not needed. *Harm* must necessarily result! Not only are

সুতরাং আমরা দেখিতেছি আধুনিক পাশ্চাত্য মুনিঋষিগণও আমাদের প্রাচীন মহর্ষিগণের সহিত একবাক্যে বলিতেছেন যে, স্বাস্থ্যের লক্ষণ মিতাহার, ও মিত বিহার। সুস্থ থাকিতে হইলে "মাত্রাশী স্যাৎ।" যাহা হউক, প্রাচীন মহর্ষিদিগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত আহার বিহার সম্বন্ধীয় অমৃত নীতিবাক্যগুলি আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। এক্ষণে অমিতাহার প্রসঙ্গে ডাক্তার ক্যারিংটন দেহের স্থূলতা ও কৃশতা সম্বন্ধে যে অভিনব তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, আমরা পাঠকদিগকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

স্থৌল্য ও কার্শ্য।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, স্থূল শরীর স্বাস্থ্যের ও কৃশ দেহ অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক। কিন্তু এই শ্রেণীর ডাক্তারগণ ইহা প্রকৃতির বিপরীত মনে করেন।

ডাক্তার গ্রেহাম তাঁহার "Science of Human Life" পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ—

যদি স্থূলতাই প্রকৃত সুস্থ শরীরের লক্ষণ হয় তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি কোনও কারণে একটী স্থূল ও একটী কৃশ ব্যক্তিকে অনশনে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার বিপরীত লক্ষিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে স্থূল ব্যক্তি অপেক্ষা কৃশ ব্যক্তিই এরূপস্থলে উত্তরজীবী হইয়া থাকে।" *

---

the vital energies wasted to an excessive degree but the eliminating organs become overtaxed; they become weakened and cease to properly perform their functions....... The process continues as the overfeeding continues. This......process is the true cause of disease". p. 126.

* কথাটা আর একটু বিশদ হওয়া দরকার। আশাকরি লেখক বারান্তরে ইহার পুনরালোচনা করিবেন। যদিও প্রবন্ধের স্থলে স্থলে আমাদের বক্তব্য আছে কিন্তু অসমাপ্ত প্রবন্ধে আপাততঃ মতামত প্রকাশ না করাই যুক্তিসম্মত। সঃ

ডাক্তার বোজও এই মত সমর্থন করেন। তিনি বলেন ঃ—

"মেদস্বিব্যক্তির শরীরের সূক্ষ্ম শিরাগুলি অসুস্থ। কেবল তাহার সমস্ত স্নায়ু মণ্ডলীই দুর্ব্বল নহে, পরন্তু তাহার মর্ম্মস্থান—হৃদয়, ফুস্ফুস্, মস্তিষ্ক, অন্ত্র প্রভৃতি সমুদায়ই অপটু। মেদস্বিতা একটি রোগ বিশেষ (১) হিন্দু বৈদ্যক শাস্ত্রেও মেদস্বিতা একটী রোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং "মেদাসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ" এই বচন কবিরাজ মাত্রেই অবগত আছেন।

স্থৌল্যের কারণ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এপ্রবন্ধে আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

ডাক্তার ক্যারিংটন অন্যান্য ডাক্তারগণের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন, "খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক না হইলে তাহা রক্তে থাকিয়া যায় এবং অতিভোজনের ফলে সর্ব্বদাই শরীরে মেদের আবির্ভাব হয়।"

বস্তুতঃ মেদস্বিব্যক্তি মেদোমুক্ত হইলে যে পরিমাণ সামর্থ্য, কর্ম্মলঘুতা, প্রফুল্লতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে তাহাতে স্থূলতা স্পৃহনীয় না হইয়া সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হইবে। কি সদ্যোজাত শিশু, কি পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক মানুষ সকলের পক্ষেই ইহা সত্য যে স্থূলতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ না হইয়া বরং অসুস্থতার পরিচায়ক।

অন্যান্য পীড়ার ন্যায়, উক্ত ডাক্তারগণ বলেন, মেদস্বিতাও একমাত্র লংঘন চিকিৎসায় দূরীভূত হইয়া যায়। যদি অতিভোজনের ফলে দেহে আবর্জ্জনা রাশি জন্মিয়া মেদে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহার মূল কারণ অপসৃত হইলে অর্থাৎ লংঘন দ্বারা বস্তি শোধন করিলে

---

(১) 'A fat person at whatever period of life, has not a sound tissue in his body; not only is the entire muscular system degenerated with fatty particles, but the vital organs—heart, lungs, brain, kidneys, liver etc.—are likewise mottled throughout, like rust spots in a steel watce-spring, liable to fail at any moment......Fat is a disease".—Natural Cure by Dr. C. E. Page.

এবং ক্রমান্বয়ে উপবাসী থাকিলে, মেদোরোগ নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। ইহার অন্য চিকিৎসার আবশ্যকতা নাই। "উপবাসোঽসুখা শয্যা" প্রভৃতি উপায় ভাবপ্রকাশেও কথিত হইয়াছে। ডাক্তার ক্যারিংটন বলেন, "এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত "Antifat" প্রভৃতি বিষাক্ত অহিত ভেষজ ব্যবহার না করিয়া প্রকৃতির উপর নির্ভর কর—উপবাসী হও—দিনের পর দিন লংঘন দেও, দেখিবে তোমার মুক্তি দৈব প্রতিকারের ন্যায় আশ্চর্য্য হইবে।"

অতঃপর আমরা রোগীর লংঘন চিকিৎসার অবতারণা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

বৈদ্যক গ্রন্থবিবরণী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬। সারসমুচ্চয় যোগসংগ্রহ।

এই গ্রন্থ আয়ুর্বেদের একখানি দুষ্প্রাপ্য অত্যুৎকৃষ্ট রত্নবিশেষ। ইহা আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পরমপূজ্যপাদ অস্মদ্ অধ্যাপক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহোদয় এই গ্রন্থখানি * সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ইহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি। যোগীন বাবু, ইহা প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা "সুদান্ত সেন" কৃত পরিচয়েই প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহাই স্থির করিয়াছি। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় বিজয়রক্ষিত স্বকৃত নিদান-টীকা মধুকোষে "সুদান্ত সেন" সংবাদে যে চরকের প্রমাণ সমুদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা এই পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইয়াছি। অতএব ইহা যে সুদান্ত সেন কৃত, এইরূপ নিশ্চয় করা সমীচীনই বোধ হয়।

---

* এই গ্রন্থ ১৫৮৭ শকাব্দায় লিখিত, সুতরাং প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত নাই। ইহা "সিদ্ধান্তসার" হইতে সঙ্কলিত, এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। "সারসমুচ্চয় সংগ্রহ" ভিন্ন, গ্রন্থমধ্যে "বৈদ্যকশিক্ষা পত্রিকা" "ভিষক্‌স্মৃতশিক্ষা" ও "বৈদ্যবিদ্যাপরিপাটি পত্রিকা" গ্রন্থের এই বিভিন্ন নামগুলিও পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, বৃন্দ, চক্রদত্ত ও কুণ্ডের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে গ্রন্থোক্ত রোগসমূহের নাম সংগ্রহ, বাতাদি দোষের প্রকোপন ও প্রশমন, রোগের সামান্য ও আগন্তুক ভেদ কল্পনা, সামাদি দোষ বিনির্দ্দেশ, পারিভাষিক সংজ্ঞা, ভেষজ ভক্ষণ কাল, রসভেদ, রোগপরীক্ষা, এবং গ্রন্থোক্ত রোগনির্দ্দেশ অনুসারে প্রতিরোগের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে রোগের লক্ষণও প্রকটিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ক্বাথ, চূর্ণ, ঘৃত ও তৈলাদির প্রয়োগ অধিক দৃষ্ট হয় কিন্তু কোন কোন স্থানে রসঘটিত ঔষধ প্রয়োগ বিধিও উপদিষ্ট হইয়াছে।

৭। বিশ্বনাথ প্রকাশ।

এই গ্রন্থে নাড়ীপরীক্ষা, রস, ধাতু ও বিস প্রভৃতি পরিশোধন, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসাবিধি বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু কর্ম্মবিপাক কথিত রোগসমূহের উৎপত্তির কারণ এবং পাপ বিমোচনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত চান্দ্রায়ণাদির লক্ষণও ইহাতে আছে। ফলতঃ দৈব ও লৌকিক চিকিৎসার এই উভয় প্রকার বিধানই গ্রন্থকার তৎকৃত গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ প্রকাশে রস ও ধাতু ঘটিত ঔষধের ব্যবহার এবং ক্বাথ ও স্নেহাদির প্রয়োগ, সকলই আছে। এই গ্রন্থের নাম অনুসারে প্রতীতি হয়, গ্রন্থকারের নাম "বিশ্বনাথ" ছিল, গ্রন্থকারের নাম অনুসারে গ্রন্থের নাম "বিশ্বনাথ প্রকাশ" রাখা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকারের নামের কোনরূপ উল্লেখই পাওয়া যায় নাই। (ক্রমশঃ)

২নং বালাখানা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি।

প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু।*

রসায়ন নামক চিকিৎসকের আত্মত্যাগ।

নৃপতি প্রভাকরবর্দ্ধন দারুণ দাহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া আজ শয্যাগত। রাজার পীড়ার সংবাদে নগরীর শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। নৃপতির জয় ঘোষণা আর শোনা যাইতেছে না। চারণগণের গীত ও তূর্য্যনিনাদ আজ কর্ণগোচর হইতেছে না। নগরের সমস্ত উৎসব থামিয়া গিয়াছে। নৃত্য গীত বন্ধ, বিপণিতে আর সেরূপ দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ার্থে সজ্জিত হয় নাই। নৃপতির রোগ শান্তির জন্য বহুস্থলে হোম আরম্ভ হইয়াছে। পবনচালিত সেই হোমানলের ধূমরাশি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূন্যে উঠিতেছে। রাজার অনুরক্ত বান্ধবমণ্ডলী রাজার আরোগ্য-কামনায় শিবপূজায় নিরত। কোথাও কুল-পুত্রগণ চতুর্দ্দিকে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শিখায় দগ্ধ-প্রায় হইয়া সপ্তমাতৃকার আরাধনা করিতেছে। কোথাও দ্রবিড় দেশীয় উপাসক নরমুণ্ড বলি দিয়া বেতালকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কোথাও চণ্ডিকামূর্ত্তির সম্মুখে বাহুযুগল উত্তোলিত করিয়া অন্ধ্রদেশীয় উপাসক রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। তরুণ রাজ-সেবকগণ মস্তকে জ্বলন্ত গুগ্‌গুল ধারণ করিয়া মহাকালের উপাসনা করিতেছে। কোন আত্মীয়স্বজন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নিজ দেহের মাংস কর্ত্তিত করিয়া রাজার মঙ্গলার্থ হোমানলে তাহা আহুতি দিতেছে, কোথাও সামন্তরাজপুত্রগণ প্রকাশ্যে নরমাংস লইয়া

---

* বাণভট্ট বিরচিত "শ্রীহর্ষচরিত" সংস্কৃত কথা সাহিত্যে একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বাণভট্ট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে সময়কার আচার ব্যবহার রীতি নীতির সুস্পষ্ট উজ্জ্বল চিত্র ঐ গ্রন্থে বিদ্যমান। খণ্ডচিত্রগুলিও অপূর্ব্ব। আজ এই খণ্ডচিত্রগুলির একটি সংক্ষেপে অনুদিত হইল। [হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ।]

পিশাচদিগকে বিতরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে (১)। থাকিয়া থাকিয়া আকাশে বায়সমণ্ডলী কটুস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আসন্ন অমঙ্গল সূচনা করিতেছে।

প্রধান রাজপথে এক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া একখানি যম-পট প্রদর্শন করিতেছে। দণ্ডের উপর হইতে চিত্রপট ঝুলিতেছে। চিত্রে ভীষণ মহিষের উপর অধিষ্ঠিত যমের মূর্ত্তি চিত্রিত। দক্ষিণহস্তে দীর্ঘ শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া সে চিত্র পরলোক ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেছে—

"যুগে যুগে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা বিগত জীবন হইয়াছে! তুমি কার? কেই বা তোমার?" (২)

রাজপ্রাসাদে ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করা হইতেছে। কুলদেবতার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। রোগশান্তির জন্য দেবগণকে যে চরু উপহার দেওয়া বিধি, সেই চরু রন্ধন হইতেছে। হোমানলে দধিযুক্ত ঘৃত দ্বারা লিপ্ত দূর্ব্বাপল্লব নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোথাও মহামায়ুরী মন্ত্রপাঠ, কোথাও ভূতপ্রেত যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য উপহার প্রদান, কোথাও শান্তিস্বস্ত্যয়ন বিধান, কোথাও বা সংযমী ব্রাহ্মণের বেদপাঠ হইতেছে। শিবমন্দিরে রুদ্রৈকাদশী মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, নির্ম্মল শিবভক্তগণ সহস্র কলস দুগ্ধে শিবকে স্নান করাইতেছে—সকলেরই উদ্দেশ্য যাহাতে দেবতা প্রসন্ন হন।

প্রাঙ্গণে অধীন রাজমণ্ডলী উপবিষ্ট। প্রভুর অদর্শনে তাঁহারা দুঃখিত। মধ্যে মধ্যে প্রভাকরবর্দ্ধনের কক্ষ হইতে পরিচারকবর্গ নির্গত হইলে তাহাদের নিকট হইতে রাজার-সংবাদ জানিতেছেন। নিজেদের স্নান ভোজন, শয়নের কথা আর মনে নাই। নিজেদের দেহসংস্কারের প্রতিও দৃষ্টি নাই। বসন মলিন। দিন রাত্রি এইরূপে কাটিয়া যাইতেছে।

---

(১) নরমুণ্ড উপহার, নরমাংস বিক্রয় প্রভৃতি সেকালের এক বিশেষত্ব। মালতী-মাধব নাটকেও মাধব শ্মশানে নরমাংস লইয়া পিশাচগণকে দিতেছেন বর্ণিত আছে।

(২) যমপট প্রদর্শন প্রাচীন ভারতের এক প্রথা ছিল। মুদ্রারাক্ষস নাটকেও এই যমপট প্রদর্শনকারীর চরিত্র-চিত্র বিদ্যমান।

পরিজন সকল বিভিন্ন কক্ষে, দ্বারপ্রান্তে দলবদ্ধ হইয়া অনুচ্চস্বরে মলিন বদনে কথোপকথন করিতেছে। কেহ কোন চিকিৎসকের দোষ বাহির করিতেছে, কেহ অসাধ্য রোগের লক্ষণ সকল বলিতেছে, কেহ দুঃস্বপ্নের বর্ণনা করিতেছে, কেহ পিশাচের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছে। কেহ বা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কি গণনা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিতেছে, কেহ বা অমঙ্গলসূচক কি কি লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছে। কোথাও বা একজন 'সংসার অনিত্য' 'কলিকালের মহাদোষ' 'দৈব কি নির্দ্দয়' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। তখন আর একজন 'ধর্ম্ম কি আর আছে?' 'রাজকুলদেবতাই বা কি করিতেছেন?' বলিতেছে। কোথাও বা আশ্রিত কুলপুত্রগণ আশ্রয়-নাশ-শঙ্কায় নিজ নিজ ভাগ্যের নিন্দা করিতেছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে বিবিধ ঔষধের গন্ধ। অগ্নিতে বিবিধ ঘৃত, তৈল ও ক্বাথের পাক হইতেছে।

তৃতীয় মহলে রাজার কক্ষ। সেখানে পীড়িত রাজা কক্ষমধ্যে শয্যায় শায়িত সে মহলের দ্বারপথে বহু বেত্রধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তিনগুণ পর্দ্দা দ্বারা কক্ষে কক্ষে যাইবার পথগুলি ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। পক্ষদ্বার সকল রুদ্ধ। গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রবল বেগে বায়ু-প্রবেশ বন্ধ করা হইয়াছে। কবাট উন্মোচন বা বন্ধ করিবার শব্দ নিষিদ্ধ। কাহারও সোপানে উঠিবার সময় পদশব্দ হইলে প্রতিহারী ক্রুদ্ধ হইতেছে। সকল কার্য্য ইঙ্গিতে সম্পন্ন হইতেছে। বাক্য ব্যয় নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাছে শব্দ হয় বলিয়া বর্ম্মধারী পরিচারক বহুদূরে অবস্থিত হইয়াছে। রাজার আচমন জল লইয়া পরিচারক এককোণে বসিয়া আছে, ইঙ্গিত মাত্রেই চকিত হইয়া উঠিয়া আসিতেছে।

অন্তঃপুরে বারাঙ্গনাদের অধরআজ তাম্বূলরাগহীন। কঞ্চুকীরা শোকে সঙ্কুচিত। বন্দিগণ নিরানন্দ। আশাহীন নিকটস্থ পরিচারক নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। চন্দ্রশালিকায় প্রধান ব্যক্তিবর্গ স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। রাজবান্ধবসমূহের পত্নীগণ প্রচ্ছন্ন বাতায়ন দিয়া উকি দিতেছেন। দারুণ পীড়ার সংবাদে তাঁহারা শোকবিধুর। চতুঃশালিকায় উদ্বিগ্ন পরিজন

সকল দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে। মন্ত্রীরা বিমর্ষ। বিষম জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া বৈদ্যেরা ভীত। পুরোহিতগণ বিষণ্ণ। বন্ধু-বান্ধব অবসন্ন। সামন্তরাজগণ সন্তপ্তচিত্ত। রাজার প্রিয় অধীনস্থ ভূপালগণ স্বামীভক্তিতে আহার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণদেহে অবস্থিত। সমস্ত রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলদেহ রাজপুত্রগণ ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। চামরধারিণী হতচেতনা হইয়া বিলুণ্ঠিত, শিরোরক্ষী দুঃখে পাণ্ডুবদন। রাজার কক্ষের নিকটে কেবল অতিশয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

একদিকে বিমর্ষ বৈদ্যগণ পাকশালার অধ্যক্ষকে পথ্যের বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, অপরদিকে দ্রব্যগুণজ্ঞ জনসমূহ ঔষধসমূহ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে।

পীড়িত রাজা ধবল-গৃহে শায়িত। তাঁহার অতিশয় তৃষা। সেই তৃষার কথঞ্চিৎ শান্তির জন্য রাজার সমক্ষে একজন অনুচর আর একজন অনুচরের মুখে উচ্চ হইতে জল ঢালিয়া দিতেছে। রাজার আজ্ঞায় বহু ব্যক্তিকে ভোজন করান হইতেছে। নিজে পানভোজনে অক্ষম, অপরের পানভোজন-দর্শনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেছেন। রাজাও অনবরত শীতলজল পান করিতেছেন। তাঁহার পানের জন্য বিবিধপ্রকার পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। জলপাত্রে তক্র (ঘোল) রাখিয়া পাত্রটি তুষারে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। দেহে স্পর্শের জন্য শলাকায় শ্বেত বস্ত্রখণ্ডে স্থাপিত কর্পূরচূর্ণ লেপিত হইতেছে। গণ্ডূষ-গ্রহণের জন্য দধিমণ্ড সংগৃহীত, তাহা নব মৃণ্ময়পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। পাত্রের উপর পঙ্কলেপন করা হইতেছে। একধারে মৃণাল রাশি, সেগুলি জলার্দ্র নলিনীপত্রে আবৃত। যে স্থলে পানীয়পাত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে সে স্থলটি নীলোৎপল সমূহে আচ্ছাদিত। কোথাও উত্তাপে শোধিত সলিল বারিধারা পাতে শীতল করা হইতেছে। শর্করার গন্ধে কক্ষ আমোদিত। পাটল বর্ণের জলপূর্ণ বালুকানির্ম্মিত জলাধারের দিকে পীড়িত নরপতি কণ্ঠাধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বহুচ্ছিদ্র জলপাত্রের চতুর্দ্দিকে জলার্দ্র শৈবাল বেষ্টিত করা হইয়াছে। মণিপাত্রে লাজ, শক্তু ও কর্কশর্করা রক্ষিত। চারিদিকে শীতজনক ঔষধ প্রক্ষিপ্ত। স্ফটিক, শুক্তি ও শঙ্খনিচয় বিরাজমান। মাতুলুঙ্গ,

আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম প্রভৃতি বহু ফল সঞ্চিত হইয়াছে। নানা গ্রাম হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া কক্ষমধ্যে শান্তিজল ছিটাইতেছেন। দাসীরা ললাটে লেপনার্থ পদার্থবিশেষ শিলাতলে চূর্ণ করিতেছে।

নরপতি বিষম জ্বরজ্বালায় অনবরত পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছেন। শয্যার আস্তরণ অনবরত লুণ্ঠনে ভাঁজ হইয়া গিয়াছে। পরিচারিকাগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মুক্তাচূর্ণ ও চন্দন লেপন করিতেছে। অনবরত কমল, কুমুদ ও ইন্দীবররাশি তাঁহার গাত্রে স্পর্শ করান হইতেছে। মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা; দৃঢ়ভাবে শিরোদেশ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। ললাটে নীল শিরারাশি প্রকটিত, চক্ষুকোটর অন্তঃপ্রবিষ্ট, দন্তশ্রেণী অতিধবল, জিহ্বা কালিমাময়। নরপতি অনবরত উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার বক্ষে মণি-মুক্তাহার, চন্দন ও চন্দ্রকান্ত মণি। বেদনায় মধ্যে মধ্যে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন। কখনও কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। বৈদ্যেরা সভয়ে তাঁহাকে দেখিতেছে। তাঁহার কান্তি আর নাই। দেহ ক্ষীণ, নিদ্রাহীন নিশাযাপনে বিবর্ণ। জঙ্ঘা ও গাত্রসন্ধিতে বেদনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ নানা রসে লিপ্ত। সজলনয়নে চামরধারিণী চামর-ব্যজন করিতেছে। রাজমহিষী দেবী যশোবতী মুহুর্মুহুঃ মস্তক ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "আর্য্যপুত্র! ঘুমাইলে কি?"

নৃপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন পিতার পীড়ারম্ভের সময় নগরে ছিলেন না। দূতমুখে সংবাদ পাইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্বচালনায় নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন সুষেণ নামক বৈদ্যকুমার রাজপুরী হইতে অপ্রসন্নমুখে বাহির হইয়া আসিতেছে। সুষেণ হর্ষবর্দ্ধনকে নমস্কার করিলে হর্ষবর্দ্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুষেণ! বাবা একটু ভাল ত?" সুষেণ বলিল "এখনও ভাল লক্ষণ কিছু নাই। তবে আপনাকে দেখে যদি কিছু ভাল হয়!" হর্ষবর্দ্ধন একেবারে পিতার কক্ষে উপনীত হইয়া পিতার অবস্থা দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

প্রভাকরবর্দ্ধন দূর হইতে তনয়কে দেখিয়া সেই অবস্থাতেও হাত বাড়াইয়া "আয় বাপ আয়" বলিয়া শয্যা হইতে অর্দ্ধশরীর উত্তোলন করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে নিকটে গিয়া বিনয়ে অবনতশীর্ষ হইলে প্রভাকরবর্দ্ধন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন এবং অঙ্গে অঙ্গ এবং কপোলে কপোল স্পর্শ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়ন নিমীলন করিয়া জ্বরজ্বালা ভুলিয়া গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে হর্ষবর্দ্ধন পিতৃবাহুপাশমুক্ত হইয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে অসনে উপবেশন করিলেন। নরপতি নিমেষরহিত নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন এবং কম্পমান কর দ্বারা পুনঃ পুনঃ তনয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "রোগা হয়ে গেছ ।" তখন হর্ষবর্দ্ধনের মাতুলপুত্র ভণ্ডি বলিলেন "দেব! রাজকুমার আজ তিনদিন কিছু আহার করেন নাই।"

তাহা শ্রবণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরপতি বলিলেন "বৎস—তুমি পিতাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমার হৃদয়ও অতি কোমল। তোমাতেই আমার সুখ, রাজ্য বংশ ও প্রাণ অবস্থিত। কেবল আমরা কেন সকল প্রজার সুখও তোমার উপরই নির্ভর করিতেছে। যাও, স্নানাহার কর। তুমি আহার করিলে তবে আমি পথ্য গ্রহণ করিব।"

হর্ষবর্দ্ধন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে পিতা পুনরায় আহার করিতে আদেশ করিলে, সেই ধবলগৃহ হইতে নির্গত হইয়া নিজ গৃহে গিয়া কয়েক গ্রাস অনিচ্ছার সহিত আহার করিলেন। আচমন করিতে করিতে চামরধারিণীকে আজ্ঞা করিলেন "জানিয়া আইস পিতা কেমন আছেন।" সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "দেব! সেইরূপই।" হর্ষবর্দ্ধন এই শুনিয়া তাম্বূল গ্রহণ না করিয়া নির্জ্জনে বৈদ্যগণকে ডাকাইয়া বিষণ্ণহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" তাহারা বলিল "দেব! ধৈর্য্য ধারণ করুন। কতিপয় দিনের মধ্যেই পিতা সুস্থ হইয়াছেন শ্রবণ করিবেন।"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রসায়ন নামক অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক রাজকুলে সংবর্দ্ধিত একজন বৈদ্যযুবা কোনও কথা কহিলেন না। সে প্রভাকরবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সযত্নে লালিত হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ তাহারআয়ত্ত। তাহার

স্বাভাবিক বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অধোমুখে নীরব রহিল দেখিয়া হর্ষবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই রসায়ন! কোনও কিছু খারাপ দেখ্‌ছ কি?" সে বলিল "দেব! কাল সকালে জানাইব।"

বৈদ্যেরা চলিয়া গেল। রজনীর প্রারম্ভে হর্ষবর্দ্ধন পুনর্ব্বার ধবল গৃহে গেলেন। সেখানে প্রভাকরবর্দ্ধনের তখন মহান্ প্রদাহ উপস্থিত। তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন "হারিণি! হার আন। বৈদেহি। মণিদর্পণ দাও। লীলাবতি! হিমচূর্ণ ললাটে লেপন কর। ধবলাক্ষি! চন্দনচূর্ণ দাও। কান্তিমতি! চক্ষে চন্দ্রকান্ত মণি স্পর্শ করাও। কলাবতি! কপোলে কুবলয় দাও। চারুমতি! অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দাও। পাটলিকে! বস্ত্র দ্বারা ব্যজন কর। ইন্দুমতি! দাহ শান্তি কর। মদিরাবতি! জলার্দ্র অরবিন্দ দ্বারা সুখোৎপাদন কর। মালতি! মৃণাল আন। আবন্তিকে! তালবৃন্ত সঞ্চালন কর। বন্ধুমতি! শিরোদেশ ধারণ কর। ধারণিকে! গলদেশ ধর। তুরঙ্গবতি! বক্ষে সজল হস্ত দাও। বলাহিকে! হস্ত মর্দ্দন কর। পদ্মাবতি! পা টিপিয়া দাও। অনঙ্গসেনে! গাত্র মর্দ্দন কর। বিলাসবতি। কত রাত্রি? কুমুদ্বতি! ঘুম আস্‌ছে না, গল্প বল।"

হর্ষবর্দ্ধন পিতার এইরূপ কথা শুনিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন তখন নগরে ছিলেন না। তিনি সসৈন্য হূণবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। প্রভাতে তাঁহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে হর্ষবর্দ্ধন উপর্য্যুপরি দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহী দূত প্রেরণ করিতে লগিলেন। এমন সময় হর্ষবর্দ্ধন শুনিলেন তাঁহার সম্মুখে স্থিত বিমলিন তরুণ রাজপুত্রগণ অনুচ্চস্বরে 'রসায়ন' বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "রসায়নের কথা কি বলিতেছ?" তাহারা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে তাহারা দুঃখে অতি কষ্টে বলিল "দেব! রসায়ন অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে।" হর্ষবর্দ্ধন এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে অপ্রিয় বাক্য শুনাইতে হইবে বলিয়া রসায়ন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দুঃসহ দুঃখে অভিভূত হইয়া

উত্তরীয়ে মুখ আবরণ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন শয্যায় নিপতিত হইলেন। রাজপ্রসাদে আর গমন করিলেন না।

প্রজাবর্গ সকলে তখন দুঃখে অতিভূত। সকলে গালে হাত দিয়া কাঁদিতেছিল ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'হায় হায়' বলিয়া খেদ করিতেছিল। তাহাদের নিদ্রা ছিল না। নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ, হাস্য পরিহাস, সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বসন ভূষণ প্রভৃতি সকল উপভোগের বস্তু অনাদৃত। আহার ও পানীয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এই সময় অমঙ্গলসূচক উৎপাত সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ধরিত্রী ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উদ্‌ঘাত উপস্থিত হইল। দিকে দিকে দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতু সকল দেখা দিল। সূর্য্য দীপ্তিহীন, তাহার মধ্যে কবন্ধকায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। (১) চন্দ্রের চারিদিকে দীপ্ত মণ্ডল দেখা দিল। দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। অকালে মেঘোদয় হইয়া দশদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল বায়ু ভীষণ শব্দে বহিতে লাগিল। পাংশু বৃষ্টিতে আকাশ ধূষর বর্ণ বোধ হইতে লাগিল। উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইল। শিবাগণের মুখে অগ্নি উদ্‌গীরিত হইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদে মুক্তকেশা কুলদেবতাগণের প্রতিমা দৃষ্ট হইল। সিংহাসন সমীপে ভ্রমরমণ্ডলী উড়িতে লাগিল। অন্তঃপুরের উপর বায়সের কর্কশ স্বর অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। শ্বেত রাজছত্রের প্রধান মণি একটা গৃধ্র মাংসখণ্ড ভ্রমে চঞ্চু পুটের আঘাতে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

সেদিন কাটিয়া গেল। তারপর দিন প্রভাতে হর্ষবর্দ্ধনের সমীপে রাজমহিষী দেবী যশোবতীর প্রতিহারী বেলা কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূতলে হস্ত রক্ষা করিয়া অধোমুখী হইয়া বলিল "দেব! রক্ষা করুন্। রক্ষা করুন্। স্বামী জীবিত থাকিতেই দেবী কি করিতে যাইতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরের দিকে চালিয়া

(১) অনুরূপ বর্ণনা—ভট্টি কাব্য দ্বাদশ সর্গ ৭০ শ্লোক।

গেলেন। সেখানে রাজমহিষীগণ অনলে প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে একবার পরিচিতগণের সহিত শেষ সম্ভাষণ করিতেছিলেন। কেহ নিজ পালিত চূতবৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল "বাছা তোমার মা চলিল।" কেহ জাতীগুচ্ছকে বলিল "যাচ্ছি, আজ থেকে তোমায় দেখবার কেউ রইল না।" কেহ অশোক বৃক্ষে পাদপ্রহার করিয়াছিল, দাড়িমলতার পল্লবভঙ্গ করিয়া কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছিল, আজ তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল। কেহ যে বকুলবৃক্ষে গণ্ডুষে করিয়া মদ্য নিক্ষেপ করিত তাহার নিকট গিয়া শেষ দেখা করিল। কেহ প্রিয়ঙ্গুলতাকে শেষ আলিঙ্গন করিল। কেহ পিঞ্জরে স্থিত শুক সারিকার সহিত শেষ সম্ভাষণে রত হইল। কাহারও পালিত ময়ুর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কেহ নিজ পালিত হংসমিথুন অন্যকে পালন করিতে অনুরোধ করিয়া গেল। কেহ চক্রবাক ও বিবাহ দেয় নাই, তজ্জন্য অনুতপ্তচিত্তে বিদায় লইল—সে আর বিবাহ দেখিতে পাইবে না। কেহ কেহ অনুসরণরত গৃহ-হরিণকে ফিরাইয়া দিল। কেহ বা শেষবার বীণাকে আলিঙ্গন করিয়া লইল।

সঙ্গিগণ ও পরিচিত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও সকলে বিদায় লইতেছিল। "চন্দ্রসেনে! একবার ভালকরে দেখে নাও।" "বিন্দুমতি। এই শেষ প্রণাম।" "চেটি। পা ছেড়ে দাও।" "আর্য্যে কাত্যায়ণিকে, কাঁদ্‌ছ কেন? দৈব আমায় নিয়ে যাচ্ছে।" "কঞ্চুকি, আমি অলক্ষণা, আমায় প্রদক্ষিণ করুন কেন?" "ধাত্রি! ধৈর্য্য ধর। পায়ে প'ড়ো না।" "ভগিনি! একবার গলা জড়িয়ে ধর।" "আহা, মলয়বতীকে একবার দেখ্‌তে পেলুম না।" "সানুমতি! এই শেষ প্রণাম।" "কুবলয়বতি! এই শেষ আলিঙ্গন।" "সখীগণ! প্রণয়বশতঃ কলহ করেছি, ক্ষমা করো।" চারিদিকে এইরূপ আলাপ শ্রুত হইতেছিল।

রাজমহিষী যশোবতী তখন স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া রাজপুরী হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। সবে মাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছেন—পরিধানে রক্তবাস ও কাঁচলি। কণ্ঠে রক্তসূত্র ও হার।

কর্ণে কুণ্ডল। সর্ব্বাঙ্গে রক্তিম কুঙ্কুমরাগ। স্খলিত বলয় হইয়া পড়িতেছে। গলদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন। পতির অস্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রাজছত্রের সম্মুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সচিবগণকে উপদেশ দিতে দিতে আসিতেছিলেন। চারিদিকে শোকার্ত্ত বন্ধুবান্ধব রোদন করিতেছিল। কঞ্চুকীগণ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তিনিও সজলচক্ষে স্নেহভাজন অনুগত জনগণকে দেখিতে দেখিতে, পশুপক্ষীগুলিকে পর্য্যন্ত শেষ সম্ভাষণ করিয়া ও বৃক্ষগুলিকে পর্য্যন্ত শেষ আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইতেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতার চরণে নিপতিত হইলেন। বলিলেন "মা, আমি হতভাগ্য, তুমিও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ?" দেবী যশোবতী আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে তুলিয়া তাহার নয়ন মুছাইয়া বহুবিধ আশ্বাস দিলেন। বুঝাইলেন, বিধবা হইয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাই বিধবা হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন অধোমুখে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবী যশোবতী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন এবং পদব্রজেই অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। সেখানে দীপ্ত অগ্নিশিখায় পতিব্রতা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন তখন পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন তাঁহারও শেষ মুহূর্ত্ত আসন্ন। নেত্রের তারকা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রভাকরবর্দ্ধন ক্ষীণকণ্ঠে দুই চারিটি উপদেশ দিতে দিতে মরণের অঙ্কে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রোদয় হইলে হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং পিতার শবশিবিকায় স্কন্ধ অর্পণ করিয়া সামন্ত রাজবর্গ, পুরোহিত ও পৌরজনগণের সহিত সরস্বতী-তীরে উপনীত হইলেন। তথায় রাজোচিত চিতায় প্রভাকরবর্দ্ধনের দেহ ভস্মীভূত হইল।

হর্ষবর্দ্ধন সেই রজনী ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার চারিদিকে পরিজনেরা শোকে অভিভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। পিতৃদেবের অতুল গুণরাশির কথা চিন্তা করিতে করিতে হর্ষবর্দ্ধন রজনী যাপন করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া তিনি রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্তঃপুরে তখন নূপুর-ধ্বনি নীরব, কেবল কতকগুলি কঞ্চুকী বিচরণ করিতেছে। কক্ষমধ্যে বিষণ্ণ পিতৃ-পরিজন নিপতিত। রাজহস্তী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। হস্তিপালক অনবরত রোদন করিতেছে। অশ্বপালগণের অবিরাম ক্রন্দনে মন্দুরায় অশ্বনিচয় নীরব। 'জয়' শব্দ আর উচ্চারিত হইতেছে না। রাজপ্রাসাদে কলকল রবও আর নাই।

হর্ষবর্দ্ধন সরস্বতীতীরে গিয়া পিতার উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। পরে স্নান করিয়া, মাথা না মুছিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। চামর, ছত্র পরিহার করিয়া পদব্রজেই ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মৃত নরপতির অতিপ্রিয় ভৃত্য, বন্ধু ও সচিবগণ দারাপুত্র পরিত্যাগ করিয়া অত্মীয়-গণের নিষেধ না মানিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল। কেহ উচ্চ পর্ব্বত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। কেহ জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিল।† কেহ তীর্থযাত্রা করিল, কেহ কুশশয্যায় অনাহারে শয়ন করিয়া রহিল। কেহ তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে, কেহ বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপত্যকায়; কেহ বা বনে গিয়া মুনিব্রত অবলম্বন করিল। তাহারা শিরে জটা ও পরিধানে গৈরিক বসন ধারণ করিল। কেহ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া কপিলপ্রচারিত মত অনুসরণ করিল।

পিতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রাচীন কুলপুত্রগণ, গুরুগণ, শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পারদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, বিচক্ষণ অমাত্যগণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীগণ, প্রশান্তচেতা মুনিগণ, ব্রহ্মবাদিগণ ও পৌরাণিককথাকুশল ব্যক্তিগণ হর্ষদেবকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অশৌচদিবসগুলি অতিবাহিত হইয়া গেল। অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণ প্রথমে মৃত নরপতির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডভোজন করিল। ব্রাহ্মণগণকে মৃত নরপতির ব্যবহারার্থ সংগৃহিত শয্যা, আসন, চামর, ছত্র, বস্ত্র, বাহন, শস্ত্র প্রভৃতি বিতরিত হইল। রাজহস্তীকে অরণ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যেখানে নৃপতির চিতা রচিত হইয়া-ছিল সেখানে সুধাধবলিত চৈত্য নির্ম্মিত হইল। নৃপতির অস্থিখণ্ডগুলি তীর্থস্থলে প্রেরিত হইল।

† জাপানের হেরী কেরী প্রথা স্মরণ করুণ।

তখন দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে ক্রন্দন মন্দীভূত হইয়া আসিল। বিলাপও বিরল হইল। দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রু-প্রবাহও ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইয়া গেল।”

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

পল্লী চিকিৎসক।

৭ম অধ্যায় (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সু—এইবার ‘ঘা’ এর ঔষধ বল।

হ—আচ্ছা তাই হউক। এই প্রথমে কাটা ‘ঘা’ হইতে আরম্ভ করি।

সু—আচ্ছা, তাইবল।

হ—কোনস্থান কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়া কয়লা ঘষিয়া দিলে আরোগ্যহয়।

কাটিবা মাত্র কেরোশিন তৈল দিলে বা ক্ষতস্থানে চিনি দিলে রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়া যায় ও যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ভাল তার্পিন হইলে কাটা স্থানটা জোড়ালাগিয়া যায়।

দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া বা গাঁ্যাদাফুলের পাতা রগ্‌ড়াইয়া পটী বান্ধিলে অথবা দুর্ব্বা ও লাল গাঁ্যাদাফুল ফিট্‌কারী ভিজান জলে বাঁটিয়া লাগাইলে রক্তপড়া নিবারণ হয় ও ঘা জোড়া লাগিয়া যায়।

আপাং পাতার রস দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

খয়েরগুড়া বা হরিদ্রা বাঁটা দিলে শুকাইবে।

পাথর কুচির পত্র ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে বন্ধন করিলেও বিশেষ উপকারহয়।

অল্প পরিমাণে কোন স্থানে কাটিয়া গেলে শীতল জলের মধ্যে সেই স্থান টিপিয়া ধরিলে অবিলম্বে আরোগ্য হয়। জলপটী কাটা ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভাদালে মুথা চূর্ণ শত ধৌত ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

সু—কোনও স্থান ছেঁচিয়া গেলে তখন কি করিতে হয়।

হ—আঙ্গুল বা কোন ও স্থান ছেঁচিয়া গেলে তথায় ধুপের ধুম লাগাইলে সারে।

কড়ি অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে। উক্ত চূর্ণ ২।৩ রতি পরিমাণে সেবন বা কাঁচাদুধ পান করিলে ভগ্নাস্থি সংযোজিত হয়।

রসূন, মধু লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশাইয়া সেবনে ছিন্ন ভিন্ন স্থান চ্যুত অস্থি অচিরে সংযোজিত হয়।

সু—আচ্ছা, ঠাকুদ্দা, ঢেকি ত বাঙ্গালীর প্রায় ঘরে ঘরেই আছে। অসতর্কতা প্রযুক্ত সময়ে সময়ে অনেকের হাতে উহার "পাড়" (আঘাত) লাগিয়া যায়। উক্ত আঘাত জনিত বেদনা বিষ বড়ই অসহ্য; উহার যে বিষ লামায় দেখি ও ভাল হয় উহার কিছু জান?

হরি—এই শুনুন:—

"ধপরকার ধপরকার ধপরসিংহাসন; পদ্মার আসনে দেবীর আসন;
আসনেতে এসেবিষ ইমি ঝিমি বায়; শঙ্কর আজ্ঞায় বিষলাম্যা যায়;
কার আজ্ঞা? মা মনসার আজ্ঞা;
মা মনসার আজ্ঞানরে, পার্ব্বতীর— —রক্ত মহাদেবের বাপের মুখে পড়ে।"

সু—দাদা, এ যে বড় গালাগালি? ‡

—আর ভাই, ঐত যত গোল; অধিকাংশ মন্ত্রের মধ্যেই শেষ ভাগটা "গালাগালি"। শিক্ষিতাভিমানীরা একেইত আমার কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে; চোকে আঙ্গুলদিয়া দেখাইলেও প্রত্যক্ষিতা স্বীকার করিতে চাইবেনা। তাইত আবার এই অশ্লীলতা—কি করি ভাবিয়া

‡ প্রাচীন প্রচলিত মন্ত্র তন্ত্র একরূপ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, এই সকলও চিকিৎসার অঙ্গীয়। সময় সময় ইহাদ্বারাও আশ্চর্য্য রোগ প্রতিকার হইতে দেখা যায় পক্ষান্তরে ইহাদ্বারা প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির স্বরূপও অবগত হওয়া যায় বলিয়া ঐতিহাসিকের নিকট বড়ই মূল্যবান। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম ভূতবিদ্যাও মন্ত্র তন্ত্রে পরিপূর্ণ। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ইহার রহস্য ভেদে সমর্থ নহে তথাপি ইহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। ভরসা করি পাঠক বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবেনা। আঃ বিঃ সঃ

কুল পাইনা। সে যাহা হউক তুমি দাদা লিখিয়া যাও মন্ত্রের কোনও অংশই বাদ দেওয়া যায় না ; তাহা হইলে উহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উপরোক্ত মন্ত্রের—"– –" এইরূপ চিহ্নিত স্থানটায় পড়িবে "ছৈচ্ছা"।

সু—কই মন্ত্রটীর নিয়ম কি তাহাত বলিলে না।

হ—এই বলিতেছি।

যদি হাতের ফানার উপর ঢেকির আঘাত লাগে, তবে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে দড়ি বাঁধিয়া বিষ তুলিতে হয়। যদি আঙ্গুলের উপর আঘাত লাগে তবে পরবর্ত্তী ভাল আঙ্গুলের বিষ খুলিতে হয়। দড়িটী চিকণ হওয়া চাই ; দড়ি না করিয়া পাট দ্বারাও ওরূপ করা চলে। উহা কসিয়া বাঁধিয়া যে পর্য্যন্ত বিষ না আসে, সে পর্য্যন্ত একবার মন্ত্র পড়িবে ও একটী করিয়া ফু দিবে এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে দড়িটী বা পাটগাছা দোয়াইবে। যখন আঙ্গুলের মাথায় বিষ আসিয়া রোগীকে যন্ত্রণা দিবে তখন মাঁদার বা লেবু কাঁটাদ্বারা বিষ বাহির করিয়া ফেলিবে।

সু—ইহার জন্য স্বতন্ত্র কোনও ঔষধ আছে কি ?

হ—আছে ; বাইরকলিপাতা, পোড়া বালি ও যে ঢেকির আঘাত লাগিয়াছে উহার 'মুনী' হইতে চাঁছিয়া একটু ছাল ;—একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিলে ব্যাথা দূর হয় ও ঘাঁ এবং ফুলা সারিয়া যায়।

সু—কোনরূপ চোট লাগিয়া হাত পা ভাঙ্গিলে উহার কি ঔষধ বল ?

ব্রহ্মযষ্ঠির ডাল রোগীর হাতে তর্জ্জনী হইতে অনামিকা পর্য্যন্ত এই তিন আঙ্গুলি পরিমাণে টুক্‌রা করিবেন ; উহার তিনখণ্ড একত্র আহত স্থানে বুলাইলে (মলিলে) বেদনা সহ রোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

আকান্দি লতা এমন ভাবে থেৎলাইতে হয় যেন উহা ছিড়িয়া না যায় ; উহার সহিত আদা বাঁটা ও কিছু সৈন্ধব চুর্ণ মাখাইয়া ভগ্ন স্থান ঠিক করিয়া বেশ করিয়া মোড়াইয়া বান্ধিতে হয়। ইহাতে বেদনা সহ রোগ আরোগ্য হয়। পূর্ব্বদিন ঠিক যে সময় বাঁধিবেন, পর দিন ঠিক তেমনি সময় খুলিয়া দিবেন,—নতুবা অনিষ্ট সম্ভাবনা। এরূপ ২।১ দিন বাঁধিলেই রোগ সারে।

হ—"ওচ্‌কা কোচ্‌কা ব্রহ্মার তেল। গায় হাত দিতে ভাঙ্গা গেল॥
ইল যায় বিল যায়। মাউচ্ছা রাঙ্গা ধরিয়া খায়॥
মাছ ধরে কাটা ঝাড়ে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে॥
সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।"

মচ্‌কা বা ভগ্ন স্থানে সর্ষপতৈল মাখিয়া এই মন্ত্রে তিনবার ঝাড়িবেন। প্রতিবারেই এক একটী ফু দিতে হয়। ভগ্ন স্থানটা সহ্য মত দলিয়া ঝাড়িতে হয়।

আরও একটী মন্ত্রে ঝাড়িতে পারা যায়।

"সয়তানে ভাঙ্‌ল হাড়, ভাঙ্গি তুলা ঝাড়ি।
রক্তমাংসে জোড়া লাগিছ্‌ ওস্তাদের দোহাই॥"

পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই ঝাড়িতে হয়। ত্রিসন্ধ্যা দরকার। অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে 'ঝাড়া' চাই! (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, রাজাবাড়ী—ঢাকা।

আহরণ—বালরোগ চিকিৎসা।

সূতিকাগৃহ এবং প্রসূতা।

(বৈদ্যভূষণ হইতে—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের দেশে প্রসূতাদের জন্য যেরূপ গৃহ মনোনীত করা হয়, স্বাস্থ্যের নিয়মানুসারে ইহার উপযোগিতা বিচার করা ত দূরের কথা পরন্তু স্বেচ্ছাচারিতা বা অজ্ঞানতার বশেই যেন এই নির্ব্বাচনে ভ্রম করে, ইহার ফল শেষে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। প্রসূতা এবং সন্তান উভয়েই ইহার বিরুদ্ধ প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অনেক সূতিকাগৃহ দেখা যায়, যাহাকে নরককুণ্ড বলিলেও অযুক্ত হয় না। ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অনেক বালক কেবল সূতিকা গৃহের

দোষেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিজেদের অজ্ঞানতার দোষে মাতাপিতা প্রিয়তম শিশুর বিয়োগে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বিচার করিলে বুঝা যায়, সূতিকাগৃহে প্রসূতার বা সন্তানের যে সকল ভয়ানক রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার একমাত্র কারণ অজ্ঞানতা বা মূর্খতা। সুতরাং সূতিকাগৃহ এক অত্যুত্তম স্থানে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যাহাতে ঋতু বিশেষে কোন অসুবিধা না ঘটে অর্থাৎ শীতে ঠাণ্ডায়, গ্রীষ্মে উষ্ণতা ; বর্ষায় জলাদি দ্বারা কষ্ট ও পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। গৃহটি এমন হওয়া চাই,যেন স্বাস্থ্যজনক হয়,আরবায়ু ও আলোক রীতিমত চলাচল করিতে পারে। এই সমুদয় ব্যবস্থা দেশ কাল ও অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া যথাসম্ভবরূপে করিতে হইবে। সক্ষম হইলে গৃহের উপর তলায় রাখাও মন্দ নহে। এইরূপ সংস্কার চিত্ত হইতে দূর করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, প্রসূতাকে এখানে রাখিলে স্থানটি অপবিত্র হইয়া যাইবে বা কাহাকেও ছুঁইলে সে অশুদ্ধ হইবে। ঘরের মেজে যদি পাকা বাঁধান ও বেশ শুষ্ক না হয় তবে উহা এমন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যেন কোনরূপে ভূমির আর্দ্রতা স্পর্শ না করে। প্রসবকালীন মাটিতে স্থান না দিয়া খাট বা চৌকির উপর রক্ষা করিলে উত্তম হয়। যদি মাটিতেই স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয় তবে অন্ততঃ মাটিতে কোন চাটাই প্রভৃতির ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শীতকালে গৃহের শৈত্যবারণের নিমিত্ত অগ্নি রাখিতে হইলে ঘরের বাহিরে কয়লা জ্বালাইয়া পরে ভিতরে আনিবে। যেহেতু উহা ঘরের ভিতর জ্বালাইলে উহা হইতে একপ্রকার বিষ (Carbonic Gass) উৎপন্ন হয় যাহা প্রসূত এবং শিশুর পক্ষে রোগোৎপাদক। অগ্নি কখনই প্রসূতার নিকটে রাখিবে না, এরূপ স্থানে রাখিবে যেন ঘরটি উষ্ণ হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রসূতা ও শিশুর কোন প্রকার রোগের আশঙ্কা থাকে না।

সদ্যোজাত শিশুর রক্ষা।

প্রসবের কিছুক্ষণ পরই শিশুর নাড়ী ছেদন করিতে হয়। কোন কোন মূর্খা ধাত্রী নাড়ীর একবারে নিকটেই কাটিয়া দেয়। ইহাতে অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। কম পক্ষে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত নাড়ী বাদ দিয়া কাটা উচিত।

কাটিবার পূর্ব্বে রেশমী অথবা সূতীর শক্ত সূত্রদ্বারা বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইবে, তাহাতে রক্ত নির্গত হইতে পারিবেনা। যে পর্য্যন্ত প্রসূতার অমরা (আম্বল বা ফুল) নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত অবস্থা সন্তোষজনক বা ভয়রহিত বলিয়া মনে করিবে না। এমতাবস্থায় ফুলের নাড়ীর গোড়াতেই বাঁধা আবশ্যক। কোন কোন স্থানে নাড়ীচ্ছেদনের জন্য তীক্ষ্ণ ছুরিকার পরিবর্ত্তে বাসের ছিল্‌কা নলের চটা বা অন্য কোন ধারাল পদার্থ লওয়া হয়। এই সকলের দ্বারা পরিষ্কাররূপ কাটা হয় না, পরন্তু কর্কশ ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে নবপ্রসূত বালকের কষ্ট পাওয়ারও সম্ভাবনা। কোন কোন স্ত্রীলোকের এইরূপ মত যে, লৌহ নির্ম্মিত ছুরি প্রভৃতি দ্বারা নাড়ী কাটা উচিত নহে। ইহা তাহাঁদের ভ্রমই বলিত হইবে। তবে ইহা ঠিক যে, নাড়ী বন্ধনার্থ সূত্র ও ছেদনার্থ তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি যাহা লওয়া হয়, উহা জলাদিদ্বারা বেশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য কারণ, উহাতে কোন কীটাণু প্রভৃতি থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। আরও কথা এই যে, অমরা নির্গত হওয়ার পর যদি নাড়ীতে সঞ্চালন দৃষ্ট হয় তবে উহা কাটিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকে। ইহাও যে সন্দেহাত্মক ভ্রম তাহা বলা যায়। নাড়ী সঞ্চালনের জন্য কোন ভয় করিবারই কারণ নাই। নাড়ী ছেদনের পর বালককে ঋতু অনুযায়ী অবস্থা বিশেষে উষ্ণ অথবা ঈষদুষ্ণ জলে সামান্য পরিমাণ উত্তম সাবান মিলাইয়া স্নান করাইয়া দিবে। যদি অত্যধিক শীতাদির দরুণ স্নান দেওয়া উচিত বলিয়া প্রতীত না হয়, তাহা হইলে কেবল তিলতৈল শিশুর সম্পূর্ণ শরীরে মাখাইয়া সূক্ষ্ম পরিষ্কৃত কোমল বস্ত্রদ্বারা বেশ করিয়া মুছাইয়া ফেলিবে। বালকের শরীরে অধিক ময়লা থাকিলে এই বিধানেই উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। কোন কোন দেশে এই ময়লা দূর করিবার নিমিত্ত একপ্রকার ক্ষার মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সবচেয়ে তৈল ব্যবহারই সর্ব্বোত্তম। শিশুকে স্নান করাইতে হইলে ইহা বেশ স্মরণ রাখিবে যেন ধূলা বা অন্য কোন পদার্থ জল সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া চক্ষুতে না পড়িতে পারে, এরূপ হইলে শিশুর নেত্ররোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। সুতরাং জল বেশ নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক।

নাড়ী ছেদনের পর নাড়ীর ক্ষত সর্ব্বদা খোলা রাখাই উচিত এবং তাহাতে সময় সময় অল্প ২ উষ্ণ ঘৃত লাগাইয়া দিবে। কেবল যে ঘৃতই লাগাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে এমন নহে, ক্ষতের অবস্থা বুঝিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতেও দোষ নাই। স্নানাদিদ্বারা বালক পরিশুদ্ধ হইলে কাপড় জড়াইয়া মাতার নিকট দিবে, এই সময় বালক প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়ে। শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার নিদ্রাভঙ্গ করাও উচিত নহে। বালক সহজে না ঘুমাইলে মাতার স্তন্য পান করিতে দিবে। শীত ঋতুতে শিশুকে ঠাণ্ডা হইতে বিশেষরূপে রক্ষা করিতে হইবে। যেহেতু কোমল শরীরে ইহারা শীত সহনে সম্পূর্ণ অক্ষম। কোন কোন দেশে এমন প্রথাও আছে যে, বালককে কোনপ্রকার জামা গায় দিতে দিবেনা, শুধু একখানা কাপড় জড়াইয়াই নিশ্চিন্ত হয়। এই প্রথা অত্যন্ত হানিকারক। সময় বিশেষে উপযুক্ত জামাদ্বারা শরীর আচ্ছাদন করাই সঙ্গত। শীত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিক অগ্নির তাপ দেওয়াও অনুচিত। মাতার শরীর ও বেশ উষ্ণ থাকা প্রয়োজন; সেই উষ্ণতাও শিশুকে যথেষ্ট রক্ষা করিয়া থাকে। আবশ্যক মত ঘরটি গরম রাখার নিমিত্ত যে অগ্নিরক্ষা করা হয় সেই ধূমহীন কয়লায় কাপড় গরম করিয়া সময় ২ তাপ দেওয়াও দোষের নহে, কিন্তু অধিক তাপ লাগাইলে বালকের কঠিন ২ রোগ হওয়ার ভয় থাকে। সময় সময় তাহাতে জীবনের প্রতিও সংশয় হয়। ইহাতে স্বাভাবিক শীতোষ্ণ সহনক্ষমতা ও হ্রাস হইয়া যায়। প্রতিশ্যায়াদি রোগ সর্ব্বদার জন্যই যেন লাগিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ বিচার করিয়া থাকেন যে, অগ্নির তাপ কম দেওয়াতেই এসকল ঘটিয়া থাকে, ফলতঃ অধিক তাপ দেওয়ার জন্যই শিশু এরূপ কষ্টভোগ করিয়া থাকে।

অনুভূত প্রয়োগ।

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(সুধানিধি হইতে উদ্ধৃত)।

১। সংগ্রহণী রোগে—একসের ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ লইয়া তন্মধ্যে একটি লেবুর সম্পূর্ণ রস বস্ত্রপূত করিয়া দিয়া উহা রোগীকে পান করিতে দিবে। যদি রোগীর দাস্ত অতি জোরের সহিত ও অত্যধিক পরিমাণে হয়, তবে উক্ত ঔষধের মধ্যে কিছু পরিষ্কৃত চিনী মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। আর রোগী যদি ধারোষ্ণ দুগ্ধ হজম করণের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে কাঁচা দুধেরই মাখন উঠাইয়া ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিবে। তিনদিন এই ঔষধ সেবন করিবে; পথ্য—দধি ভাত। অবশ্য রোগ আরোগ্য হইবে।

বদ্‌হজমী—একটি পাকা দাড়িম সংগ্রহ করিয়া উহা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ১ তোলা ভাঙ্গ এবং ৬ মাষা আফিম্ ভরিয়া পরে আটাদ্বারা দাড়িমটি বেশ করিয়া লেপিয়া আগুণে পোড়া দিবে, যখন আটা পুড়িয়া অঙ্গারবৎ হইবে তখন উঠাইয়া আটার আবরণ ফেলিয়া দাড়িমটি উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ চণকপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটী করিয়া বটী বাসী জলের সহিত সেবন করিবে। যদি দাহ হয় তবে দধি ভাত অথবা চাউল ধোওয়া জল খাইতে দিবে। (২) সোহাগার খই ৩ মাষা একত্র জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এক বটী প্রাতে ও একবটী সন্ধ্যাকালে সেবন করিবে, নিশ্চয় উপকার হইবে।

জ্বরাশান্তির নিমিত্ত জপ—

"কুবেরং তে মুখং রৌদ্রং নন্দিনং নন্দিমাবহ।
জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে জ্বরম্ ॥"

২। পণ্ডিত নবনীত মিশ্র বৈদ্য—পাটনা।

রোগ নিবারণার্থ—দারিমের রসের সহিত স্বর্ণ মালিনী বসন্ত এক রত্তি মাত্রায় দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। (২) প্লেগের গ্রন্থির জন্য এক তোলা অশ্বগন্ধা এবং ২টি কুচিলা বীজ পেষণ করিয়া উষ্ণ করতঃ ঈষদুষ্ণ

অবস্থায় গ্রন্থির উপর প্রলেপ লাগাইবে। প্রলেপ কেবল দিবাতে দিতে হইবে।

৩। প্রয়াগ দত্ত রাঙ্কু বৈদ্য—সোহাবল।

অতিসারে—সালৈ (সাল ?) বৃক্ষের ছাল একতোলা, একছটাক মেষ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সকালে, বিকালে পান করিলে দারুণ অতিসারের দাস্তও বন্ধ হয়।

৪। পণ্ডিত শ্রীনিবাসাচার্য্য শাস্ত্রী, দারাগঞ্জ প্রয়াগ। শূলতথা সমস্ত উদরবিকারে—করঞ্জবীজ দুই তোলা, হিঙ্গু ৩ মাষা, কালা লবণ দুই তোলা, জীরা এক তোলা, যৈন ১ তোলা শুণ্ঠি অর্দ্ধ তোলা, পিপুল ৩ মাষা, হরিতকী ১ তোলা, লবঙ্গ ৩ মাষা এবং পুদিনা ১ তোলা সমুদয় পেষণ করিয়া ঘৃত দ্বারা এক মাষা ওজনে বটী প্রস্তুত করিবে। গরম জলের সহিত সেবন করিলে শূল এবং সকল প্রকার উদর বিকার নষ্ট হইবে।

৫। পণ্ডিত চন্দ্রশেখর দ্বিবেদী মহোপদেশক। রিবারী।

আম শূল এবং আমাতিসারে—হরিতকী ২ তোলা, যৈন ১ তোলা, মৌরী ১ তোলা, শুণ্ঠী আধা তোলা, সর্জ্জীক্ষার, যবক্ষার, সৈন্ধব, কালা লবণ এবং সোরা তিন তিন মাষা করিয়া, সমুদয় একত্র পেষণ করিয়া ৩ মাষা মাত্রায় জল সহ প্রয়োগ করিবে।

৬। বৈদ্য--গঙ্গাদান শর্ম্মা, ধনৌরা, মুরাদাবাদ।

বমন বারণার্থ—এলাচি অবলেহ—(আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থোক্ত প্রসিদ্ধ ঔষধ)

"এলা লবঙ্গ গজকেশর কোল মজ্জা,
লাজপ্রিয়ঙ্গু ঘন চন্দন পিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিক সিতা সহিতানি লীঢ়্বা
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুত পিত্তজানাম্॥"

অর্থাৎ ছোট এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের মজ্জা, খই, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেত চন্দন এবং পিপুল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সমুদয় চূর্ণের সমান মিশ্রি মিলিত করিয়া তাহার ১ মাষা চূর্ণ ৩ মাষা মধুর সহিত মিলিত করিয়া চাটনী দিবে, এই প্রকার আধা আধা ঘণ্টা পর পর লেহন করিয়া

খাইতে দিবে। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে বমন বন্ধ হইবে এবং তৃষ্ণা দূর করিবে।

৭। শ্রীযুক্ত জগমোহন রাম বৈদ্য, চাইবাসা। (১) প্লীহারোগে—শুণ্ঠী, গোলমরিচ, পিপূল ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকের কাপড় ছাকা চূর্ণ ঘৃত কুমারীররসে মিলিত করিবে, ইহা প্রতিদিন গব্য ঘৃতের সঙ্গে সেবন করিলে গুল্মও প্লীহা শীঘ্রই নষ্ট হইবে। (২) ষড়্বিধ অতিসার রোগে—ভৃঙ্গরাজ রস আড়াই তোলা সাতদিন পর্য্যন্ত গোদুগ্ধের দধির সহিত সেবন করিবে ইহাতে সকল প্রকার অতিসার দূর হইবে। (৩) অর্শোরোগে—হুড়হুড়ে (শুলটিয়া) পঞ্চাঙ্গ (মূল পত্র, শাখাদি) ২ তোলা এবং গোলমরিচ একমাষা অর্দ্ধ পোয়া জলের সঙ্গে পেষণ করিয়া পাক করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়।

৮। পণ্ডিত গিরিজশঙ্কর বৈদ্য, দারাগঞ্জ প্রয়াগ।

শিশুদের কাসের জন্য—

"যবক্ষার বিষাশৃঙ্গী মাগধী পৌষ্করোদ্ভবম্।
চূর্ণিতো মধুনা লীঢ়্বা পঞ্চকাসান্ জয়েৎ শিশুঃ॥"

অর্থাৎ যবক্ষার, আতীস, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপূল ও পুষ্কর মূল এই সমুদয়ের চূর্ণ মধুর সহিত চাট্‌নী দিলে বালকের পাঁচ প্রকার কাস আরোগ্য হইবে।

(হিন্দীর অনুবাদ)

"সংক্ষিপ্ত-মুক্তাবলী।"

(অর্থাৎ)

পর্য্যায় শব্দ ভেদ সূচিতায়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ ভেদাঃ।

কর্পূরকং হিম হিমাংশু-পদদ্বয়েন বালাং শিরোরুহপদেন তথা জলেন।
পদ্মেন পদ্মকমথো নিশয়া হরিদ্রাং পত্রং দলেন কলয়ন্তি শুভেন জীবাম্॥ ১

অর্থাৎ—হিম ও চন্দ্র বাচক শব্দ কর্পূরের সূচক, কেশ ও জল বাচক শব্দে বালাকে বুঝায়। পদ্মপর্য্যায়ক শব্দ পদ্মকাষ্ঠের বাচক। নিশা (রাত্রি) বাচক শব্দ হরিদ্রার অববোধ করাইয়া থাকে। তেজপত্র

বুঝাইবার জন্য পত্র (পর্ণ) বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং মঙ্গলবাচক শব্দ জীবন্তীকে বুঝাইয়া থাকে ॥

স্বর্ণেন কেশর সুচম্পক হেম ধূর্ত্তান্ সর্পেণ সীসকমথো অমৃতং বিষেণ।
সূর্য্যেণ চাহুরথ তাম্রকমর্কপর্ণং শৃঙ্গীং তু কর্কটপদেন গদেন কুষ্ঠম্ ॥ ২

অর্থাৎ—স্বর্ণ শব্দের পর্য্যায় দ্বারা নাগেশ্বর, সোনা চাঁপা, সুবর্ণধাতু, ও ধুতুরা পুষ্প বুঝাইয়া থাকে। সর্প শব্দের পর্য্যায় সীসক ধাতুর অববোধক। মিঠা বিষ বুঝাইবার জন্য অমৃত শব্দের পর্য্যায় ব্যবহৃত হয়। সূর্য্যপর্য্যায়ক শব্দ তাম্রধাতু ও আকন্দকে বুঝায়। কর্কটবাচক শব্দ শৃঙ্গী (কাকড়া শৃঙ্গী) ও রোগ বাচক শব্দ কুষ্ঠ (কুড়) কে বুঝাইয়া থাকে ॥

রুদ্রেণ পারদমথাঙ্গনয়া প্রিয়ঙ্গুং রক্তেন কুঙ্কুমমনেনচহিঙ্গুলংচ।
অভ্রেণ চাভ্রকমথাম্বুধরেণ মুস্তম্ ইন্দ্রেণ কুত্রচিদপীন্দ্রযবং বদন্তি ॥ ৩

অর্থাৎ—রুদ্রবাচক শব্দে পারদকে বুঝায়। অঙ্গনা (কামিনী) বাচক শব্দ প্রিয়ঙ্গুর অববোধক। কুঙ্কুম ও হিঙ্গুল বুঝাইবার জন্য রক্ত বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। অভ্রধাতু অভ্রবাচক শব্দের দ্বারা বোধিত হয়। মুস্তক (মুথো) বুঝাইতে মেঘবাচক শব্দ ব্যবহার্য্য। ইন্দ্র শব্দের পর্য্যায় দ্বারা কোথাও কোথাও ইন্দ্রযবকে বুঝায় ॥

স্যাৎ পর্পটোঽথ কবচেন চ পাংশুনোক্ত শ্চিত্রং বিহ্ন র্হুতভুজার্জ্জুনমর্জ্জুনেন।
শব্দেন শিহ্লকমথ কপিবাচিনাহুরেবং বিনীত ভিষজোঽপরমুন্নয়ন্তি ॥ ৪

অর্থাৎ—কবচ ও পাংশুবাচক শব্দ পর্পটকে বুঝায়। অগ্নিবাচক শব্দ চিতার এবং অর্জ্জুনবাচক শব্দ অর্জ্জুনবৃক্ষের সূচক। কপি (বানর) বাচক শব্দ দ্বারা শিলারস বুঝাইয়া থাকে। শিক্ষিত বৈদ্যগণ এইরূপ অন্যান্য ও বুঝিয়া লইবেন ॥ (ক্রমশঃ)

কৃতিরেষা বাঁকুড়ান্তর্বর্ত্তি - বিষ্ণুপুরবাস্তব্যবৈদ্য—

শ্রীভোলানাথ দাশ গুপ্তস্য।

নিখিল ভারতবর্ষীয় ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলন ও প্রদর্শনী—

আগামী ৯ই ১০ই ১১ ও ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা মহানগরীতে নিখিল-ভারতবর্ষীয় বৈদ্য সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইবে। ইহার সংস্পৃষ্ট

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী ২রা জানুয়ারী আরম্ভ হইবে এবং ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। যাঁহারা প্রদর্শনীতে ভেষজাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে পাঠাইবেন।

প্রদর্শনীতে প্রেরণের দ্রব্যাদি—

১। কাঁচা বা শুষ্ক আয়ুর্ব্বেদীয় গাছগাছড়া ও ফল মূল প্রভৃতি। ২। উত্তম রাসায়নিক সিদ্ধ ঔষধ এবং পার্থিব ভেষজ (যথা—কঙ্কুষ্ঠ, খর্পর ইত্যাদি)। ৩। জান্তব ভেষজ (যথা—কস্তূরী, গোরোচনা ইত্যাদি)। ৪। প্রাচীন ও নূতন যন্ত্র শস্ত্রাদি। ৫। শারীর অস্থিপঞ্জরাদি ও তাহার চিত্রাদি। ৬। মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যক গ্রন্থ। ৭। অনুভূত প্রয়োগ অনুযায়ী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি। দ্রব্যাদি আগামী ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২১ (১০ই ডিসেম্বর ১৯১৪) তারিখের মধ্যে পৌছান আবশ্যক।

বৈদ্যসম্মেলনের সভাপতি—জয়পুরের মহারাজার কলেজের প্রধান আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীরামস্বামী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বৈদ্যরত্ন মহাশয় ষষ্ঠ বৈদ্য সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ স্বামীজী আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের উপসভাপতিত্ব করিয়া আসিতে ছিলেন।

ষষ্ঠ-বৈদ্যসম্মেলনে

পাঠিতব্য প্রবন্ধের বিষয়।

আগামী বৈদ্য-সম্মেলনের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিকতত্ত্ব। (সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকে কলিকাতানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুপ্ত চৌধুরী কবিভূষণ একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন। ২। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ। ৩। আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ সমূহের নব্য প্রাণালীতে গুণ পরীক্ষা। (Pharmacology). ৪। নবাবিষ্কৃত দেশীয় ভেষজ (যথা—চোট চাঁদড়) ও তাহার প্রয়োগ। ৫। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শল্য-চিকিৎসা। (এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে কলিকাতানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একটী সুবর্ণপদক প্রদানকরিবেন)। ৬। আয়ুর্ব্বেদমতে

শস্ত্রোপচার ব্যতিরেকে ক্ষতাদি চিকিৎসা। (এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে কলিকাতানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন)। ৭। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও নব্যমতানুযায়ী বিষচিকিৎসা। ৮। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগ বীজাণু-তত্ত্ব। ৯। আয়ুর্ব্বেদোক্ত পঞ্চ কর্ম্ম প্রয়োগের বিশেষ আবশ্যকতা। (এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে কলিকাতা নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন)। ১০। যে কোন দুরারোগ্য রোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা। (বৃদ্ধিরোগ সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে এলাহাবাদনিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত জগন্নাথপ্রসাদ শুক্ল মহাশয় একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন)। ১১। আয়ুর্ব্বেদোক্ত দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়। ১২। ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা (এই সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে 'জন্মভূমি' সম্পাদক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন)। ১৩। ফিরঙ্গ রোগ (Syphilis), বিষ-মেহ (Gonorrhaea) প্লেগ' ডেঙ্গু, বেরীবেরী প্রভৃতি নবোদ্ভূত রোগ সমূহের আয়ুর্ব্বেদ মতে নিদান ও চিকিৎসা। ১৪। রোগ বিজ্ঞানের নূতন প্রণালী। ১৫। আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের উপায় নির্ণয়। (এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে পুনাপুর-গয়ানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয় একটী সুবর্ণপদক প্রদান করিবেন)। ১৬। আয়ুর্ব্বেদীয় দার্শনিক-তত্ত্ব। ১৭। সদ্যো ব্রণচিকিৎসা। ১৮। স্বাস্থ্য-তত্ত্ব। ১৯। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সমূহ অধিকতর সুলভ করিবার উপায় নির্ণয়। ২০। শারীর জ্ঞানের আবশ্যকতা (এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে কলিকাতানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন কবিভূষণ মহাশয় একটী সুবর্ণপদক প্রদান করিবেন)। ২১। প্রসূতি, স্ত্রী ও বালরোগ চিকিৎসা। ২২। চিকিৎসিত কঠিন রোগের ইতিহাস ও চিকিৎসা-বর্ণন।—(সম্ভব হইলে রোগী প্রদর্শনসহ)। ২৩। ত্রিদোষতত্ত্ব অর্থাৎ বাত-পিত্ত কফতত্ত্ব ও চিকিৎসাক্ষেত্রে উহার উপযোগিতা (এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে কলিকাতানিবাসী বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুত যোগীন্দ্র নাথ সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী সুবর্ণপদক প্রদান করিবেন।) ২৪। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অন্য কোন বিশেষ উপযোগী প্রবন্ধ। অভ্যর্থনা-সমিতি কার্য্যালয়।—৪১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা। ২৫এ নবেম্বর, ১৯১৪। অভ্যর্থনা সমিতির অনুমত্যনুসারে শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা, শ্রীভূরালাল মিশ্র, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন,

সম্পাদকগণ।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

(প্রেরিত)

আয়ুর্ব্বেদজলধি অনন্ত রত্নের আকর। যদি আমরা এই জলধি-জলে সম্যক্ নিমজ্জিত হইয়া ইহার গভীরতম তল দেশে গমন করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে অসংখ্য মহামূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে পারিতাম। কিন্তু মূর্খ আমরা, জ্ঞানান্ধ আমরা, তৎসম্বন্ধে কিছু মাত্র যত্ন না করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায়, দীনহীন বেশে, যৎসামান্য মুষ্টি ভিক্ষার জন্য অনুক্ষণ পরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছি। রাজরাজেশ্বরের বংশধর হইয়া পথের কাঙ্গাল সাজিয়াছি। কি ঘৃণার কথা! কি পরিতাপের বিষয়! বিদেশীয় চিকিৎসকগণ আমাদের আয়ুর্ব্বেদরত্নাকর হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া সহস্র গুণে তাহার উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি করিয়া জগতের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন, আর জগৎ সেই রত্ননিকরের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছে। পক্ষান্তরে আমরা ভারতবাসী, ভারতবক্ষ প্রসারিত,—আমাদেরই প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্র-সৈকতে উপবেশন করিয়া, কেবল বালুকা সঞ্চয়নে নিযুক্ত রহিয়াছি। এতদপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে? ভারতবাসী ভ্রাতৃগণ! তোমরা এখনও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কর, এখনও কণ্টকাকীর্ণ কুপথ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ পিতামহ প্রদর্শিত প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন কর, এখনও আয়ুর্ব্বেদ জলধি-নিহিত রত্নরাজি উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সংস্কার কর; অনন্তর সেই সুসংস্কৃত রত্নসমুদয়কে লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তী করিয়া জগতে ঋষিমাহাত্ম্য প্রচার কর। সমগ্র জগৎ সেই অপূর্ব্ব রত্নরাজির স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাস্বরমূর্ত্তি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিয়া, ভক্তি-বিগলিত-হৃদয়ে শত সহস্রবার ঋষিচরণের উদ্দেশে প্রণত হউক। তখন দেখিবে আবার তোমাদের সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে, আবার ভারতবক্ষ হইতে রোগ, শোক ও

অকাল মৃত্যু সুদূরে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু হায়, কতদিন সেই মঙ্গলময় দিনের আবির্ভাব হইবে, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই তাহা বলিতে পারেন।

আমরা ঋষি উপদিষ্ট কতিপয় দৃষ্টফল অমৃতোপম মুষ্টিযোগের গুণ বর্ণনার জন্য অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের যোগবল-লব্ধ মুষ্টিযোগসমূহের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইবেন। পাঠকগণ এই মুষ্টিযোগগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কৃতার্থ হইব এবং শ্রম সফল বোধ করিব। পরীক্ষা করিলে নিজেরাও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। কেননা সামান্য রোগের জন্য তাঁহাদিগকে ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের মূল্য বাবদ রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে হইবেনা। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কম সুবিধার কথা নহে।

অদ্য আমরা যে মুষ্টিযোগের কথা বলিব, সে যোগের নাম—

আঙ্গুল হাড়া।

এই রোগটী যদিও সামান্য, কিন্তু ইহার যন্ত্রণা বড় সামান্য নহে। ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই রোগের প্রারম্ভে একটী অঙ্গুলিতে অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হয়। অনন্তর অঙ্গুলিটী ফুলিয়া তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা (দাহ), ও টন্‌টনানি উপস্থিত হয়। রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে। জ্বালা এমন অসহ্য হয় যে, রোগী বারম্বার পীড়িত অঙ্গুলিটী শীতল জলে ডুবাইয়া রাখে। কিন্তু তাহাতেও সোয়াস্তি লাভ করেনা। অবশেষে অঙ্গুলি পাকিয়া ঘা হয় এবং রোগী অনেক দিন কষ্ট পায়। এই রোগে সচরাচর একটী মাত্র অঙ্গুলিই আক্রান্ত হয়। কিন্তু কখন কখন কাহারও দুই হাতেরই প্রায় সমস্ত অঙ্গুলিগুলিই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে, আরোগ্য লাভের পরও পীড়িত অঙ্গুলিটী তাহার স্বাভাবিক পূর্ব্ব শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হয় না; চিরদিনের মত বিকৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ক্ষুদ্র রোগাধিকারে এই রোগ চিপ্প ও অঙ্গুলিবেষ্টক নামে অভিহিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু ও পিত্ত নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট এই রোগ উৎপাদন করে। ইহার

চলিত বাঙ্গালা নাম আঙ্গুলহাড়া। রঙ্গপুর জেলায় এই রোগকে "নখজ্বরা" বলে। এই রোগের একটী সহজ সাধ্য পরীক্ষিত ঋষি প্রোক্ত আশ্চর্য্য মুষ্টিযোগ নিম্নে লিখিত হইল।

গাম্ভারী বা গামার নামে পরিচিত বৃক্ষ সম্ভবতঃ অনেকেই চিনেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার পিটুলি, পিঠেপোড়া ভুর্কণ্ডী বা ভেল্লী নামক বৃক্ষকেই গাম্ভারী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই ভুল। যাঁহারা গামার গাছ চিনেন না, তাঁহারা কোনও বিশ্বস্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের কাছে চিনিয়া লইবেন। ছাপরা প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের কাছেও চিনিয়া লইতে পারেন। সে দেশের লোকে ইহাকে গাম্ভার বলে এবং প্রায় সকলেই চিনে। তাহারা এই বৃক্ষের কাষ্ঠে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে।

গাম্ভারী বৃক্ষের সাতটী কোমল (কচি) পত্র সংগ্রহ করিয়া একটীর উপর একটী, তার উপর আর একটী এইরূপে সমুদায় পত্রগুলি একত্র সাজাইবে। সেই উপর্য্যুপরি সজ্জিত পত্র সমূহ দ্বারা পীড়িত অঙ্গুলিটী উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া (যেন কোন দিকে ফাঁক না থাকে) এক গাছি সূতা বা পাটের আঁশ দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। বন্ধন যেন অত্যন্ত দৃঢ় না হয় এবং খুব শিথিলও না হয়। বন্ধন দৃঢ় হইলে অত্যন্ত টন্‌টনানি উপস্থিত হয় এবং শিথিল হইলে খসিয়া পড়িতে পারে। অতএব মাঝামাঝি রূপে বাঁধিবে। যে দিন বাঁধিবে, সে দিন আর খুলিবে না; পরদিন খুলিয়া, যদি ক্ষত প্রকাশ হওয়ার পর এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তবে ক্ষত স্থান পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া, পুনর্ব্বার উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত সাতটী নূতন গাম্ভারী পত্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ বাঁধিয়া রাখিবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহই এইরূপ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় এক দিনেই জ্বালা যন্ত্রণার অনেক হ্রাস হয়। ৫। ৭ দিনে রোগ নিঃশেষে আরোগ্য হয়। আঙ্গুলহাড়া রোগের প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, আর পাকেনা বা ঘা হয় না। পচ্যমানাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শীঘ্র পাকিয়া ফাটিয়া যায়। ক্ষত প্রকাশ হওয়ার

পর ব্যবহার করিলে, অচিরেই ক্ষত দোষ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয় এবং শুকাইয়া যায়। আশা করি, এই মুষ্টিযোগটী সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। গৃহপ্রাঙ্গণে স্থিত একটী অনায়াসলভ্য সামান্য বৃক্ষ পত্রের কিরূপ অসামান্য গুণ,—তদ্দারা কিরূপ সহজ উপায়ে বিনাব্যয়ে আঙ্গুলহাড়া রোগের উৎকট যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। ক্রমশঃ নানারোগের এইরূপ সহজ সাধ্য আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিবার ইচ্ছা রহিল।

পোঃ নাওডাঙ্গা
গ্রাম গঞ্জেরকুটী
(রঙ্গপুর) } শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

নিখিল-ভারতবর্ষীয় ষষ্ঠ বৈদ্য-সম্মেলন

ও

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী—কলিকাতা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রথম বৈদ্যসম্মেলন।—স্থান—নাসিক। সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত সরযূপ্রসাদ সিংহ, রঈস্, বরাঁও। এই সম্মেলন পুণার আয়ুর্ব্বেদ মহোপাধ্যায় স্বর্গীয় শঙ্করদাজী শাস্ত্রীপদে মহাশয়ের যত্নে আহূত হয় এবং ইহাতে বম্বে এবং যুক্তপ্রদেশের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসকগণের পরস্পর পরিচয় ও সৌহৃদ্যবর্দ্ধন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে পরীক্ষা গ্রহণের বিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্য ইহাতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বৈদ্যসম্মেলন।—স্থান—পণবেল (নাগপুর)। সভাপতি—জয়পুর মহারাজের চিকিৎসকপ্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী। এই সম্মেলনে নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় ১৫০ হইয়াছিল। ইহাতে পূর্ব্ববৎ কার্য্য ও কয়েক জন উপযুক্ত চিকিৎসককে উপাধি প্রদান করা প্রভৃতি হইয়াছিল।

তৃতীয় বৈদ্যসম্মেলন— স্থান — প্রয়াগ। সভাপতি — কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বৈদ্যাবতংস কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ এম্‌-এ, এল্‌-এম্‌-এস্‌। এই সম্মেলন মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে সুদূর কাশ্মীর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি নানা প্রদেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের সংখ্যা মোট প্রায় ৩০০ শত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে ভারতের প্রাদেশিক বিভাগ অনুসারে ১০১ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া "আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল" নামে স্থায়ি-সমিতি গঠিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ অন্যান্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সংগৃহীত চাঁদার সাহায্যে, সেই বৎসর প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সমাগত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছিল। উহাতে সহস্র সহস্র রোগীকে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়।

চতুর্থ বৈদ্যসম্মেলন ও আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী।— স্থান—কানপুর। সভাপতি—কলিকাতার বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম-এ। এই সম্মেলনও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে পূর্ব্ববৎ ভারতের নানা প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ৩০০ শতের অধিক হইয়াছিল। এই সম্মেলনে "নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাপীঠ" নামে আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষার ও পরীক্ষার জন্য একটী শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হয় এবং বম্বে প্রদেশের মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশন বিলের প্রতিবাদ করিয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরিত হয়। অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। এই সম্মেলনের সহিত কতকগুলি হস্তলিখিত দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ও ভেষজ লইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনীর প্রথম অনুষ্ঠান হয়।

পঞ্চম বৈদ্যসম্মেলন ও বিরাট আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী।—স্থান—মথুরা। সভাপতি—আয়ুর্ব্বেদের পরমহিতৈষী এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ ও দ্রব্যগুণ-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল কান্‌হোবা রণছোড়দাস কীর্ত্তিকর, আই-এম-এস, এফ-এল-এস।

এই সম্মেলনে পূর্ব্বের ন্যায় ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের অতিরিক্ত, সুদূর বেলুচিস্থান, লঙ্কাদ্বীপ, শ্যামদেশ প্রভৃতি স্থান হইতেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। প্রতিনিধির সংখ্যা মোট প্রায় ৪০০ চারিশত হইয়াছিল। এই সম্মেলনের সহিত "আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের" পরীক্ষাও গৃহীত হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২২। এই সম্মেলনেও মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশন বিলের প্রতিবাদ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপযোগিতার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমস্ত ভারতবর্ষে পাঠ্য বিষয়ের প্রাধান্যানুসারে আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষাক্রমের নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনীর বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। উহাতে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে সংগৃহীত ৬০০ শতেরও অধিক কাঁচা ভেষজ দ্রব্য এবং প্রায় সহস্রাধিক শুষ্ক ভেষজ, পার্থিব ও জান্তব ঔষধ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনে দিল্লী ও কলিকাতা হইতে আনীত শারীর আদর্শ (মডেল), নরকঙ্কাল, চিত্র প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন ও নবীন যন্ত্রশস্ত্রসমূহ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত প্রদর্শিত হয়। এই সম্মেলনেই "ভেল সংহিতা" প্রভৃতি দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদীয় পুঁথি "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা"—সম্পাদক বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবজী ত্রিকমজী প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে স্থানীয় রাজপুরুগণ বিশেষরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে এই সম্মেলনের স্থায়ি-সমিতি "আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের" প্রধান কার্য্যালয় গত ১৩১৮ সাল হইতে প্রয়াগে স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার শাখাসমিতি সমুহ ভারতের সকল প্রদেশেই আছে। আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল ও তাহার শাখাসমিতি-সমূহের যত্নে বহুস্থলেই আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও মাসিকপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে যে সকল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় আছে তাহাদেরও বৈদ্যসম্মেলন ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বা হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ-মহামণ্ডলও বিরাট্ আয়তনে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে।

নিখিল-ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী, কলিকাতা।

সন ১৩২১ সাল।

নিয়মাবলী।

১। এই প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত বিভাগানুসারে দ্রব্যাদি রক্ষিত হইবে।—(১) পুস্তক বিভাগ, (২) শারীর বিভাগ; (৩) বনস্পতি বিভাগ; (৪) রসৌষধ বিভাগ; (৫) যন্ত্র শস্ত্র বিভাগ; (৬) জান্তব ভেষজ বিভাগ; (৭) স্বকল্পিত অনুভূত ঔষধ বিভাগ।

২। এই প্রদর্শনীর সমস্ত কার্য্যের মীমাংসা একটী ব্যবস্থাসমিতি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৩। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সমস্ত দ্রব্যের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের ভার উক্ত ব্যবস্থা-সমিতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৪। যিনি প্রদর্শনার্থ দ্রব্য প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে ঐ সমস্ত দ্রব্যের জন্য প্রদর্শনীর পক্ষ হইতে উপযুক্ত রসিদ দেওয়া যাইবে এবং প্রদর্শনী সমাপ্ত হইলে বহুমূল্য ও দুর্ল্লভ বস্তু সমূহ উপযুক্ত রসিদ লইয়া প্রেরককে ফেরত দেওয়া যাইবে; কিন্তু সাধারণ স্বল্প মূল্য দ্রব্য এবং কাঁচা গাছ গাছড়া ফেরত দেওয়া যাইবে না।

৫। যে যে আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মহাত্মা প্রদর্শনীতে কোন দ্রব্য প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দ্রব্যের একটী তালিকা যথাসম্ভব সত্বর প্রদর্শনীর অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। তন্মধ্যে যে যে দ্রব্য আবশ্যক, অধ্যক্ষ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পত্র লিখিলে প্রেরক সেই সেই দ্রব্য পাঠাইবেন। উক্ত দ্রব সমূহ প্রেরণের ব্যয় প্রদর্শনী-সমিতি বহন করিবেন। যদি কোন মহাত্মা স্বয়ং ঐ ব্যয় ভার বহন করেন, প্রদর্শনী-সমিতি তাহা আগ্রহ ও ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিবেন।

৬। প্রদর্শনী কার্য্যালয়ে প্রেরিত দ্রব্য সকল যে অবস্থায় পৌঁছিবে প্রদর্শনী সমিতি দ্রব্যসমূহ সেই ভাবেই রক্ষা করিবার দায়িত্ব যথাসাধ্য গ্রহণ করিবেন।

৭। প্রেরক প্রদর্শনীতে প্রেরিত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে সেই দ্রব্যের উপর তাহার মূল্য লিখিয়া দিবেন। বিক্রয় হইলে মূল্য পাঠইয়া দেওয়া যাইবে।

৮। দুষ্প্রাপ্য কাঁচা বা শুষ্ক গাছ গাছড়া বা অন্য দ্রব্যের সহিত

তাহার ভাষানাম, সংস্কৃতনাম, প্রাপ্তিস্থান এবং সামান্য উপযোগ লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে কেবলমাত্র ভাষানাম লিখিয়া দিলেই চলিবে।

৯। যদি কেহ প্রদর্শনীর অধ্যক্ষের নির্দ্দেশের অতিরিক্ত কোন দ্রব্য প্রদর্শনীতে রাখিবার জন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের মূল্যের উপর প্রতি টাকায় /০ এক আনা রক্ষণ-ব্যয় দিতে হইবে এবং তাহা প্রদর্শনীতে বিক্রয় করিলে শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকা কমিশন দিতে হইবে। ঐরূপ স্থলে প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবার সমস্ত ব্যয় ও বন্দোবস্ত প্রেরক করিবেন।

১০। পথে বা প্রদর্শনীতে কোন দৈবদুর্ঘটনার জন্য কোন দ্রব্যের ক্ষতি হইলে তজ্জন্য প্রদর্শনী-সমিতি দায়ী হইবেন না।

১১। প্রদর্শনীতে অথবা প্রদর্শনী-সমিতি দ্বারা যাঁহারা স্বীয় বিজ্ঞাপনাদি বিতরণের বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে প্রতি হাজার বিজ্ঞাপনের জন্য ২৲ দুই টাকা ব্যয় দিতে হইবে।

১২। যিনি প্রদর্শনীর কার্য্য বিবরণীতে স্বীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা এবং অর্দ্ধ পৃষ্ঠার জন্য ৩৲ টাকা ব্যয় দিতে হইবে। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না; ইহার অধিক বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রদর্শনীর অধ্যক্ষের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১৩। প্রদর্শনীতে ঔষধাদির প্রেরণ, বিক্রয়ের জন্য স্থানের বন্দোবস্ত এবং কার্য্য বিবরণীতে বিজ্ঞাপন ছাপাইবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য আগামী ১০ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে করিতে হইবে।

১৪। যাঁহারা পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পদক বা প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইবে।

১৫। প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ এবং পত্র ব্যবহারাদি "অধ্যক্ষ, অয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী, ১৮।১ লোয়ারচিৎপুর রোড, কলিকাতা" এই ঠিকানায় করিতে হইবে। বিস্ফোরক কোন দ্রব্য প্রদর্শনীতে রাখা হইবে না।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন। কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি এবং দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আপাতত পত্রিকার কলেবর কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এজন্য ক্ষমা করিবেন। সুযোগ উপস্থিত হইলেই পুনঃ বৰ্দ্ধিতাকারে বাহির হইবে।

ভ্রম সংশোধন। ১৮৪ পৃষ্ঠার পর ও ২০০ পৃষ্ঠার মধ্যের পত্রাঙ্কে মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে; তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা সপ্ত বৈদ্যসম্মেলনের সভাপতি

আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীরাম স্বামী বৈদ্যরত্ন

শশি প্রেস, ঢাকা।

"প্রাণো বা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ। বাগ্‌ভট।

২য় বর্ষ { পৌষ ও মাঘ ১৩২১ } ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

স্বাগত। *

আজি শুভদিনে বঙ্গগগনে একি অপরূপ অরুণ ভায়,
মুখরিত আজি আকাশ বাতাস দিগঙ্গনা গীতি গায়।
বিবিধ-বাহন দেব অগণন সপ্তস্বরগে পাতিয়া কান,
মন্ত্রমুগ্ধ শুনিছে সকলে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা গান॥

(কোরাস)—এস গো মারাঠী এস মান্দ্রাজী পঞ্চনদের সুসন্তান,
শ্যাম উৎকল এস সিংহল কাশ্মীর গাহ মিলন গান,
এস গো মারাঠী এস মান্দ্রাজী।

---

* কলিকাতা ষষ্ঠ বৈদ্য সম্মেলনে গীত।

এস গো মারাঠী এস মান্দ্রাজী ব্রহ্ম পঞ্চনদ ভূটান,
এস সিংহল এস গো নেপাল কাশ্মীর ভূমে দিব্যস্থান।
এস গান্ধার এস গো বিহার যুক্ত মধ্য প্রদেশচয়,
এস রাজপুত, তুমি বীরসুত, গাহগো আয়ুর্ব্বেদের জয় ॥
(কোরাস)—এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

যেই ভূমে আজ কর বিচরণ এ নহে এ নহে তুচ্ছ দেশ,
উদিল হেথায় শ্রীমাধবকর কীর্ত্তি যাঁহার জলধিশেষ।
চক্রপাণির লীলানিকেতন শিবদাসসেন-জনমালয়,
স্বাগত হেথা এই সে বঙ্গ গৌরব যার বিশ্বময় ॥
(কোরাস)—এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

বৈয়াকরণ বোপদেব হেথা উজলে আয়ুর্ব্বেদের মান,
শ্রীকণ্ঠের স্বদেশ, অরুণ, বিজয়ের এই জনমস্থান।
সীতারাম-সভা-শিরোশোভা হেথা অভিরাম কবির ... নাম,
স্বাগত হেথা এই সে বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুণ্যধাম ॥
(কোরাস)—এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

গুরু শঙ্কর, শিষ্য গোপাল, রসতন্ত্রের ঘোষিল জয়,
বৈদ্যক বাণী লভিলা চেতন গঙ্গাধরের বন্দনায়।
রামমোহনের 'সারসংগ্রহ' জীবনীমন্ত্রে বাচিল প্রাণ,
স্বাগত হেথা এই সে বঙ্গ বৈদ্য-বিদ্যা-পীঠস্থান।
(কোরাস)— এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

রামসুন্দর নীলাম্বরে বিদ্যা হেথায় করিলা দান,
রমা, আনন্দ, চন্দ্র, পরেশ, গঙ্গাপ্রসাদ ভারতমান।
দ্বারকানাথের মর্ম্মরছবি আয়ুর্ব্বেদের উচ্চ শির,
স্বাগত হেথা এই সে বঙ্গ পুণ্য যাহার অবনী নীর ॥
(কোরাস) এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

বিজয়রতন, কৈলাস, কালী, গোপী, বিনোদের জনমধাম,
মদন, ভারত, অমৃত, কমল, গয়া, শ্যাম লাভে অমর নাম।
প্যারী, বিশ্ব, পঞ্চাননের, লোকনাথের করমঠাঁই,
স্বাগত হেথা এই সে বঙ্গ তুলনা যে এর জগতে নাই॥
(কোরাস)— এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

ধন্য এ দেশ পুণ্য এ দেশ গৌরব এর দীপ্তিমান,
পবিত্র এর অণু পরমাণু প্রতি ধূলিকণ পুণ্যবান্।
গরিমা-দীপ্ত ললাট ইহার আমরা যে এর কুসন্তান,
হইব ধন্য লভিব পুণ্য করি তোমাদের স্বাগত গান॥
(কোরাস)—এস গো মারাঠী ইত্যাদি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সেন।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

উপক্রমণিকা।

ঔষধ-দ্রব্য-দ্রব্যধর্ম্ম।

ফলান্ত এবং পাকান্ত উদ্ভিদের নাম ওষধি (১)। অর্থাৎ ফল, শস্য বা বীজ জন্মিয়া পাকিয়া গেলে কিম্বা কন্দ পরিণাম প্রাপ্ত হইলে যে সকল উদ্ভিদ্ মরিয়া যায়, অথবা পরিণত হইয়া যাহারা শুকাইয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধি লইয়া যাহা কল্পনা করা যায়, তাহাকে ঔষধ বলা যাইতে পারে। বোধ হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদিম অবস্থায় মাত্র ওষধি প্রয়োগে রোগপ্রতিকারের চেষ্টা করা হইত অথবা দ্রব্য সাধারণকে ওষধি বলিত (২)। সেইজন্য ওষধি পদ লইয়া ঔষধ গঠিত হয়। ঔষধ বলিলে এক্ষণে ওষধিকল্পিত যোগমাত্রকে বুঝায় না, রোগ প্রতিকারার্থ যাহা কিছু দেওয়া যায় বা কিছু করা হয় তাহারই নাম ঔষধ।

(১) ফলপাকনিষ্ঠা ওষধয় ইতি। নিষ্ঠানাশঃ। নিষ্ঠাশব্দঃ প্রত্যেকমপি সম্বধ্যতে তেন ফলনিষ্ঠা পাকনিষ্ঠা ইতি।

(২) দ্রব্যাণিপুনরোষধয়ঃ। সুশ্রুত সংহিতা।

দ্রব্যভূত ও অদ্রব্যভূতভেদে ঔষধ দুই প্রকার। দ্রব্যযোগে যে ঔষধ কল্পিত হয়, তাহার নাম দ্রব্যভূতৌষধ। রুক্‌প্রতিকারার্থ প্রক্রিয়া বিশেষকে অদ্রব্যভূতৌষধ বলে। সংবাহন, উপবাস, প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রবন্ধে অদ্রব্যভূত ঔষধের সহিত কোন সংস্রব রাখা হইবে না। দ্রব্য লইয়া কিরূপে কষায় প্রভৃতি নানাজাতীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়, কল্পিত ঔষধ কোন্ রোগে কি প্রকারে প্রয়োগ করা বিধেয় এবং কোন্ ঔষধে কি ফল ফলে ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অনুপূর্ব্বশঃ বর্ণিত হইবে সংক্ষেপতঃ প্রবন্ধের নাম ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী, রাখা গেল।

দ্রব্য লইয়া ঔষধ কল্পনা করিতে হয়, সুতরাং সকলের আগে দ্রব্যতত্ত্ব জানা আবশ্যক।

দ্রব্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাহাকে আমরা দ্রব্য বলিয়া অনুমান করি, তন্নিষ্ঠ কতকগুলি গুণমাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সেই গুণ-জাতের আধারকে দ্রব্য বলে। সুতরাং দ্রব্যজ্ঞান অনুমান ও প্রমাণ সিদ্ধ। দ্রব্য নিষ্ঠ-রূপরসাদি গুণনিচয় যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তৎসমুদয়কে সংক্ষেপতঃ দ্রব্য-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে দ্রব্য-ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার রস, গুণ, বীর্য্য বিপাক এবং শক্তি। জীবনব্যাপারে দ্রব্য কর্ত্তা, রসাদিকরণ। সুতরাং দ্রব্য কর্ত্তৃক রসাদি করণক আমাদের শরীর ধারণ, পোষণ এবং বেদনা দূরীকরণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। ঔষধার্থ কোনস্থলে ধর্ম্মাদদ্রব্য বিশেষ বা সমবেত কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কুত্রাপি বা দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না, মাত্র দ্রব্য ধর্ম্মের আবশ্যক হয়। সুব্যক্তরস, প্রশস্ত গুণযুক্ত, বীর্য্যবৎ বিশিষ্ট পাকোপযোগী এবং প্রভাবসম্পন্ন দ্রব্য গ্রহণ করা বিহিত। প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য চিনিয়া কোন্ দেশে কিরূপ ক্ষেত্রে কোন্ দ্রব্য ভাল হয় তাহা জানিয়া এবং কোন্ কালে কোন্ দ্রব্য রসবীর্য্যাদি সম্পন্ন হয় তাহা বুঝিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। যথাকালে যথোপযুক্ত ভূমি হইতে সংগৃহীত দ্রব্য হিমবর্ষবাতাতপ হইতে যত্নে রক্ষা করিবে। যেন তাহাদের গন্ধবর্ণাদি গুণ, মধুরাদি রস, অগ্নি সোমীয় বীর্য্য নির্দ্দিষ্ট কাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিগত রস হইলে প্রকৃত গন্ধবর্ণাদি বিকৃত হইলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যের প্রভাব ও বীর্য্য নষ্ট হইয়াছে নষ্টপ্রভাববীর্য্য দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিবে না। যাঁহারা ঔষধের বা

ঔষধার্থ দ্রব্যের ব্যবহার করেন তাঁহাদের এবিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দ্রব্য দ্বিবিধ এক স্থাবর অপর জঙ্গম। কন্দমূল ফল-পুষ্প-ত্বক্-বীজ-কোষ-সার-স্বরস নির্য্যাস প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, সুবর্ণ রজত পারদাদিরূঢ় ধাতু, কাংস্যাদি মিশ্রধাতু, অভ্র, মাক্ষিক, হরিতাল প্রভৃতি উপধাতু, সোরা সোহাগা প্রভৃতি ক্ষারদ্রব্য, সৈন্ধবাদি নানাজাতীয় লবণ এবং অন্যান্য নানা-প্রকার পার্থিব পদার্থ স্থাবর ঔষধ শ্রেণীর অন্তর্গত। অস্থি কোষ মাংস মেদো-মজ্জা-শোণিতাদি শরীরাবয়ব; মুক্তা বিদ্রুম পূতিক কস্তুরিকা প্রভৃতি প্রাণাঙ্গজ পদার্থ এবং দুগ্ধ মূত্র পুরীষাদিকে জঙ্গমৌষধ বলে।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক দ্রব্য নিচয়ের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়, সর্ব্বাদৌ তাহাদিগকে বিশুদ্ধাত্মক করিয়া লওয়া উচিত স্বর্ণাদি-রূঢ় পদার্থে যাহাতে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ না থাকে, এরূপ বিশুদ্ধিকরণ একান্ত আবশ্যক। মিশ্রণজাত দ্রব্য সমূহে যাহাতে যাহাতে মিশিয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তত্তৎ জাতীয় দ্রব্যাণু ভিন্ন অন্য জাতীয় অণু মিশিয়া থাকিলে তাহার পরিশুদ্ধি বিধেয়। ধূলি শর্করা প্রভৃতি বিমুক্ত করিয়া ওষধিমাত্রেরই বিশোধন করা কর্ত্তব্য। বিশোধনের পর সংশোধন ব্যবস্থেয় দ্রব্যনিষ্ঠ অনিষ্টজনক ধর্ম্ম অপনয়ন করার নাম সংশোধন। ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি আকরিক পদার্থ এবং অনেকগুলি ফল, মূল, ও বীজ নানাপ্রকার বিধি ও উপায়ে শোধন করিয়া লইতে হয়। সুপরিকৃত এবং সংশোধিত দ্রব্য পরিপাকের উপযোগী করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক খাদ্য বা ঔষধদ্রব্য জীর্ণ না হইলে কোন কাজে লাগে না, পরন্তু অনিষ্টোৎপাদন করে। খাদ্যদ্রব্য পরিণত বা সুসংস্কৃত হইলে পরিপাক পায়। ঔষধ দ্রব্য জারণাদি প্রক্রিয়াদ্বারা অন্তর্বহিঃক্রিয়োপযোগী করিয়া লইতে হয়। স্বর্ণাদিকে এরূপ অণুশঃ বিভক্ত করিয়া লইতে হয় লৌহ বঙ্গ প্রভৃতিকে এরূপ ভস্মীভূত করা বিহিত, উদ্ভিজ্জ দ্রব্যকে এরূপ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ করা আবশ্যক, যেন উদরস্থ হইয়া শোষিত হওতঃ নাড়ীর ছিদ্রপথ দিয়া রসরক্তাদির সহিত মিশিতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়া জারণ মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই প্রবন্ধে যথাবসর জারণাদি প্রক্রিয়ার উপদেশ করিব।

কতকগুলি পদার্থ অন্যদীয় ধর্ম্মগ্রহণক্ষম। জলে, তৈলে, ঘৃতে এবং সুরাদি দ্রব্যে দ্রব্যধর্ম্মাধান করা যাইতে পারে। যদি দ্রব্যের ধর্ম্মমাত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জল সুরা প্রভৃতি সহজে পরিপাকোযোগী দ্রব্যে দ্রব্যধর্ম্মধান করিয়া লইলে অনেক সুবিধা হয়। মনে কর নিম্বকাষ্ঠতে তিক্তরস বিশেষের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিমের ছাল বাটিয়া খাইতে হইল। পরিপাকযন্ত্রের বল থাকিলে এক রকম কুলাইয়া যাইতে পারে, না থাকিলে হিতে বিপরীত। বিগতরস বল্কলকল্ক পরিপাকযন্ত্রে যন্ত্রণা ঘটাইয়া নানা অসুখ জন্মাইতে পারে। এমন স্থলে যদি নিমের ছালের বিশিষ্ট তিক্তরস সুরাদি সূক্ষ্মপদার্থে আহিত হয়, তাহা হইলে গুরুদ্রব্য জন্য পাকযন্ত্রের পীড়ন হয় না। পরন্তু সুরা তৈল ঘৃতাদি পদান্তর সেবন জন্য ফলান্তরও পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশে সুরা শুক্ত আসব অরিষ্ট, কাঞ্জিক এবং ঘৃত তৈলাদি নানাবিধ ঔষধ পরিকল্পিত হইয়াছে। ফলকথা এই যে, মারিয়া ঘসিয়া, ভস্ম করিয়া, চূর্ণ করিয়া লঘুতর অথচ প্রয়োজনীয় দ্রব্যান্তরে ধর্ম্মাধান করিয়া দ্রব্যকে যত সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতমে লওয়া যায় ততই ঔষধের ফলোপধায়কতা বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

৫৭ সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব। *

ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলনে পাঠ করিবার নিমিত্ত যে চতুর্ব্বিংতিটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার সমুদয়গুলিই সময়োপযোগী ও অতি প্রয়োজনীয়। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিধানার্থ এই সকল ও আরও ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধরিয়া যত আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল হইবে আশা করি। এই বিষয়গুলিকে আর পুরাতন হইতে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। পুনঃ পুনঃ ইহাদের যতই আলোচনা হইবে ততই সারোদ্ধার হইবে মনে করি। দেশের সর্ব্বত্র কৃতী ও কর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের এদিকে সতত দৃষ্টি প্রার্থনীয়। এস্থলে আর একটু কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, পুরাতত্ত্ব ও জাতীয় বস্তুনিচয়ের সারোদ্ধার করিতে হইলে সকলেরই একথা বেশ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যেন আঁধার ঘরে সাপ খুঁজিতে না যাই। সত্যের আলোক বা ছায়া যেখানে পাত হইয়াছে, সেখানেই যেন আমাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টি পড়ে। আমরা রামকে শ্যাম, তিলকে তাল বা বিড়ালকে ব্যাঘ্রের আসন দিয়া না বসি। অথচ অরুণ-জ্যোতি সুবর্ণসৌধকেও গোময়লিপ্ত করিয়া না ফেলি, অথবা কেহ আমাদের মন্দির চূড়া বিচূর্ণ-বিলুণ্ঠিত করিয়া না ফেলে। আমাদের তমসাচ্ছন্ন খনিতে সকল রত্নই আছে, সে রত্নই আমাদের সকল অভাব দূর করিবে, অমনটিও যেন পূর্ব্বাহ্নেই কল্পনা করিয়া না লই। খুঁজিতে থাক, বিচার কর পরীক্ষা ও প্রয়োগ কর; তাহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

আমাদের তিনটী বিষয় ধারণায় রাখিতে হইবে। (ক) বর্ত্তমানে আমাদের কি আছে, প্রাচীনকালে কি ছিল আর তাহার কি আমরা পাইতে পারি। (গ) বাহিরের দিক হইতেই বা আমাদের কি লওয়া যাইতে পারে। আজ আমরা প্রস্তাবিত বিষয় নিচয়ের সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া যাইব।

আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব—

আয়ুর্ব্বেদর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আজকাল কিছু কিছু আলোচনার সূত্রপাত দেখা যায় অনেক পণ্ডিত গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ অতি

* কলিকাতা বৈদ্য সম্মেলনের জন্য লিখিত।

প্রাচীন শাস্ত্র। এই শাস্ত্র হইতেই নানা দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদই চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল ইত্যাদি। কথাগুলি একবারে উপেক্ষণীয় নহে অথচ শুনিতেও বেশ। জাতীয় গৌরবের কথা শুনিলে কাহার না আনন্দ হয়? আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরুপণ কথাটা সবচেয়ে গুরুতর কথা, এই তত্ত্বোদ্‌ঘাটনও কেবল সহজ নহে, বহু সন্তর্পণে এ কাজটি সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদ কি এবং ইহারই বা মূল কোথায়? অনেকেই এক কথায় উত্তর দিয়া থাকেন, "অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের মূল, বেদ অতি প্রাচীন সুতরাং আয়ুর্ব্বেদও প্রাচীন আর বেদমূলক বলিয়া ইহা অভ্রান্ত, ঋষি প্রণীত বলিয়া পরম শ্রদ্ধেয়, ভারতবর্ষ সমুদ্ভূত বলিয়া ভরতীয়গণের একান্ত উপযোগী।" একথাত আমরা অহরহ শুনিয়া আসিতেছি। এই কথাগুলিকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিলেই কি ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করা হইল মনে করিতে হইবে? যাহা আমরা জানি, যে তথ্য স্থিরীকৃত আছে, তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণে কি কোন ফল আছে? আমাদের দেখিতে হইবে, আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণে অভিনব কোন পন্থা বাহির করা যায় কিনা? যে তত্ত্বের বলে পুঞ্জীকৃত সন্দেহরাশি বিদূরিত হইতে পারে, বিপক্ষ পরাভব স্বীকার করিতে পারে। নিজদের হৃদয়ে সন্তোষের আবির্ভাবে নির্ভীক হইতে পারি। নতুবা অমুক সাহেব বলিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ সমধিক প্রাচীন, অমুক পণ্ডিত বলিয়াছেন, অমুক চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী ইত্যাদি কথার গুরুত্ব কতটুকু তাহা দেখিতে হইবে। পরের কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে হইবে নিজদের আয়ত্ত-ভিত্তি বৈভব কতটুকু বলীয়ান্? কোন্ সূত্র ধরিয়া আমরা এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রথমোঙ্কার উচ্চারণ করিব? কোন্ ভিত্তি মার্গ আমাদের জটিলতা দূর করিয়া সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিবে? আমরা অশ্বমেধের ছিন্নশিরা অশ্বের মস্তক যোজনা করিয়া জীবিত করিতে পারি, ব্যোমপথে বিমান পরিচালন করিতে পারি, মানুষের অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া অরাতি নিপাত করিতে পারি। আমরা ধ্যান যোগে বিজ্ঞান যাহা কখনও দেখিতে পারে নাই ও পারিবেনা, তাহা ও দর্পণে

স্বমুখাবলোকনের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারি, মন্ত্রযোগে মহাগিরিকেও টলাইতে সক্ষম হই, কিন্তু আমরা পারিনা অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিতে, নিত্য আধি ব্যাধি হইতে দূরে থাকিতে, অশন বসন নির্ব্বাচন করিতে! আয়ুর্ব্বেদের বোঝা মাথায় করিয়া আজ আমরা বৈলাতিক বেদের নিকট বিনিময় বিজ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের সকলই ভাল, কেবল কথায় ও কাজে ঐক্য নাই। আয়ুর্ব্বেদের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পক্ষপাত পরিশূন্য হইতে হইবে। এই যে বৈদিক আয়ুর্ব্বেদ, এই যে তান্ত্রিক, প্রাচীন ও নব্য আয়ুর্ব্বেদ ইহাদের সামঞ্জস্য ও বৈষম্য নির্ণয় করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের কোন শাখা কিভাবে কোথায় যাইয়া কিরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং কোথায় তাহার শেষ দাঁড়াইয়াছে? আর আয়ুর্ব্বেদের কোন শাখায় অন্য কোন জাতীয় শাখার সমন্বয় সংবেশ ঘটিয়াছে কিনা?

আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, পার্থিব ও অপার্থিব ভাব লক্ষণাদির একত্ব ও পৃথকত্ব। অতীত ভাবলক্ষণ যাহা পুরাণে, বেদে আয়ুর্ব্বেদে গ্রথিত, আর মানবের মধ্যে পার্থিব ভাব যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ গোচরে আসে তাহার তুলনা কেমন?

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ছিন্নশির, মেঘবাহন ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ, তারাপতি নিশাকর চন্দ্রের যক্ষ্মা, গ্রহপতি দিবাকর সূর্য্যের দন্তরোগ, পৃথিবীর নেত্রস্বরূপ ভাস্কর আদিত্যের নেত্ররোগ এবং সুবৃদ্ধ চ্যবনঋষির বার্দ্ধক্য এই আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণে পরিমুক্ত হইয়াছিল। * ইহার ঐতিহাসিকত্ব কি লোকলোচনের অন্তরালে রহে নাই? ঐতিহাসিকত্বে কি ইহা বাদ

* দক্ষাদশ্বিনৌ দস্রৌ বিভজ্য সংহিতাং স্বীয়াম্।
সকলচিকিৎসক লোক প্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে ধন্যাম্॥
স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষাহথ তৎ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাত্তৌ যাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ॥
দেবাসুরে দেব দৈত্যৈ সক্ষতা ক্ষতাঃ।
অক্ষতাস্তে কৃতা সদ্যো দস্রাভ্যামদ্ভুতং মহৎ॥
বজ্রিণোঽভূদ্ ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ।
সোমাগ্নিপতিতশ্চন্দ্র স্তাভ্যামেব সুখী কৃতঃ॥

পড়িবে? আজকাল যে মধ্যে মধ্যে আদিত্যের নেত্ররোগ উপস্থিত হয়, কখনও বা নেত্র বাহিয়া জল পড়ে, কখনও বা দাবানল সদৃশ হইয়া জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে আমাদের 'বিশুদ্ধ' 'সুলভ' 'অকৃত্রিম' কিছু "মহাত্রিফলাদ্যঘৃত" বা "চ্যবনপ্রাশ" ব্যবস্থা করিলে কি ফল হয় না? এই যে প্লেগ, বসন্ত, বেরিবেরি প্রভৃতিতে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে; আদিত্যকে অনাময় করিতে পারিলে এবং নিশাকরকে নিরাময় করিতে পারিলে কি ইহার শান্তি হয় না? আর এই যে আমাদের অকালবৃদ্ধ কাশ্যপ, ভরদ্বাজ মৌদ্গল্য প্রভৃতি মহামুনির বংশধরগণ জীবনেও মৃতের লীলাভিনয় করিতেছেন, ইহাঁদের জন্য কি একবার সেই অমৃতনাথ অমরপ্রবর অশ্বিনী-কুমার যুগলকে দেবলোক হইতে আনয়ন করা যায় না? তাঁহাদের লুপ্তবিদ্যা কি ভুবনপ্রথিত কবিরত্ন কবিশেখরগণ লাভ করিতে পারেন না? আমরা বলি উপযুক্ত ঐতিহাসিক জুটিলে সকলই সম্ভব হইবে।

কথা প্রসঙ্গে অবান্তর অনেক কথাও বলিয়া ফেলিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। আমরা আবার বলি আয়ুর্ব্বেদের রত্নদীপ চিরোজ্জ্বল চির অমৃতময়, সুখের নিদান, সম্পদের খনি। মানব জাগ, একবার দেখ।

আয়ুর্ব্বেদে মসূরিকা রোগের কারণ ও চিকিৎসা।

কটু, অম্ল, লবণ' ক্ষারদ্রব্য ভোজন, মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ-ভোজন পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পুনরায় ভোজন, দুষ্ট অন্ন, শিম, শাকাদি আহার, বিষাদি-সংস্পর্শদূষিত বায়ু ও জল সেবন এবং দেশের প্রতি ক্রূরগ্রহদিগের

বিশীর্ণা দশনাঃ পূষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ।
শশিনো রাজযক্ষ্মাহভূদশ্বিভ্যাস্তে চিকিৎসিতাঃ॥
ভার্গব শ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীর্য্যবর্ণ স্বরোপেতঃ কৃতোহশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা॥
এতৈ শ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষজাং বরৌ।
বভূবতুর্ভৃশং পুজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্॥ ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড

কুবৃষ্টি এই সকল কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের ন্যায় অকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে সকল পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাকে মসূরিকা বা বসন্ত রোগ বলে।

মসূরিকা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডু, গাত্রবেদনা, অনবস্থিত-চিত্ততা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি, বৈবর্ণ্য এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

মসূরিকায়াং কুষ্ঠেষু লেপনাদি ক্রিয়া হিতা।
পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে।

মসূরিকা ও কুষ্ঠ রোগে লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই রোগে পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পোক্ত ক্রিয়া সকল হিতকর। মসূরিকা রোগের প্রারম্ভে শ্বেত চন্দনের কল্ক ও হেলেঞ্চা (হিঞ্চে) শাকের রস অথবা কেবল হেলেঞ্চা শাকের রস পান করিলে উপকার হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার মসূরিকা রোগে পটোলপত্র, নিমেরছাল, বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে

করলাপাতার রসে হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া পান করাইলে রোমান্তি জ্বর, বিস্ফোট ও মসূরী প্রশমিত হয়।

যে সকল ব্যক্তি নিম্বপত্র, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদের বসন্তরোগ হয় না।

স্ত্রীলোকের বামপার্শ্বে এবং পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে হরীতকী বীজ ধারণ করিলে বসন্ত হয় না। কণ্টকারী মূল ও গোলমরিচ সমান ভাগে একত্র বাটিয়া একমাষা (পূর্ণমাত্রা) পরিমাণ বাসি জলের সহিত সেবন করিলে বসন্ত হয় না।

গাধার দুগ্ধ সেবন করিলেও বসন্ত হয় না। মসূরী প্রথম দৃষ্ট হইলে কুমারিয়া লতার ক্বাথে হিঙ্গু একমাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

গোক্ষুরী মূল অথবা অনন্তমূল তণ্ডুল জলের সহিত বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ প্রশমিত হয়।

এক ভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলি করিয়া চারি কিম্বা ছয় মাষা পরিমাণ পানের সহিত সেবন করিলে অথবা হরিদ্রাপাতা ও তেঁতুলের পাতা শীতল জল সহ বাটিয়া পান করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়। বাসি-

জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটি ও তজ্জন্য দাহ নিবারিত হয়।

মসূরিকা রোগে বিসর্প চিকিৎসোক্ত অমৃতাদি কষায় ব্যবস্থা করিবে।

নিম্বং পর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীম্॥
বাসাং দুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দন দ্বয়ম্।
এষ নিম্বাদিক খ্যাতঃ পীতঃ শর্করয়া যুতঃ॥
হন্তি ত্রিদোষ মসূরীং জ্বরবিসর্পসম্ভবাম্।
উত্থিতা প্রবিশেদ্ যাতু পুনস্তাং বাহ্যতোনয়েৎ॥

নিম্বাদি কষায় পান করিলে জ্বর ও বিসর্প জনিত এবং ত্রিদোষ জাত এই মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে সকল মসূরী বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয় তাহাও ইহাতে বাহির হইয়া পড়ে। যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়, তাহাদের পুনরায় বহিষ্করণার্থে রোগীকে রক্তকাঞ্চন ছালের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্ক বসন্ত শুষ্ক করিবার জন্য পটোলাদি কষায় প্রয়োগ করিবে।

পাককালে বসন্ত সকল বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইতে থাকে তৎকালে রোগীকে শোষক আহার না দিয়া পুষ্টিকর আহার দিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মুর্ব্বা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ অথবা ইহাদের অর্দ্ধসিদ্ধ জল দ্বারা পরিষেক করিলে চক্ষুঃস্থ মসূরিকা বিনিষ্ট হয়।

মসূরিকায় অধিক পূয নির্গত হইলে বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত এই পঞ্চবল্কলের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে এবং বিলঘুটে ভস্ম অথবা গোময় চূর্ণ বস্ত্রে ছাকিয়া ঐ ক্ষত স্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে।

কণ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত মধুর সহিত পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ অবলেহ করিবে।

অভ্যঞ্জন ও ভোজনার্থ কুষ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। মসূরিকায় ব্রণোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

শ্বেতবেড়েলা, বেড়েলা, পিপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত, ও মধু এই সকল দ্রব্যের সহিত রসসিন্দুর মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমিত ব্যবহার করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন, 'ততোঽভিষেক কর্ত্তব্যঃ কৃত্বা মঙ্গল বাচনম্। এই রোগে ঘণ্টাকর্ণ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপ হোমাদির অনুষ্ঠান ও শীতলারোগের ব্রত আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ বিধয় সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তি পূর্ব্বক শীতলা দেবীর স্তোত্র পঠন ও পাঠন করিবে।

কবিরাজ—শ্রীভবানীচরণ রায় কবিভূষণ।

কোন্নগর, হুগলী।

নিখিল-ভারতীয়-বৈদ্যসম্মেলনস্য সভাপতেঃ জয়পুর-রাজকীয়বিদ্যালয়ায়ুর্ব্বেদ-প্রধানাধ্যাপকস্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যস্য আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত বৈদ্যরত্ন শ্রীলক্ষ্মীরামস্বামী ভিষগ্মণি মহোদয়স্য

অভিভাষণম্।

উপক্রমণিকা।

শ্রীধন্বন্তরির্বিজয়তে।

বন্দেঃ সর্ব্বদুঃহরণং প্রবণং ভবতারণে।
সাধুনামেকশরণং শ্রীকৃষ্ণচরণং মুদঃ॥
যৎপ্রভাপটলোদ্ভাসি ভাসতেঽদ্যাপি ভারতম্।
আয়ুর্ব্বেদাত্মকংজ্যোতিঃ শাশ্বতং নঃ প্রকাশতাম্॥

বিদ্যাবৈভবভাস্বরা গুণগণৈরাপূরিতাশান্তরা
মাতুর্নঃ খলুভারতীয়ধরণেঃ সেবাসু হেবাকিনঃ।
যে যে সংপ্রতি সোৎসবা সুমনসঃ সংভূয় বৈদ্যাগমো-
ন্নত্যৈ সংদধতে কৃতিং সবিনয়ং সংমানয়ে তানহম্॥
রাজ্যে যস্য বয়ং নিরস্তবিপদঃ প্রারব্ধভদ্রোদ্যমা
এবং সংপ্রভবাম উন্নময়িতুং ভৈষজ্যশাস্ত্রং পরম্।

বীরাত্তোপি চ পঞ্চমো বিজয়তাং শ্রীজার্জ্জরাজেশ্বরঃ
কুর্ব্বন্ দুর্ম্মদজর্ম্মনারিনিকরে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥
সদ্বৈদ্যাগমনিত্যখেলনকলারঙ্গান্মুপাগামিমান্
বঙ্গান্ ভেষজসংপ্রয়োগপটুতাকামঃ কদাচিৎ পুরা।
এতেষ্বেব চ সৎক্রিয়ে যদধুনা মন্দোঽপ্যহং দ্বারকা-
নাথস্যাখিলবৈদ্যভূষণমণেঃ সোঽয়ং প্রসাদোদয়ঃ ॥

অথবা

পূর্ব্বৈঃ সাধুগুণোজ্জ্বলৈরুপচিতাভিখ্যে সভানায়ক-
স্থানে দোষমলীমসস্য মম যন্নির্ব্বাচনং সাধু তৎ।
ষড়্‌বর্ষীয়শিশোরসৌ সমভবৎ-সংমেলনস্যালীকে
কৃষ্ণাকজ্জ্বলরেখিকেব জনতাদৃগ্দোষনির্ম্মূলনী ॥

অয়ি শ্রীমন্তো মহাশয়াঃ প্রাচ্যভৈষজ্যবিজ্ঞানানুশীলনোপকৃতাশেষজনতাঃ পীযূষ-পাণয়ো জগদগদঙ্কারবর্য্যাঃ সভাস্তারা ভিষগ্‌ভৈষজ্যোপকারকৃতমতয়ঃ পুরুষার্থবহুলাঃ সজ্জনধুর্য্যাশ্চ, দিষ্ট্যা জন্মমরণমহারোগজীবাতোর্নিখিলব্রহ্মাণ্ডসূত্রধারস্য ভগবতঃ কৃপয়া সমাবর্ত্তিতং ষষ্ঠং নিখিলভারতীয়বৈদ্যসম্মেলনম্। সমুচিত-মেবাস্য ভো ভো ভারতভিষগ্‌বরা, ভ্রাম্যতো লব্ধপ্রতিষ্ঠস্য নবোৎসাহসম্পাদ কলিকাতায়াং ভারতরাজপ্রতিনিধিনা নাতিচিরাদুৎসৃষ্টায়ামপি বাণিজ্যবিদ্যা-সম্পদা যথাপুরা সমৃদ্ধায়ামস্যাং প্রধাননগর্য্যামধিবেশনম্। যাবনপাশ্চাত্যচিকিৎ-সাবাত্যায়াৎসারিতে লোকোপেক্ষাতপেন ক্লান্তচিকিৎসকপালোপেক্ষয়া ক্ষীণে যথায়ুর্ব্বেদো ভূমিমিমামাজগাম বাঙ্গীং নিবাতায় শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ চ, তথৈব বয়মপি সোৎসাহকৃতানাং স্বনির্ভরানাং বিদ্বৈরদূরদর্শিনানাং বর্ত্তমানে ঋষিপ্রবর্ত্তিতায়ুর্ব্বেদ-প্রচারে কনিষ্ঠিকাগণনীয়ানাং বাঙ্গবিদুষাং করাবলম্বং লব্ধুমায়তাঃ স্মঃ। অন্যত্র পুস্তকেষু বৃদ্ধেষু কথাসু বা স্মৃতিশেষতাং গতশ্চিকিৎসকাম্নায়োঽত্র গুণবহুলাঃ বৈদ্যজাতিমাশ্রিত্য ন কেবলং জীবতি পরন্তপরারাতি স্বচমৎকারৈঃ প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহিতাপলাপান্। অত্র হি সুগৃহীতনামধেয়ো মহামহোপাধ্যায়পণ্ডালঙ্কারা মদ্‌-গুরুচরণাঃ শ্রীদ্বারকানাথসেন মহানুভাবাঃ শ্রীবিজয়রত্ন সেন মহাশয়াশ্চ নানাদেশা-গতেষুচ্ছাত্রেষু তদ্বিদ্যাবীজমবপন্ যৎ পুষ্পিতং ফলিতং কাণ্ডপ্ররোহবদায়ুংষি পু-

ক্ষান্তি বহূনাং চিকিৎসান্তরবিপ্রলব্ধানাম্। অত্র হি যুবাপি বিদ্যয়া বৃদ্ধো গণনাথসেন মহোদয়ঃ পাশ্চাত্যব্যবহারিকবিজ্ঞানাৎ প্রয়োগসাপেক্ষাং সূক্ষ্মগবেষণাং ভাষান্তরজন্মনীং লীনামুদ্ধৃত্য ভগীরথ ইবায়ুর্ব্বেদমহোদধৌ সমযোজয়ৎ। অত্র হি য়ুরোপাখ্যাতযশা লব্ধবর্ণঃ প্রফুল্লচন্দ্ররায়ঃ প্রাচীনার্য্যরসায়নশাস্ত্রস্যেতিহাসং গুম্ফন্ রসার্ণবং বিলুপ্তং পুনঃ সমস্কারোৎ। অত্র হি বৈদ্যা ন যথেতরত্র বৈয়াকরণকিরাতাপসারিতাপশব্দ-মৃগযূথবিহারায় কন্দরীকৃতাননাঃ, কিন্তু শব্দার্থোভয়বিদো নামানুসারং কবিরাজা এব। ন তে শুষ্কাঃ শুষ্কাঃ স্থাণবঃ পরং রসাঢ্যাঃ। নিয়তমেতেষাং কৃপয়া পুরীমেনাং সমাগতৈরস্মাভিঃ কাপি নবীনা সংজীবনী শক্তিরুপলভ্যেত যথা বঙ্গেম্বিবান্যত্রাপি ভূয়াদগ্নিবেশসনৎকুমারচরকাদীনামাচার্য্যবর্য্যাণাং তপসো জ্যোতিষঃ প্রকাশঃ।

পরন্ত্বিদমেতৎ ইয়ং চাভিযুক্তভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। এতে চ দোষজ্ঞাঃ পরীক্ষকাঃ। কার্য্যং চৈতেষাং নায়কত্বমিতি সত্যং বেপতে মে হৃদয়ম্। শ্লথীভবতি চোৎসাহো মম পাঠমেতদ্বিকর্ত্তুং যত্র ভবদ্ভির্গুণলেশগবেষিভিরামন্ত্রিতোঽস্মি। বরতরমভবিষ্যদ্ যদি কশ্চিৎ-প্রবয়া লোকশাস্ত্রবিচক্ষণো মাননীয়েষু পণ্ডিতেষ্বন্যতমঃ সর্ব্বেষামস্মাকং ধুর্ব্বাহতায়াং ক্ষমো বৃতোঽভবিষ্যৎ। অহং ব্যবহারানভিজ্ঞঃ শ্রীগুরুচরণপ্রসাদাদাপ্তকতিপয়জ্ঞানকণঃ কোণস্থ ইব কাংশ্চিচ্ছাত্রানধ্যাপনব্যাপারানি, কাংশ্চিদপরিচিতভিষগন্তরানুরাগিণ উল্লাসীকর্ত্তুং মহতঃ শাস্ত্রসম্ভারস্য পৃষ্ঠমেকমাশ্রিত্য যতে। ন ময়া গণনাথেনেব গণিতা শিরা, ন যোগীন্দ্রনাথেনেব যোজিতং গ্রন্থজাতম্, ন চ কীর্ত্তিকরেণেব সঞ্চিতা বনস্পতিচয়পরিচয়কীর্ত্তিঃ। বিশেষতশ্চ জিহ্রেমি প্রভূতস্মরণীয়ানাং গুরুতরাণাং লীলাভূমাবত্র প্রাধানতাং ধার্ষ্ট্যেন নাটয়িতুম্। পরং তত্রভবতাং ভবতাং নির্দেশৈকপরবশঃ স্বস্থানসহস্রশঙ্কান্দোলিতমানসোঽপি স্বীকরোম্যনীহোঽপি যদ্ভবদ্ভিরুচিতমিতি যথারুচিবিহিতম্। আশাসে চ দোষমর্ষণং মুহুর্মুহুর্দয়ালুভ্যঃ।

কেনাপি দেশকালচর্য্যামন্তরা ন কাপি সভা প্রারব্ধুং শক্যম্। আপামরং চৈতৎ কর্ণপথমায়াতং সর্ব্বেষামস্মাকং ভারতীয়ানাং যদস্মদ্রাজরাজেশ্বরস্য প্রবলপ্রতাপপ্রচয়প্রভবিষ্ণুনা জিষ্ণুনা পঞ্চমজার্জ্জেন স্বীয়াভিঃ সেনাভিরাক্রান্তো বেলজিয়মস্বাধীনতাভঙ্গো নিজযশোপহন্তা সন্ধিভেত্তা জগতাং শান্তিহর্ত্তা

জর্ম্মনভূদারঃ। ধর্ম্মপথাশ্রবনীনস্য দুর্ব্বলোদাসীনরাজ্যসন্তারৈ যুধ্যমানস্য সম্রাজোঽস্মদীয়স্য ভারতাদিনানাদেশায়াতসেনাসমূহৈরুপচীয়মানবলস্য বলানাং পুরতো নশ্যতু জর্ম্মনময়ং জগৎকর্ত্তুং দুরুৎসাহো, যথারুচি মুদিতপত্রখণ্ডমিব রাজপ্রতিজ্ঞাং দলয়িতুং দুরভিনিবেশো, জগদুন্নায়কবিজ্ঞানানাং জনপদবিধ্বংসনে দুরুপযোগায় গর্হনীয়া প্রবৃত্তিঃ, বিদ্যালয়ৌষধালয়মন্দিরাদিভঙ্গে স্বরায়িতং চ জর্ম্মনরাজস্যাচিরাদেবেতি রাজভক্তানাং শান্তিপ্রিয়ানামস্মাকং সর্ব্বেষাং হার্দ্দো প্রার্থনা। তত্র রণক্ষেত্রেষু যে ভারতীয়াঃ শূরাঃ সূর্য্যমণ্ডলভেদিনো বীরগতিং যান্তি, যে চ শত্রোরেব পৃষ্ঠং দ্রষ্টুমিচ্ছবো বীরায়ন্তে, যে চায়ুর্ব্বেদস্য পাশ্চাত্যসংস্করণে শল্যকর্ম্মপ্রধানে দক্ষা দক্ষতরা (Doctors) মৃত্যোর্দংষ্ট্রীতঃ পান্তি। নিঃসপত্নমিত্রভেদং শস্ত্রাহতান্ ব্রণাংশ্চ সান্ত্বয়ন্তি, তেষাং সর্ব্বেষাং মহতী গৌরবে বর্ণ উদ্যোগরাশিঃ। পরমেশ্বরানুগ্রহেণাস্মাকং বাহিনীনাং তথা নিরুদ্বিগ্নো জয়োঽস্তু। যথা ন কোঽপি পরো বলদৃপ্তঃ শস্যশ্যামলাং জননীমিব সর্ব্বসুখদাত্রীং বৃটিশৈঃ সৌরাজ্যবাঞ্ছিতাং সমুদ্রপরিখাং শান্তিমধুসমাস্বাদয়ন্তীং ধর্ষিতুমুৎসহেত। যেন বয়ং নিজনিজবিদ্যানাং বিকাশনে জাগরূকাঃ সার্ব্বদৈশিকমুৎকর্ষং বৃটিশচ্ছত্রচ্ছায়ায়াং প্রাপ্নুয়ামঃ। ইতঃ পরং বয়মস্মৎপ্রভোর্ভারতাধীশ্বরস্য প্রতিনিধের্ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদ্যনেকগুণগণপারাবারস্য শ্রীলার্ডহার্ডিঞ্জমহোদয়স্য পত্নীপুত্রয়োরসাময়িকবিয়োগরূপাং বিপদমনুশোচন্তো হার্দ্দিকীং মনবেদনাং সখেদং প্রকাশয়ামঃ।

(ক্রমশঃ)

আহার-সমস্যা।

(৩)

আহারের প্রধান প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা, লোকসকল দেশ, কাল ও ব্যক্তির কর্ম্মানুযায়ী এই আহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, ইহাই সচরাচর দেখা যায়। আমাদের শাস্ত্রে তিন প্রকারের আহারের ব্যবস্থা দেখা যায়, সাত্বিক, রাজাসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে—

"পথ্যং পূতমনায়ত্তমাহার্য্যং সাত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয় প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥

পথ্য—বিশুদ্ধ অথচ সহজ লভ্য এইরূপ আহার সাত্বিক, মিষ্টদ্রব্য, কটু অম্ল, লবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রিয় আহার রাজসিক এবং দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসী ও অপবিত্র এবং যে দ্রব্য খাইলে রোগ জন্মে তাহাই তামসিক আহার। বিশেষতঃ—

আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যা স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

শাস্ত্রোক্ত এই যে আহারের ত্রিবিধ লক্ষণ দেখা যায়, ইহার সফল দৃষ্টান্ত কোথায় মিলে? এখনও হিন্দুগণ সাত্বিক আহারেরই পক্ষপাতী কিন্তু তাঁহারা সাত্বিকতা কতটুকু রক্ষা করিয়া দেহ জীবনের কতটুকু উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন, তোমরা যাহাদিগকে রাজসিক বা তামসিক বলিয়া ঘৃণা করি তাহাদের মধ্যেই বা উন্নত দেহ জীবন মনুষ্যের অসদ্ভাব কোথায়? এ প্রশ্ন ও অনেকে করিয়া থাকেন। ২।৪টি খাদ্য জাতি বিশেষের অখাদ্য তদ্ভিন্ন দেশ বিশেষে সকলের খাদ্যই প্রায় এক রকম। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই আহার বিহারের সৌসাদৃশ্য আছে সুতরাং বাঙ্গলার যেখানে যাও সেখানকার সকল জাতীয় লোকের স্বাস্থ্যই একরূপ দেখিবে, কিন্তু পঞ্জাবে যাও, সেখানে হিন্দু মুসলমান সকলের স্বাস্থ্য ও আকৃতিই এদেশ হইতে

ভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে. হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান বঙ্গদেশেরই হউক পঞ্জাবেরই হউক বা বিলাতেরই হউক খাদ্য যার যার একই নিয়মে পৃথক। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে দেহ প্রকৃতি অত প্রভেদ হয় কেন? বলিতে পার উহা দেশেরই গুণ। একথা বলিলে খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ গৌণ হইয়া পড়ে। একজন কাবুলি মুসলমানের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানের তুলনা করিলে কি বুঝা যায়? কাবুলে হিন্দুও আছে তাহারাও বাঙ্গালী হিন্দুর তুলনায় স্বাস্থ্যের গুরুত্বে অধিক হইবে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন সেদেশে খুব বলকারী ফলাদি সুলভে পাওয়া যায় তাহার ফলেই উহারা এরূপ স্বাস্থ্যে উন্নত, ইহাও প্রকৃত কথা বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ইহার ভিতরে এক রহস্য আছে।

আহারের সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকটতর সম্পর্ক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সাত্বিকাদি আহার ভেদে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধটুকু অনেকেই যেন নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। আমরা যাহাদের তামস ও রাজস প্রিয় বলিয়া ঘৃণা করি তাহাদেরই যেন দুঃখ শোক রোগ কম, আর সত্বপ্রিয়গণই বলারোগ্য সুখে বঞ্চিত। কেন এরূপ হয়? চীনাগণ প্রায় সমস্ত জিনিষই পূতি-পর্য্যুষিত না করিয়া খায় না, উহাই তাহাদের অধিকতর প্রিয়। উহাদেরত বুদ্ধি ঋদ্ধি কম নহে, রোগ দৈন্যেরও দারিদ্র্য। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ স্থানে বাঙ্গালী যেমন আক্রান্ত হয়, চীনাগণত সেখানে প্রায় নিরাময়ে নিয়ত বাস করিয়া থাকে। কেন এমন হয় অনেকেই ইহা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাই বলিতেছিলাম আহারসমস্যা পদে পদে। সকল সম্প্রদায়েই আহার বিষয়ে এমন এক একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়, যাহা তাহারা সহজে কিছুতেই দূর করিতে পারে না। যখন সেই মোহটুকু কাটিয়া অপরাস্তর মোহ উপস্থিত হয়, তখনই সে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য প্রকৃতি লাভ করে। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ভিন্ন দেশের লোক যতদিন ভিন্ন দেশে গিয়া নিজ দেশের আচার নিয়ম মত আহার বিহার করে ততদিন তাহাদের স্বাতন্ত্র্য লোপের ছায়া পাত হয় না। যখনই ধীরে ধীরে বিশেষত্বটুকু বিস্মৃত হইতে থাকে, তখনই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য লোপের সূচনা হয়। বাঙ্গালী বহুদিন হিন্দুস্থানে থাকিয়া ঠিক তাহাদেরই মত মিশিয়া যাইতে পারে আবার

স্বপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণও রাখিতে পারে, অন্যদেশের লোক সম্বন্ধেও এই কথা। শুধু আহারের ব্যতিক্রমেই এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী হিন্দুর মৎস্য প্রধান খাদ্য, কোন কোন দেশের হিন্দু উহা স্পর্শও করে না। ইহার উপযোগিতা কি দেশের প্রতি অথবা ব্যক্তির প্রতি তাহাই বিবেচ্য। বাঙ্গালী যেখানেই যায়, মাছ খায়। যখন তাহারা মাছ ছাড়িবে তখন তাহাদের আস্তে ২ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইবে। হিন্দুস্থানীগণ এদেশে আসিয়া যতদিন মাছ মাংস না খায় ততদিন একরূপ থাকে, যেই মাছ মাংসে লোলুপ হয়, অমনি তাহাদের পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। এরূপ অন্যান্য খাদ্য বিষয়েও এই কথা। প্রথম খাদ্য, দ্বিতীয় দেশ ইহার সমন্বয়েই দেহ প্রকৃতি গঠিত হয়, ইহাই বলিব অথবা দেশ মাত্রই কারণ? খাদ্য মাত্র কারণ হইলে যে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল তাহারা ভিন্ন দেশে যাইয়া কখনই যেন খাদ্য পরিবর্ত্তন না করে. আর দেশ মাত্র কারণ হইলে, দুর্ব্বল ব্যক্তি-প্রধান দেশের লোক বলবানপ্রধান দেশে গিয়া বাস করিলেই তদনুরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে; আহারের নিয়ম পরিবর্ত্তনের তাহার প্রয়োজন নাই। এখন ইহার কোন্‌টী পরীক্ষাসিদ্ধ, বলিয়া দিতে পার কি? এই মাত্র বলিতে পার, দেশের উপযোগী খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত। যেমন শীতপ্রধান দেশে শীত সহনোপযোগী গুরু, উষ্ণ মাংসাদি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উষ্ণবিরোধি স্নিগ্ধ শীতল অন্ন, মৎস্যাদি। চিরাভ্যস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করাও কঠিন। ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিলেও প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া যাইবে। কোন নূতন দেশে যাইয়া সেই দেশের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিতে এই সমুদয় বিবেচনা করিতে হয়। (ক) সেই আহার কতটা রুচিকর হইবে? (খ) অনায়াস লভ্য হইবে কিনা? (গ) স্থায়ী অধিবাসী হইবে কি না ইত্যাদি অরুচিতা মহার্ঘতা অথবা সাময়িক প্রবাসী হইলে, পরিবর্ত্তন তাহার বিড়ম্বনা বিশেষ হইবে। তুমি হিমালয়ে যাইয়া চা চুরুট রোটি মাংস মদ্য ভোজন-পানে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইতে পার। কিন্তু যখনই আবার বাঙ্গালার মাটিতে আসিয়া পা, ফেলিবে, তখন তোমার দশা কি হইবে? হিমালয়ে কি ফল মূল ডাল ভাত খেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না? বাঙ্গালার তপ্ত ভূমিতে রোটি মাংস চা প্রভৃতি খাদ্য পানীয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্য বজায় থাকে না? "ভাতো বাঙ্গালী"

ছাতুখোর মেরুয়া মাংসখোর কাবুলী বলিয়া পরস্পরকে বিদ্রুপ করা চলে কিন্তু ইহার ভিতরে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটুকু কোথায় লুকায়িত আছে কেহ খুজিয়া দেখিয়াছ কি? লোক সকলকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে হয়, একথা সত্য, সর্ব্বত্রই প্রায় এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের প্রসারে সে দিন চলিয়া যাইতেছে, সকল দেশের আহারই এখন সকলে সঙ্কলন করিতেছে। এই দেশের এই খাদ্য এই নিয়মটি বুঝি বা বিলুপ্ত হইয়াই যায়। আমেরিকাবাসীও আজ ভারতীয় ব্রহ্মচারীর পথ্য অনুমোদন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালীগণের আজ আর যেন ভাতে রুচি জন্মিতে-ছেনা। তাহারা চায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে প্রস্তুতমাংস, ডিম, রোটী, বিস্কুট, অভাব, অঘটন একথা আর এখন বিশাল যান বাহন যুগে খাটিবে না। অভাব বোধ হইলে এখন সহজে তাহার প্রতিকার হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী ভাত মাছ ছাড়িতে পারে, ইংরেজগণেরও হবিষান্নভোজী হওয়া বিচিত্র নহে। আহারীয় দ্রব্যে প্রকৃত অভাব বোধ ও স্বেচ্ছাচারিতা চিন্তার বিষয়। রুচি ও অভাবের ভাণ করিয়া লোকে যে কত অভক্ষ্য অস্বাদু অসার দ্রব্য উদরস্থ করিয়া ফেলিতেছে সে সব এখন নির্দ্ধারণ করিয়া উঠাও দুরূহ। নিত্য নূতন আহার্য্য আবিষ্কৃত হইতেছে আর সকলে তদ্দারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতেছে। আহার্য্যের বিচার কতটুকু?

প্রাচীন শাস্ত্রে আহারের বহুবিধ নিয়ম প্রণালী রহিয়াছে সত্য কিন্তু উহা-দের যথার্থ আচরণ ও ফলানুসরণের উপায় কি? শাস্ত্রে আছে—তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভোজনে ফল হানি ঘটিয়া থাকে যেমন সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে রোগ বৃদ্ধি ও শরীর নাশ, অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে বুদ্ধি ভ্রংশ ইত্যাদি। এই নিয়মগুলি কেহ কেহ পালন করেন সত্য কিন্তু তাহারা কতটা ফলভোগ করেন, আর যাহারা ইহা মানেন না বা পালনে অগ্রসর নহেন তাহারাইবা কতটা প্রত্যবায় ভাগী, তাহার বিচার কেহ করিয়া দেখিয়াছ কি? ইহার কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা অদ্য পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? "সায়ং প্রাতর্ম্মনুষ্যাণামশনং শ্রুতি বোধিতম্" "নৈকাদিত্যে দ্বিভোজ-নম্" এসকল নিয়ম কেন? ইহা কি শরীর রক্ষা না পারলৌকিক ধর্ম্ম? দিবাতে একবার মাত্র ভোজী ও বহুবার ভোজীর স্বাস্থ্য, জ্ঞান, আয়ুর তুলনা

করিলে কি দেখিতে পাই ? অনেক জাতীয় লোক দিবারাত্রির মধ্যে বহুবার ভোজন করিয়া থাকে, কোথায় তাহাদের স্বাস্থ্য মন্দ ? দিবায় একবার ভোজন করিতে বসিয়া যাহারা চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজন-পানীয় দ্বারা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া থাকে, একবার ভাব তাহাদের কথা, আবার দেখ যাহারা ক্ষুধার সময় পরিমিত আহার্য্য পুনঃপুনঃ গ্রহণ করে, তাহাদের কথা কোন্‌টী সমীচীন ? আমরা এখানে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই নাই,কেবল দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিয়া যাইব। অনেক পাশ্চাত্য ও আধুনিক এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ কিন্তু পুনঃপুনঃ ভোজনেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

"আহারং বিজনে কুর্য্যাৎ" "তন্মনা ভুঞ্জীত" নির্জ্জনে আহার করিবে, নিবিষ্টমনে আহার করিবে। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতগণ বলিতেছেন প্রকাশ্য ভাবে হাসি গল্প তামাসার সহিত আহার করিবে, সেরূপে আহারই উত্তম, ইহাদের কোন্ পন্থা আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে ? প্রাচীন পণ্ডিতগণ আর্দ্র পদে ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখনও অনেক পাদুকাবদ্ধ শুষ্কপদে ভোজনেরই আদর্শ দেখাইতেছেন। ভোজনের বিধি নিষেধ ও বিপর্য্যয়ের কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ভোজনের সার্ব্বভৌম পন্থাটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সকলে লালায়িত হয় না কেন ? সকল-দেশের, সকল জাতীয় মনুষ্যের কি এক খাদ্য হইতে পারেনা ? খাওয়ার মাত্রা কি, কতদিন মানুষ না খাইয়া বাঁচিতে পারে, রীতিমত ভোজন করিলেও উপবাসের আবশ্যক আছে কি না ? দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইলে কি নিয়মে আহার করা উচিত, শক্তি ও স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য কোন্ আহার উপযোগী, আমিষ বর্জ্জনীয় কি না বা কেবল আমিষ খাদ্যে দোষ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান শক্ত হইলেও বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন।

যাঁহারা "নৈকাদিত্যে দ্বি ভোজনম্"রীতি রক্ষা করিতে যাইয়া একবারেই তিনবারের বা ততোঽধিক খাদ্য উদরসাৎ করিয়া থাকেন ; ইঁহারা যে কেবল মাত্রাগুরুই ভোজন করেন এমন নহে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় যতটা দৈনন্দিন জুটে তাহাই উদরস্থ করেন। ইহারা কোন স্থানে ভোজনে আহূত হইলে, ভোজন সময়ে, নিমন্ত্রণ কর্ত্তার যে কোন খাদ্য কেন সংগৃহীত না থাকুক, সমুদয় একবারে উদরস্থ করিয়া লয়েন, শাক হইতে, ডাল ডালনা

মৎস্য, মাংস পোলাও খিচুরী লুচি দধি চিড়া মুড়ি মুড়কী মিঠাই মণ্ডা কত নাম করিব, কোনটিই বাদ দিতে নারাজ, যেহেতু দিবাতে আর ভোজন চলিবেনা। এবিষয়ে ভোজন দাতারও সমুদয় খাওয়াইতে পারিলেই সন্তোষ ভোজনকারীর কথা আর কি বলিব? কোনরূপ অভাব হইলে, তাহা আর নিমন্ত্রণ কি, সে ত নিত্য বাড়ীর খাওয়া। এই প্রথাটি যে অল্পদিনের এমন নহে। এখন আমরা যত প্রাচীন মনুষ্য দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেরই আহার এই নিয়মে চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতগণের যদিও আহারপ্রথা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত দেখা যায় কিন্তু স্বাস্থ্যে কি তাহারা প্রাচীনদের নিকট দাঁড়াইতে পারেন? প্রাচীনদের আহারের ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটি প্রণালীর স্বাতন্ত্র্য আছে। আধুনিকদের আবার নানাবিচার বিবেচনার মধ্যে ও একটা বিষম ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্য বিচার্য্য। একাদিত্যে (সূর্য্যাস্তের মধ্যে) এক ভোজনই হউক আর পঞ্চ ভোজনই হউক, স্বাস্থ্যের বীজ কোথায় তাহাই কি দেখা কর্ত্তব্য নহে?

আহার সম্বন্ধে একে অন্যকে বড়ই নিন্দা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। বিচার করিয়া দেখিলে কি সকলেই বিদ্রূপের পাত্র হয় না? তুমি সভ্যতাভিমানী তোমার আহার ব্যবস্থা ভাল, অমুক গাড়ো, কুকী, ভীল উহার আহার অপদার্থ। একবার চাহিয়া দেখ ও স্বাস্থ্যের অভিমান কে বেশী করিতে পারে? ঐ যে দেখিতেছ মাটি কাটিতেছে, লাঙ্গল চষিতেছে, মোট বহিতেছে ইহারা খায় কি? "গৃহস্থের ঘরে তপ্ত সবদিন রয় না" তাই ইহারা যখন যেমন জুটে তাহাই পরিতোষের সহিত উদরস্থ করে, কোন ভয় ভাবনা নাই। আর তুমি অট্টালিকায় বাস করিয়া ধনীর গরবে মানীর মানে নিত্য টাট্‌কা খুজিতেছে, কই তোমার যে নিত্য অজীর্ণ অক্ষুধা লাগিয়াই যেন রহিয়াছে, আজ একটু ভাতটা শক্ত রহিয়াছে, না খেয়েও উপায় নাই। হ'ল অসুখ। আজ দৈবাৎ বন্ধুর বাড়ী, কুটুম্বের বাড়ী অথবা উৎসব আমোদের ব্যাপারে একটু বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা কতকদ্রব্যই ঠেকিয়া খাইতে হইল। না হয় একটু সময়েরই বা ব্যতিক্রম, হইল, কি ভয়ানক! সেটুকুর ফল তুমি যাহা ভোগকর, তাহা সামলাইতে তোমাকে হয়তঃ কত ডাক্তার কবিরাজ ও পেটেণ্ট ওয়ালাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। তুমি যদি ওই চাষা

ভূখাদের মত, দীন দরিদ্রের মত, যখন যেমন বাসী, পচা, শুক্‌না কাচা, রাঁধা সকল রকম আহারে অভ্যস্থ হইতে পারিতে, তবে কি আর তোমার ঐ একটু দোষে অমন বিপদে ঠেকিতে হয়? ইহাও দেখা যায় অনেক শিক্ষিত পরিবারেও বাসীভাত ব্যঞ্জন, পচা শুক্‌না মাছ মাংস, নষ্ট দুধ, পচা মিঠাই, মণ্ডা খাইতে কিছুমাত্র শঙ্কা বোধ করে না। বাজারের পচা মাছ কি অবিক্রীত থাকে? সে সব কাহারা উদরস্থ করে? এক বেলা পাক করিয়া দু' বেলা খাওয়া ইহাত অনেক পরিবারে নিত্যক্রিয়া মধ্যে পারিগণিত। এজন্য আমরা ওরূপ খাদ্যেরই যে সমর্থন করিতেছি তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবেনা। ইহা কেবল সাধারণ দৃষ্টান্ত মাত্র। উৎকৃষ্ট আহারে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু নিকৃষ্ট আহারে ও ত অনেক জাতি পূর্ণ স্বাস্থ্যে বর্ত্তমান, আবার ভাল খাই বলিয়া যাহারা বড়াই করেন, তাহাদেরওত স্বাস্থ্য নিতান্ত হেয়। পূতি পর্য্যুষিত দ্রব্য রোগের আকর ইহা যেমন সত্য, তেমনি অভ্যাসের ফলে উহা অনেক সময় অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। মনেকর দৈবাৎ যদি নানা শ্রেণীর কতকগুলি লোককে কোন এক স্থানে এই প্রকার কুৎসিৎ পচা, বাসী, বিরস খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হয়ত প্রাণের দায়ে ঠেকিয়া করিতে হয়। যাহারা নিত্য কুৎসিত দ্রব্যাহারী বা যাহারা উহাতে অভ্যস্ত তাহারা কোন প্রকার অসুখ অসুবিধা ভোগ করে না, কিন্তু যাহাদের সেরূপ আদৌ অভ্যাস নাই, তাহাদের অনেকেই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, এমন কি মারাও পড়িতে পারে। কেবল এই অভ্যাসের দরুণই কি এক দেশের লোক অন্য দেশের অন্য রকম খাদ্য গ্রহণ করিতে নারাজ, না অন্য কারণ আছে?

তুমি আহারের নাম কোথাও সাত্বিক, রাজসিক, বা তামসিকই বল, আমি, আজ তাহা শুনিতে চাইনা, আমাকে বলিয়া দেও, কোথায় স্বাস্থ্যের বীজ দীর্ঘ জীবনের বীজ নিহিত আছে? এই যে এত ব্রত নিয়ম উপবাস, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কত বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে, সকলটার মধ্যেই খাওয়া সম্বন্ধে কত না বিধি নিষেধ আছে, সেগুলি কি কেবলই পারত্রিক ফলের জন্য না ইহা কালেরও কোন ফল আছে? লোক সকল যত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সকলই কি পরকালের জন্য করিয়া থাকে? এই যে কঠোর উপবাস, ব্রত, নিয়ম

হোম, হবিষ্য প্রভৃতি সকলের মধ্যেই ত আহার সম্বন্ধেই কেবল বিধি নিষেধ। এই সকলের সঙ্গে কি স্বাস্থ্যের বা জীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই ? যাঁহারা এ সকল অনুষ্টান করিয়া থাকেন তাহারা কি স্বাস্থ্য কথাটা একবারও মনে ভাবেন ? কিন্তু অনেকে ইহা ভাবেন বেশ জানি যে, ব্রতের কঠোরতায় প্রাণ গেলেই যেন মঙ্গল। পুণ্য হইবে, স্বর্গ হইবে, চিরশান্তি হইবে ইত্যাদি অলৌকিক অপরূপ কল্পনা! আমরা আবার আহার বিহারে যথেচ্ছাচার করিয়াও গর্ব্ব করি "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে" বস্তুত সময়২ দেখা যায়। লোক সুখাদ্য খাইয়াও অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় আবার নিত্য কুখাদ্য কদাচারীও অমর বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতেছে। আহারের ফলেই কি লোক বাচে বা মরে না ইহা ভাবুকের ভাব না প্রকৃতই আমরা আহার তত্ত্ব বুঝিনা ? আমরা বুঝি বলিয়া শ্লাঘা করি ; তাই বলি সর্ব্বেষা-মাহারমেব মূলম্" আবার বলি "আহারমেব সর্ব্বাপদাং মূলম্" কোন্ আহারে প্রাণ রক্ষা হয়, কিসে অনিষ্ট সঞ্চনয়ন করিয়া থাকে অবশ্য আমরা তাহারও একটা হিসাব রাখিয়া থাকি, সে কথাও সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা আছে। অনেক বড় বড় পণ্ডিত খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু সে কথা কয়জন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া থাকেন ? আমরা শাস্ত্র পড়ি, যত্নে লোকমত সংগ্রহ করি, কাজের বেলায় তাহার বিপরীতই প্রায় আচরণ করি। আমরা চিরাগত সংস্কার বশেই চলিতে ভালবাসি ও চলিতে বাধ্য। চিরন্তনকে কেন ছাড়িতে পারি-না, চিরন্তন যে আমাদের প্রিয় সখা। তাই বলি চিরন্তনকেই ধরিয়া থাকি কি নবীনকে আলিঙ্গন করি, এই সমস্যায়ই আমাদের জীবন কাটিয়া যাইতেছে। হে নবীন, তুমিও আমার মনোরঞ্জন প্রাণ প্রতিম। এস, তোমাদের উভয়কেই আমি আলিঙ্গন করি, তোমরাই আমার বাহুদ্বয়, নেত্রযুগল, শ্রবনপক্ষ এবং রথচক্রনেমি, তোমাদিগের চরণে প্রণিপাত হই। তোমরাই গন্তব্য পথ বাহির করিয়া দেও।

পল্লী চিকিৎসক।

সু—ঘা এর ঔষধ বলিতে থাক।

হ—শামুকে চূণ ও গব্যঘৃত সমপরিমাণে একসঙ্গে রগ্‌ড়াইলে যে মলম হয়, উহা ব্যবহারে সকলপ্রকার ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

আম্বলী পাতার উপর পিঠ ঘায়ে লাগাইলে ঘা শীঘ্র পরিষ্কার হয়। গব্যঘৃতে নিমপাতা ভাজিয়া সেই ঘৃত দিলে ঘা সত্বর শুকাইয়া যায়। বাসকপাতা ঘায়ের পরিমাণ কাটিয়া তেলাপিঠ মুখামৃত দ্বারা (থুথু) লাগাইয়া দিনে ৪।৫ বার পরিবর্ত্তন করিলে ৪।৫ দিনে নিশ্চয় পৃষ্ঠাঘাত, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি ভয়ানক ঘা আরোগ্য হয়।

কদম্ব পাতা, থানকুড়ে পাতা বা ঘা-পাতা অথবা স্থূল কমলির পাতার তেলাপিঠ ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকাইয়া যায়। বিপরীত পিঠে ঘা পরিষ্কার করে।

মনুষ্য মস্তকের খুলি বা নরদেহাস্থি গোমূত্রসহ ঘষিয়া লেপ দিলে প্রশমিত হয়। পুরাতন খুলি বা অস্থিই অধিক গুণকারী। বহু ঔষধ প্রয়োগে নিষ্ফল স্থলেও এই ঔষধ বিফলকাম হয় না।

যষ্টিমধু ও তিল পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে দূষিত মাংস দূর হইয়া ক্ষত স্থান পূর্ণ হয়।

নিমপাতা ও তিল বাটিয়া মধুসহ বা যব পেষণ করিয়া ঘৃতসহ ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

পাতাড়ীর পাতা বাঁধিয়া দিলে উরুস্তম্ভ, ওষ্ঠব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ ও বাঘী প্রভৃতি দুঃসাধ্য ক্ষতও আরোগ্য হয়।

হ—নালী ঘা—

মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র জ্বাল দিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া নালীঘাএ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শান্তি হয়।

দারুহরিদ্রা ছালের রস অগ্নিতাপে গাঢ় করিয়া মধুসহ প্রয়োগে মুখ-রোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ (নালীঘা) ভাল হয়।

শিয়ালমোত্তরা গাছের শিকর নালীতে ভরিয়া দিলে ঘা শুকাইয়া যায় এবং ক্রমশঃ শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিয়া ফেলে।

মট্কুরা (আট্কিড়া) মূলের বাকল ও আদা একত্রে বাটিয়া আইঠা কলার নরম পাতা দিয়া পট্টি দিলে সারে।

এলাইঞ্চার (হেলাঞ্চের বা হিঞ্চের) শিকড় ও ঐ শিকড়ের রস একত্র নালীঘায় দিলে আরোগ্য হয়।

মৌল্টার (পাতায় বিশেষ উগ্রগন্ধ ; গোটা হয়) শিকড় চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া উক্ত ঘৃষ্ট পদার্থে একটী গোল মরিচ ঘষিয়া ক্ষয় করিবেন। ঐ পদার্থ নালীঘায়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ চর্ম্মোপরি ৩।৪ দিন প্রলেপ দিলে বিনা যন্ত্রণায় নালী আরোগ্য হয়।

বটের আঠা গুলিয়া পিচকারী সাহায্যে অথবা অপামার্গের বীজ চূর্ণ করিয়া মাখনসহ নালীতে প্রবেশ করাইলে সত্বর আরোগ্য হয়।

কাটানটের মূল (ক্ষুদরিয়া ডাটা) অল্প আদাসহ বাটিয়া ক্ষত স্থানে পট্টি দিলে পচা মাংস দূর করিয়া যাবতীয় ঘা আরোগ্য করে।

কতকগুলি সংগৃহীত কচি নিম পাতার শির হাত বা কাঁচি দ্বারা ফেলিয়া দিয়া অল্প জলে পাতাগুলি পিষিবেন, যেন মোমের ন্যায় নরম হয়। পরে টাট্কা গব্যঘৃত উহার সহিত সংমিশ্রণ করিবেন, যেন চুয়াইয়া না পড়ে। পরে একখানা লোহার (পরিষ্কৃত) হাতায় উক্ত নিমঘৃত রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ করতঃ নালিমুখে লাগাইয়া দিবেন এবং অতি কোমল কদলী পত্রদ্বারা ঢাকিয়া কাপড়দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবেন। ইহাতে কঠিন নালী আরোগ্য হয়। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ক্ষত নীচ দিক হইতে ভরিয়া আসিয়া ক্রমে মুখ পূর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়।

আদা, কাঁচলাঘাসের মোথা (স্থল কেচলা বা মালকাক্নাড়া), হাগড়ার মোথা ও ভাঙ্গের পাতা সমভাগে জল দিয়া পিষিয়া একখানা কোমল কলাপাতা ছিদ্র ছিদ্র করিয়া তথায় এই ঔষধ রাখিবে ও অপর অংশ কলাপাতা দ্বারা ঢাকিয়া ছিদ্র অংশ সম্মুখে স্থাপন করিয়া একখানা নেকড়া দ্বারা জড়াইয়া রাখিবে। অসাধ্য নালী ঘা সত্বর এই ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

বেলের শিকড়, ছোট পিয়াজ, কলমীর ডগা, কাটানটের মূল (ক্ষুদরিয়া ডাটা) একত্রে পিষ্ট করিয়া ইহার ঠিক উপরের লিখিত ঔষধের মত নিয়মানুসারে 'ঘা'এর উপরে পটী বান্ধিলে নালী-ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

কেচ্‌লার শিকড় বা মানকচুর শিকড় পরিষ্কার করতঃ নালী মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে। রাত্রিতে এই ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয়। নালী ভিতর দিক হইতে যতই ভরিয়া আসিয়া এই শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিতে থাকে, ততই উহা একখানা কাঁচি দিয়া ক্ষত মুখের উপরে কাটিয়া দিতে হয়। ইহাতে সহজেই নালী শুকাইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, রাজাবাড়ী, ঢাকা।

বৈদ্যকগ্রন্থ বিবরণ।

৮। রস পদ্ধতি।

ও

৯। রস পদ্ধতি টীকা।

সুভিষক্‌বিন্দু রস পদ্ধতির এবং মহাদেব পণ্ডিত রসপদ্ধতির টীকাকার। রসপদ্ধতিগ্রন্থে রস ও ধাতু প্রভৃতির শোধন ও মারণাদি এবং রস ও ধাতু ঘটিত ঔষধ সহযোগে রোগ সমূহের চিকিৎসা পদ্ধতি নানা গ্রন্থ হইতে সারসংগ্রহ পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১০। বৈদ্যবল্লভ।

হস্তিরুচি, নানাগ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন পূর্ব্বক "বৈদ্যবল্লভ" প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্বরাদি সকল রোগের চিকিৎসা সংক্ষেপে প্রকটিত হইয়াছে। বৈদ্যবল্লভে মোট আট অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থ ১৭৩৬ শকাব্দে বিরচিত হইয়াছে। পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়;—

"শিশুনা হস্তিরুচিনামবৈদ্যেন রস নয়ন-মুনি-ভূবর্ষে পরোপকারায় বিহিতোঽয়ং।"

১১। ভোজন কুতুহল।

"শ্রীমদ্ বিদ্বদ্বৃন্দবন্দ্যপদারবিন্দ" অনন্তদেবের পুত্র পণ্ডিত রঘুনাথ, ধন্বন্তরিনিঘণ্টু প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক "ভোজন কুতূহল" রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ভোজনবিধি ও দ্রব্যগুণ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। ভোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভোজন-প্রিয়জনগণের রচনা পরিতৃপ্তিকর সুরসাল সামগ্রী পরিবর্ণনই, ভোজন কুতুহলের উপাদান।

১২। পরিভাষা।

পরিভাষা গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদীয় সাঙ্কেতিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইয়া থাকে। পরিমাণ, দ্রব্যের অভাবে তৎসমগুণ দ্রব্য পরিগ্রহণ, কল্ক, ক্বাথ, ঘৃত ও তৈল প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী পারিভাষাতেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নে কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ;—

"মর্দ্দিতা সমিতা (গম, আটা ইতি) ক্ষীরে নারিকেলাদিভিঃ।
অবগাহ্য ঘৃতেপক্কো ঘৃতপূরোঽয়মুচ্যতে ॥
সমিতাবেষ্টনঃ পাকে ঘনীভূতো মধূরসঃ।
মধুশীর্ষক ইত্যুক্তঃ যূষোঽয়মমৃতোপমঃ ॥
সমিতা গব্যদুগ্ধেন মোদয়িত্বা পচেদ্ঘৃতং।
মূর্চ্ছিতার্দ্রক খণ্ডৈর্ব্বা যুক্তঃ সংস্কার উচ্যতে ॥"

১৩। বিদ্যাপ্রকাশ চিকিৎসা।

ইহা "ধন্বন্তরি" নামধেয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থে দোষপ্রকোপ, নাড়ী ও মূত্রপরীক্ষা, এবং সংক্ষেপে সকল রোগের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে প্রবাদ বচনের অনুরূপ বক্ষ্যমাণ শ্লোক গুলি এস্থলে উপনিবদ্ধ করা গেল ;—

"মার্গে পৌষে তথা মাঘে আষাঢ়ে শ্রাবণে তথা।
ভাদ্রে সংজ্ঞা বিজীনায়াদ্ বাতো রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
আশ্বিনে কার্ত্তিকে মাসি বৈশাখে জ্যৈষ্ঠকে তথা।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারেণ পিত্তরাজা প্রকীর্ত্তিতঃ।

ফাল্গুনে চৈত্রমাসে তু যাঞ্চ পীতাং করোতি চ।
শীতরশ্মি সমুত্থশ্চ শ্লেষ্মা রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

"বমনং কফনাশায় বাতনাশায় মর্দ্দনং।
স্নানং পিত্তবিনাশায় জ্বরনাশায় লঙ্ঘনং॥
ন বাতেন বিনা শূলং ন পিত্তেন বিনা ভ্রমঃ।
ন কফেন বিনাচ্ছর্দ্দিরজীর্নেন বিনা জ্বরঃ॥
ন বাতেন বিনা পীড়া ন নিদ্রা রসবর্জ্জিতা।
ন পিত্তেন বিনা দাহো ন মৃত্যুঃ শ্লেষ্ম বর্জ্জিতঃ॥" (ক্রমশঃ)

২নং বালাখানা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা } শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ
কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামনি।

আহরণ।

প্রতিশ্যায় রোগের পরীক্ষিত ঔষধ।

প্রতিশ্যায় রোগকে সাধারণ কথায় সর্দ্দি রোগ বলা হয়। সর্দ্দি হইলে নাকদিয়া সর্ব্বদা জল পড়ে। মাথা ধরা, ভার বোধ ও হাঁচি হইতে থাকে, কোমরে ব্যথা, শরীরে গ্লানি প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়া কষ্ট দিয়া থাকে। যদিও সর্দ্দি একটা সাধারণ রোগ হউক কিন্তু ইহারও প্রতিকার না করিলে কিম্বা পুরাণা হইয়া পড়িলে নানাপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। এই তরুণ সর্দ্দির পরিপাক করার নিমিত্ত আজ একটি ছোট মুষ্টিযোগ ঔষধ লিখিত হইল। ইহা একটি পরীক্ষিত মহৌষধ।

আর্দ্রক (আদা) ১ তোলা, অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে, পরে তাহাতে একপোয়া দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, যখন বেশ উত্তলান আরম্ভ হইবে তখন তাহাতে দুই তোলা পরিমাণ চিনি প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে এবং উহা গরম গরম রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় পান করিবে। এইরূপ নিয়মে প্রাতঃকালেও একবার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়।

তাজা আদা না পাইলে এক তোলা শুঠী দ্বারাও উক্ত নিয়মে কাজ চলিতে পারে। একতোলা আদার রস একপোয়া দুগ্ধদ্বারা জ্বাল করিয়া চিনী মিশ্রিত করিয়া পাক করিলেও চলিতে পারে।

উপরোক্ত যোগটি তিন চার বার সেবন করিলেই সর্দ্দি পাকিয়া যাইবে এবং নাকদিয়া জল পড়া, হাঁচি প্রভৃতি বন্ধ হইবে। কফ পাক পাইয়া ২।১ দিন মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। "বৈদ্যভূষণ"

আলোচনা—

উপেক্ষিত লতাগুল্মাদি।

১। অটরুষ ও আকরোষ।—

অভিধানে দেখা যায় বাসকের একটী নাম অটরুষ। আয়ুর্ব্বেদেও যে যে স্থানে অটরুষ শব্দের উল্লেখ আছে তত্তৎস্থানে ব্যাখ্যাকারগণ বাসক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বত্র বাসক রক্ত ও শ্বেত ভেদে দ্বিবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে শ্বেত বাসক হাড় বাসক নামে প্রসিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্‌ভাবে রক্ত বাসকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং বাসক বা তৎপর্য্যায়ভুক্ত যে কোন নাম উল্লিখিত হইলে তৎস্থানে শ্বেতবাসকই ব্যবহার করিতে দেখা যায় কিন্তু প্রাচীনগণ রক্তপিত্তে বাসক স্থানে রক্ত বাসক ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, রক্তপিত্তে শ্বেত অপেক্ষা রক্তবাসকে সুফল পাওয়া যায়। শ্বেত ও রক্তবাসকের পত্রপুষ্প-ফলাদির আকৃতি এবং স্বাদ একরূপ কেবল বর্ণের পার্থক্য মাত্র। শ্বেতগুলি সর্ব্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। রক্তবাসক তদ্রূপ অনায়াস লভ্য নহে। বোধ হয় তজ্জন্য রক্তবাসকের তাদৃশ ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

পৃশ্নিপর্ণী ও সিংহপুচ্ছী একই দ্রব্যের নামান্তর। এবং গুণও এক অথচ এরণ্ড দ্বাদশকে সিংহপুচ্ছীর আকৃতি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। অন্য স্থানে পৃশ্নিপর্ণীর তদ্রূপ কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। সাধারণ পৃশ্নিপর্ণীর অপেক্ষা এরণ্ড দ্বাদশকে সিংহপুচ্ছীই সমধিক গুণবিশিষ্ট, এরূপ অনুধাবন করা অসঙ্গত নহে।

সিংহপুচ্ছীর ন্যায় শ্বেতবাসক অপেক্ষা রক্তবাসক রক্তপিত্তে সমধিক

কার্য্যকরী দেখা যায়। সুতরাং অটরুষও কোন একটী অতিরিক্ত গুণ-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

বাসকের কাণ্ড ও পত্রের ন্যায় কাণ্ডপত্র ও বৃহতীর পুষ্প ফলসদৃশ পুষ্পফল বিশিষ্ট একপ্রকার বৃক্ষ দেখা যায়। উহার পত্রাদিতে ধূলিকণার ন্যায় পদার্থ থাকে। পল্লীগ্রামে ইহাকে আকরোষ বা কাসফল বলিয়া থাকে। বৃদ্ধাগণ আকরোষ শ্লেষ্মঘটিত ব্যাধিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শিশুদিগের প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) কাসাদিতে আকরোষের ফলের মালা গলায় দিয়া থাকেন, এবং উহার পাতার রস বক্ষে কণ্ঠে মালীশ এবং মধুসহ সেবন করাইয়া থাকেন।

কফানুগত বাতে—আকরোষের পাতার রস সৈন্ধবসহ ব্যবহারে ফল-প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্বেও দেখিয়াছি অথচ আয়ুর্ব্বেদে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

একপর্য্যায়ভুক্ত হইলেও চারি প্রকার পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল বাসক বলিলে স্থল বিশেষে শ্বেত ও রক্ত উভয় প্রকার বাসকই ব্যবহার হইয়া থাকে। তদ্রূপ আকরোষও একশ্রেণীর বাসক বলিয়া অনুমিত হয়।

অটরুষ শব্দের অপভ্রংশে আকরোষ শব্দ প্রচলিত হইয়াছে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। প্রকৃত শব্দের অপভ্রংশের ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে অটরুষ শব্দের অপভ্রংশে আকরোষে পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে।

আকরোষ বাসকের তুল্যগুণবিশিষ্ট কিনা তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায় না। যেহেতু এ পর্য্যন্ত আকরোষকে রীতিমত ব্যবহার করিয়া গুণ নির্দ্ধারণ করিতে দেখা যায় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহারিক বিজ্ঞানা-লোচনায় তাদৃশ মনোযোগী এরূপ বলা যায় না।

আলোচনা করিলে অব্যবহৃত বহু দ্রব্যের ব্যবহার ও গুণাগুণ নির্ণয় হইতে পারে, আকরোষের ন্যায় বহু দ্রব্য আছে যাহা আয়ুর্ব্বেদে ধৃত হয় নাই অথবা আমরা অনবগত অথচ ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। বাল্যকালে আকরোষের উপকারিতা দেখিয়াছি। আমরা

গতানুগতিক বৃদ্ধদিগের পথাবলম্বন ভিন্ন নূতন পথ আবিষ্কারে যত্নবান নহি। সুতরাং এক্ষণে ব্যবহার করিয়া গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে অনিচ্ছুক।

নাটোর (রাজসাহী) } শ্রীকুমুদনাথ সেনগুপ্ত
ব্যাকরণতীর্থ কবিরাজ।

"বৈদ্যক-পরিমাণ-পরিভাষা।"

ধ্বংসীস্যাৎ সূর্য্যদীপ্তীক্ষিত বিধুতরজঃ সূক্ষ্মসূক্ষ্মং গবাক্ষে
ষড়্ ধ্বংসী ভির্মরীচি স্তদ্‌তুপরিমিতী রাজিকা তৎ ত্রয়েণ।
সিদ্ধার্থশ্চাষ্টভিস্তৈর্যব ইতি গদিত স্তৈশ্চতুর্ভিশ্চ গুঞ্জা
তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ মাষো জলধিভিরপি তৈষ্টঙ্ককস্তৌ চ কোলঃ ॥ ১ ॥
কর্ষঃ শুক্তিঃ পলং চ প্রসৃতি কুড়বকৌ মানিকা প্রস্থকস্তৎ-
পূর্ব্বোক্তদ্বন্দ্বতঃ স্যুঃ ক্রমশ উদধিভিঃ প্রস্থকৈরাঢ়কঃ স্যাৎ।
দ্রোণস্তৈঃ স্যাচ্চতুর্ভি র্যুগলমথ তয়োঃ সূর্পকো দ্রোণ্যমূ তদ্-
বেদৈঃ খারী তুলা স্যাৎ পলশতমপি তদ্‌বিংশতির্ভার একঃ ॥ ২ ॥
মাষষ্টঙ্কশ্চ কর্ষঃ পলমথ কুড়বঃ প্রস্থকশ্চাঢ়কশ্চ।
দ্রোণো দ্রোণী চ খারী ক্রমশ উদধিভি র্বর্দ্ধমানা ভবন্তি ॥ ৩ ॥

"বৈদ্যক পরিমাণ বাচক পর্য্যায় শব্দাঃ।"

রক্তিকা ভবতি গুঞ্জিকার্থিকা মাষ এব ননু হেমধামকৌ।
ক্ষুদ্র মোরটক কোল দ্রঙ্ক্ষণা ষ্টঙ্কশাণ ধরণানি চাপৃথক ॥ ১ ॥
কিঞ্চিদক্ষ পিচু কর্ষ তিন্দুক-পাণি পাণিতল পাণিমানিকাঃ।
ষোড়শী চ কবড়গ্রহঃ কর-মধ্য ইত্যথ তথাপ্যুড়ুম্বরঃ ॥ ২ ॥
ওতুহংস পদবৎ সুবর্ণকং শব্দপঞ্চদশকঞ্চ কর্ষকে।
স্যাৎ প্রকুঞ্চ পলবিল্ল ষোড়শী-মুষ্টিমাত্রমথবা চতুর্থিকা ॥ ৩ ॥
স্যাৎ শরাব ইব মানিকা পুন রষ্টমান কুড়বা বিবাঞ্জলিঃ।
কংস পাত্রমিব ভাজনাঢ়কং শুক্তিরষ্টমি কয়াপি সূচ্যতে ॥ ৪ ॥
রাশিরুন্মিতিরথো ঘটোহর্ম্মণো দ্রোণ এব কলসশ্চ নল্বনঃ।
কুম্ভ এব খলু সূর্পসূচকঃ বর্গ এষ পরিমাণবাচকঃ ॥ ৫ ॥

সঙ্কলিতমিদং বাঁকুড়ান্তর্বর্ত্তি-
বিষ্ণুপুরবাস্তব্য শ্রীভোলানাথ দাশ গুপ্তেন ॥

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলন, কলিকাতা।

প্রথম দিন।

৯ই জানুয়ারী, ২৫শে পৌষ, সোমবার, বেলা দুই ঘটিকার সময় :জোড়াশাঁকো-স্থিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র শীল মহাশয়ের ৮৩ সংখ্যক রাজপ্রাসাদ সদৃশ সুসজ্জিত ভবনে ষষ্ঠ বৈদ্য সম্মেলনের কার্য্য সমারব্ধ হয়। চন্দ্রাতপমণ্ডিত বিস্তৃত প্রস্তরাস্তৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে মঞ্চোপরি সভাপতি এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভাপতির সম্মুখ ভাগেই বিদেশাগত প্রতিনিধিবর্গের আসন, তৎ-পশ্চাতে বঙ্গীয় প্রতিনিধিবর্গ, প্রাঙ্গণের বাম দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত গৃহের বারেন্দায় সমাগত দর্শকবৃন্দের স্থান এবং দ্বিতলগৃহসমূহে মহিলাগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভাপতির মঞ্চের ঠিক দক্ষিণ ভাগেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গ উপবেশন করিয়াছিলেন। সভাস্থল প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজপুতানা, মালাবার, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ মালয়া, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যভারত, বঙ্গদেশ, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি নানা স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ এবং কলিকাতার সমুদয় চিকিৎসকবর্গ সভায় যোগদান করি-য়াছিলেন। এই সুমধুর সম্মেলনে স্বভাবতঃ আয়ুর্ব্বেদের প্রতি এক অভূতপূর্ব্ব অনুরাগ ও উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছে। সম্মেলনের উপস্থিত প্রতিনিধি, দর্শক, সভার সাজসজ্জা, উৎসাহ অনুরাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিরোধি জন-গণেরও চিত্তে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি স্বতঃ অনুরাগ ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রথমেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয় বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন বিরচিত এক স্বাগত সঙ্গীত গীত হইলে স্বাগতকারিণী সভার সভাপতি বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বিদ্যাভূষণ মহোদয় সুমধুর জলদগম্ভীরস্বরে নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন।

অনন্তর সভাপতি নির্ব্বাচনের লিখিত প্রস্তাব কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাচ-স্পতি মহাশয়ের পক্ষ হইতে কবিরাজ গণনাথ সেন মহোদয় পাঠ করেন। এই প্রস্তাবের অনুমোদক কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন, মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ,

শীতলচন্দ্র কবিরত্ন, গণনাথ সেন এম এ এল এম এস বিদ্যানিধি কবিভূষণ, যামিনীভূষণ রায় এম এ এম বি, কবিরত্ন, হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন—কলিকাতা; অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ—ঢাকা; বৈদ্যরত্ন আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড ভিষগ্‌মণি ডি, গোপালাচার্লু, এ-ভি-এস-এ-এম-বি—মাদ্রাজ; আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য—বোম্বাই; বৈদ্যপঞ্চানন কৃষ্ণশাস্ত্রী কবডে—পুনা; বৈদ্যপঞ্চানন জটাশঙ্কর লীলাধর ত্রিবেদী—আহম্মদাবাদ; কবিবিনোদ ঠাকুরদত্ত শর্ম্মা বৈদ্য—লাহোর; বৈদ্যরাজ ক্ষমাপতি বাজপেয়ী—লক্ষ্ণৌ; আয়ুর্ব্বেদভূষণ এম ভি শাস্ত্রী—ব্যাঙ্গালোর; বৈদ্যপঞ্চানন রাজবৈদ্য সূর্য্যনারায়ণ—ইন্দোর; হাকীম হরগোবিন্দ কবিরাজ—হায়দ্রাবাদ। প্রস্তাব অনুমোদন প্রসঙ্গে ইহাদের মধ্যে কবিরাজ গণনাথ সেন এবং ঠাকুর দত্ত শর্ম্মা হিন্দীতে, ক্ষমাপতি বাজপেয়ী সংস্কৃতে অতি সুন্দর বক্তৃতাচ্ছলে সভাপতির গুণগ্রাম, সম্মেলনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও আয়ুর্ব্বেদের মহিমাদি বর্ণন করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি রাজবৈদ্য পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম স্বামী আচার্য্য মহোদয় আসন গ্রহণার্থ দণ্ডায়মান হইলে সমবেত উপস্থিত সভামণ্ডলী উত্থান, হর্ষসূচক করতালী সহকারে অভিনন্দন করেন। এই সময় সভাপতি মহোদয় এবং প্রধান প্রধান সজ্জনবৃন্দকে পুষ্পমাল্য ভূষিত করা হয়।

সভাপতি মহোদয় আসন পরিগ্রহ করিলে দুটি বালক স্তোত্র পাঠ এবং পণ্ডিত তারাচরণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামভজন শর্ম্মা বৈদ্য, পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী মহোদয়গণ স্ব স্ব রচিত সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করেন। অভিনন্দন কার্য্য শেষ হইলে সভাপতি মহোদয় মুদ্রিত সংস্কৃত অভিভাষণ অতি সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অভিভাষণ অতি সুদীর্ঘ হইলেও শ্রুতিমধুরতা এবং জ্ঞানপূর্ণ বিষয় মাহাত্ম্যে সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। অভিভাষণ পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পর বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইয়া পরবর্ত্তী দিবসের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হয়।

অদ্যকার সভায় বহু কবিরাজ এবং নানাদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতিসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করা হয়। ইহাদের মধ্যে চিকিৎসক ব্যতীত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রাইভেট সেক্রেটারী, কৌন্সিলের সদস্য মিঃ লায়ন এবং কাশীনরেশের টেলিগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ পণ্ডিত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয় স্থানীয় এবং বিদেশীয় প্রতিনিধিবর্গকে সান্ধ্যসম্মিলনে যোগদান করার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করেন।

ইহাতে তাঁহার উদারতা এবং সজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা উভয়ই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিন।

১০ই জানুয়ারী, ২৬শে মাঘ, রবিবার, বেলা ১২টার সময় সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অদ্যও বেশ লোকসমাগম হইয়াছিল। অদ্যও নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত অনেক টেলিগ্রাম ও পত্র পাঠ করা হয়। সভাপতি মহোদয় আসন পরিগ্রহ করিলে আজ প্রায় সমুদয় সময় প্রস্তাব গ্রহণ ও অনুমোদনাদিতেই কাটিয়া যায়।

তৃতীয় দিন।

২৭শে পৌষ সোমবার। রবিবারের তুলনায় অদ্য প্রথমে তেমন লোকসমাগম না হইলেও ক্রমে ক্রমে জন সমূহের আগমনে সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছিল। অদ্য বেলা ১১টার সময় সমুদয় প্রতিনিধিবর্গের ফটো তোলা হয়, এজন্য সভার কার্য্যারম্ভ হইতে অনেকটা বিলম্ব হইয়া পড়ে। বেলা ২ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ সহানুভূতিসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ হইলে কয়েকখানি নিবন্ধ পাঠ হয়। ইহাতেই অনেকটা সময় ব্যয়িত হয়। অতঃপর প্রাণাচার্য্য পণ্ডিত বাল শাস্ত্রী লাগবনকর মহোদয় এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের শাস্ত্রীয়তা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ বিচার পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অদ্য রাত্রি প্রায় ৭॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি মহোদয়ের আমন্ত্রণে সমুদয় প্রতিনিধিবর্গ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটী গমন করায় অদ্য রাত্রিতে আর বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইতে পারে নাই। সান্ধ্য সম্মেলন প্রতিনিধিবর্গের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাতে নানা আমোদ ও জলযোগের উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছিল ; ইহা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ দিন।

অদ্য প্রাতে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয়। বেলা এক ঘটিকার সময় সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমেই সভাপতির অনুরোধ ক্রমে বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ সেন মহোদয় সহানুভূতিসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করেন। পত্র ও টেলিগ্রামের সংখ্যা আজও যথেষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাব, নাটোরের মহারাজা, জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই পুনার প্রসিদ্ধ বৈদ্য প্রাণাচার্য্য বাল শাস্ত্রী লাগবনকর মহোদয় হিন্দী ভাষায় এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। অনন্তর আরও ২।১ জনের বক্তৃতার পর পূর্ব্ব দিনসের তর্কিত ১৪শ প্রস্তাবটি

সংশোধিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের ব্যয়ে বৈদ্য-সম্মেলন নামে যে পত্রিকা হিন্দীতে বাহির হইতেছে উহা অতঃপর অর্দ্ধেক হিন্দী ও অর্দ্ধেক সংস্কৃতে বাহির হইবে। প্রস্তাবের অন্যান্য অংশ পূর্ব্ববৎ ঠিক রহিল।

আয়ুর্ব্বেদ মার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য প্রস্তাব করেন যে, আয়ুর্ব্বেদের সমুদয় দেশে এক ওজন নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। এতদর্থে ১৫ জন বৈদ্য লইয়া এক কমিটি গঠিত হউক। উক্ত কমিটি ছয় মাস মধ্যে প্রস্তাবিত বৈদ্যগণের মতামত সংগ্রহ করতঃ নিজ মন্তব্যসহ আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের নিকট প্রেরণ করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল সদস্যগণের বিচার ফল আগামী মহাসম্মেলনে উপস্থিত করিবেন। শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন ইহার সমর্থন এবং আর কয়েক জন ইহার অনুমোদন করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

হায়দ্রাবাদের বৈদ্যরাজ হরগোবিন্দ মহোদয় প্লেগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর কবিরাজ গণনাথ সেন অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ অস্ত্র প্রদর্শন ও বন্ধনাদি প্রয়োগ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দেন। ইঁহার ব্যাখ্যান সকলেরই বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্র চিকিৎসার যেরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহাতে এইরূপ ব্যাখ্যান যথেষ্ট সময়োপযোগী হইয়াছে।

উপসংহারে সমাগত প্রতিনিধি এবং সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদান্তে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। সভার উপসংহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহামণ্ডলের কার্য্যের জন্য সভাস্থলেই প্রায় তিন শতাধিক মুদ্রা দান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সম্মেলনের কার্য্য যথাযথ সুনির্ব্বাহ হইয়াছে বলা যায়। সম্মেলন সংশ্লিষ্ট বিরাট আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনীও বেশ শিক্ষাপ্রদ এবং মনোরম হইয়াছিল। আমরা উত্তরোত্তর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। আগামী বারে এই মহাসম্মেলন মান্দ্রাজ নগরীতে সম্পন্ন হইবে। মান্দ্রাজের বিখ্যাত পণ্ডিত ডিঃ গোপালা চার্লু মহোদয় সম্মেলনকে তথায় আহ্বান করিয়া যথেষ্ট ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা মান্দ্রাজের অধিবেশনে অধিকতর কার্য্যতৎপরতা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

সভাস্থলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

১। সম্প্রতি য়ুরোপখণ্ডে ন্যায়ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে মহাসমর চলিতেছে তাহাতে এই বৈদ্য-সম্মেলন আমাদিগের মহামান্য সম্রাট্ শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের বিজয় কামনা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেছে।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

২। এক বৎসরের মধ্যেই সর্ব্বজনপ্রিয় মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং মহোদয়ের পত্নী বিয়োগ এবং য়ুরোপীয় মহাসমরে প্রবৃত্ত প্রিয় পুত্রের বিয়োগে এই সম্মেলন গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

৩। নিম্নলিখিত মহোদয়গণের পরলোকগমনে আয়ুর্ব্বেদের বহুল ক্ষতি হইয়াছে। এ জন্য এই সম্মিলন গভীর শোক এবং স্বর্গস্থ মহাত্মগণের পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। (১) পণ্ডিত ত্র্যম্বকগুরুনাথ কালে রসায়নাচার্য্য—(পুনা) (২) বৈদ্যরাজ পণ্ডিত বিষ্ণু কৃষ্ণ পুরাণিক—(পনবেল) (৩) বৈদ্যনাথ শর্ম্মা রাজবৈদ্য—(প্রয়াগ) (৪) পণ্ডিত গণপতি শর্ম্মা—(রাবলপিণ্ডী) (৫) প্রাণাচার্য্য গোপাল রাও বিবলকর—(নাসিক ; (৬) কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেন—(৭) কবিরাজ রেবতী কান্ত রায় চৌধুরী—(টাঙ্গাইল) (৮) বাবু রাজকুমার সরকার—(রাজসাহী) (৯) পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ রাজবৈদ্য—(ত্রিপুরা) (১০) কবিরাজ রাধিকানাথ রায়—(শ্রীখণ্ড) (১১) কবিরাজ আনন্দচন্দ্র সেন কবীন্দ্র—(বিক্রমপুর) (১২) কবিরাজ জয়কুমার ভট্টাচার্য্য রাজবৈদ্য—(ত্রিপুরা) (১৩) পণ্ডিত মুকুন্দ রায় জোশী—(কাশীপুর, তরাই) (১৪) মনীষ সমর্থদান—আজমীর, (১৫) শেঠ মাণিকচাঁদ হীরাচদাদ—বম্বে, (১৬) পণ্ডিত ভৈরবপ্রসাদ পাণ্ডে—লক্ষ্ণৌ।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

৪। এই সম্মেলন পণ্ডিত টী, পরমেশরনমুব (তৃপ্যাংগোড়) কোডাকল, মালাবার, মহোদয়ের "বৈদ্যরত্ন" উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

৫। ম্যালেরিয়া কমিশনের ডিষ্ট্রীক্ট কমিটিতে কবিরাজ হরিরঞ্জন মজুমদার—কাশী, শিবরাম পাণ্ডে বৈদ্য—প্রয়াগ, চিকিৎসকচূড়ামণি জ্ঞানসিংহজী বৈদ্যরাজ—আগরা। মহোদয়গণের স্থান লাভে এই সম্মেলন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং সদাশয় গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন—কলিকাতা, সমর্থক—বৈদ্যরাজ কল্যাণসিংহ—আজমীর, অনুমোদক—পণ্ডিত হরিপ্রসাদ মিত্র—বহরানপুর।

৬। বেহার গবর্ণমেণ্ট পুরী ও মজফরপুরে প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে আজ্ঞা দিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহাতে জনসাধারণের অত্যন্ত অভীপ্সিত আয়ুর্ব্বেদ

চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি হইবে—এজন্য এই সম্মিলন বেহার গভর্ণমেণ্টকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল—প্রয়াগ, সমর্থক—পণ্ডিত ব্রহ্মদেব নারায়ণ মিশ্র—আরা, অনুমোদক—পণ্ডিত সূর্য্যপ্রসাদ বাজপেয়ী—উনাও, পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী—জব্বলপুর, কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—কলিকাতা।

৭। গত ১৪ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে মান্দ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আয়ুর্ব্বেদের উত্তেজনাকল্পে মাননীয় কৃষ্ণ স্বামী আয়ার মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের উত্তরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে জরাজীর্ণ, অবৈজ্ঞানিক গুপ্তবিদ্যাপূর্ণ ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক শব্দের প্রয়োগ করিয়া যে আক্ষেপ করা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত বৈদ্য মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এজন্য এই সম্মিলন অতি বিনীতভাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন এবং আজও শতকরা প্রায় ৮০ জন ভারতবাসী আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হইতেছেন, এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত কৃষ্ণ স্বামী কবড়ে। সমর্থক—পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত—লাহোর, পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল—প্রয়াগ, কবিরাজ সতীশচন্দ্র ভীষক শাস্ত্রী।

পণ্ডিত ডি, গোপাল চালুর যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদে প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হইল।

৮। এই সম্মেলন কলিকাতা, লাহোর ও কাশীর সংস্কৃত বোর্ডের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন যে, বেহার গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তাহারাও নিজ নিজ শিক্ষাবিভাগে কাব্যাদি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদকেও স্থান দান করেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত আপ্পা শাস্ত্রী শাঠে (বম্বে) সমর্থক—পণ্ডিত রামেশ্বর মিশ্র (কানপুর) অনুমোদক—কবিরাজ মতিলাল দাশ (বরিশাল) পণ্ডিত অযোধ্যা প্রসাদ (ঝাঁসী) শ্রীযুক্ত এম, ভি, শাস্ত্রী ম্যাঙ্গালোর)।

৯। ভারতীয় প্রজাবর্গের অধিকাংশ অদ্যাবধিও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর অধীন হাসপাতাল সমূহে অথবা স্বতন্ত্রভাবে বৈদ্যদিগকে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সম্মেলনে গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিঠির নিকট অনুরোধ করিতেছে।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত জটাশঙ্কর লীলাধর ত্রিবেদী (আহম্মদাবাদ), সমর্থক—কবিরাজ যামিনীরঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ (কলিকাতা), অনুমোদক—পণ্ডিত রামভজন শর্ম্মা (জব্বলপুর)।

১০। আয়ুর্বেদোক্ত ভৈষজ্য দ্রব্যের মধ্যে যে যে গুলি বর্ত্তমান কালে সন্দিগ্ধ অনুমিত হয়, তাহা নির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক। এই বিষয়ের মীমাংসা সম্পাদন করিবার জন্য পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজীর প্রার্থনানুসারে এই সম্মেলন তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তীয় বৈদ্য ও বিদ্বমহোদয়গণের নিকট হইতে সন্দিগ্ধ ভৈষজ্যের এক সূচী সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সন্দিগ্ধ দ্রব্যের একটি সম্পূর্ণ সূচী সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিবেন এবং আগামী সম্মেলনের অধিবেশনে তাহা উপস্থিত করিবেন।

প্রস্তাবক—গণনাথ সেন (কলিকাতা) সমর্থক—বৈদ্যরত্ন ডিঃ গোপালাচালু (মান্দ্রাজ) অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মোহনলাল জৈন (প্রয়াগ) পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা (মথুরা) কবিরাজ সতীশচন্দ্র ভিষকশাস্ত্রী কবিরাজ বালিকা প্রসাদজী (রেওয়া)।

১১। আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য এক বিশাল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য সম্মেলনের প্রত্যেক সভ্যকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা সকলেই এই উদ্দেশ্যে স্ব স্ব প্রান্তে এক একটি কমিটি নির্দ্ধারিত করিবার ও যথা সাধ্য অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রযত্ন করেন।

প্রস্তাবক—বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডিঃ গোপালাচালু (মান্দ্রাজ) সমর্থক—কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম্, এ এম্ বি, (কলিকাতা) অনুমোদক—কবিরাজ হরগোবিন্দজী হাকিম (হায়দ্রাবাদ), পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত শর্ম্মা (লাহোর), পণ্ডিত আপ্পা শাস্ত্রী (বম্বে) পণ্ডিত সূর্য্য নারায়ণজী (ইন্দোর), কবিরাজ অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী (ঢাকা), হেমচন্দ্র সেন কাব্যতীর্থ (ঢাকা), পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর মিশ্র (প্রয়াগ)।

১২। বৈদ্যপঞ্চানন পণ্ডিত জটাশঙ্কর লীলাধর ত্রিবেদী মহাশয় বৈদ্যসম্মেলনের আজ্ঞানুসারে যে বৈদ্যডাইরেক্টরী প্রস্তুত করিতেছেন তাহাতে যথা সাধ্য সাহায্য করিবার জন্য প্রাদেশিক সম্পাদকগণ এবং বৈদ্যসম্মেলনের সহিত সম্বন্ধ সভা সমূহকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শর্ম্মা (আলীগড়), সমর্থক—কবিরাজ তারাচরণ চক্রবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী (কলিকাতা)। অনুমোদক—পণ্ডিত শিবদত্ত বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা), কবিরাজ কুঞ্জনাথ মজুমদার কাব্যভূষণ (বরিশাল)।

১৩। বৈদ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রচারিত করিবার জন্য এবং নিজ নিজ উপকারের জন্য প্রত্যেক প্রান্তে প্রান্তিক সম্মেলন হওয়া আবশ্যক। এইরূপ প্রান্তিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন বৈদ্য সম্মেলনের অধিবেশনের অন্যূন দুই

মাস পূর্ব্বে হওয়া আবশ্যক এবং তাহাতে তত্তৎপ্রান্তীয় বৈদ্য মহোদয়গণের অভি-প্রায় সংগ্রহ করিয়া সম্মেলন কার্য্যালয়ে প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাবক—কবিরাজ সুধাংশুভূষণ কাব্যতীর্থ বাচস্পতি (ঢাকা)। সমর্থক—পণ্ডিত রামনারায়ণ শাস্ত্রী (কলিকাতা। অনুমোদক—বৈদ্যরাজ সমাদরী লালজী (লাহোর), পণ্ডিত বামন শাস্ত্রদাতার (নাসিক), পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা (দানাপুর), পণ্ডিত হরিশঙ্কর শর্ম্মা (আলীগড়), কবিরাজ গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ বাজিতপুর, (ময়মনসিংহ), পণ্ডিত কমলাপতি বাজপেয়ী (লক্ষ্ণৌ।

১৪। বৈদ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিবরণ প্রচারের জন্য বৈদ্য সম্মেলন পত্রিকা ত্রৈমাসিকের পরিবর্ত্তে দ্বৈমাসিক করিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হউক এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি পত্রিকাকে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় মহামণ্ডলের মুখপত্র নির্দ্ধারিত করা হউক। এই উদ্দেশ্য অনুসারে বঙ্গ-ভাষায় "আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ", গুজর ভাষায় "বৈদ্যকল্পতরু", মহারাষ্ট্র ভাষায় "আয়ু-র্ব্বেদ" দ্রাবিড়, (তামিল) ভাষায় "বৈদ্যকলানিধি", তেলুগু ভাষায় "আয়ুর্ব্বেদ", উর্দ্দু ভাষায় "দেশোপকারক", কানাড়ি ভাষায় "বৈদ্যসিন্ধু ও হিন্দী ভাষায় সুধা-নিধি বৈদ্য সম্মেলনের মুখপত্র নির্দ্ধারিত হউক।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত কৃষ্ণ শাস্ত্রী কবরে বি, এ, পুনা। সমর্থক—কবিরাজ সুরেশ-চন্দ্র সেন নওগাঁ, রাজসাহী। অনুমোদক—কবিরাজ নরেন্দ্রচন্দ্র দাস ভিষগরত্ন ঢাকা। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর আচার্য্য কাশী। কবিরাজ মনোমোহন সেন কবিরত্ন ঢাকা।

সংবাদ।

স্বাস্থ্য প্রদর্শনী।—আগামী ১লা মার্চ্চ তারিখে বরোদারাজ্যে একটি স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে একটি চিত্রশালাও খোলা হইবে বরোদারাজ্যের প্রজাপুঞ্জ প্রদর্শনী ও চিত্রশালা দেখিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যাহাতে উপকৃত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যেই বরোদার মহারাজ সায়াজী রাও গায়কোয়াড় মহোদয় এই শুভানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। এই অনুষ্ঠানটি এদেশে নূতন। মহারাজা সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যেই অগ্রণী। এরূপ অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বত্র অনুকরণীয়। স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা এ দেশের লোকে একেবারে ভুলিতে বসিয়াছে। সকল শিক্ষার অগ্রেই যে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যেক দেশের লোককে ইহার অনুকরণ করিতে দেখিলে সুখী হইব।

প্রয়াগ-তৃতীয় সমগ্র ভারতীয় বৈদ্য সম্মেলনের সভাপতি,

"প্রত্যক্ষ শারীরম্" "সিদ্ধান্ত নিদানম্" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের প্রণেতা
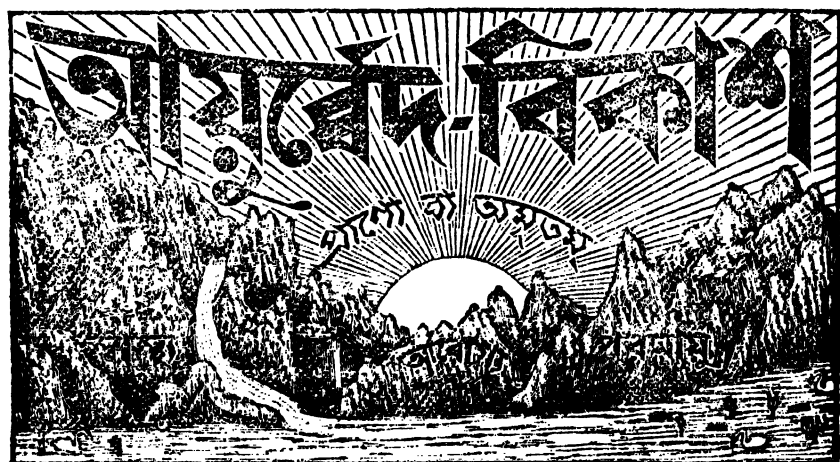
"বৈদ্যাবতংস"

কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস,

বিদ্যানিধি, কবিভূষণ।

B. N. P. DACCA.

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক

মাসিক পত্র।

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্ ;

আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥"

(বাগ্ ভট।)

কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভুষণ সেন কাব্যতীর্থ, বাচস্পতি

সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল।

"আর্য্য ভৈষজ্য নিকেতন"

ঢাকা।

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩২২।

আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ কার্য্যালয়—পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আয়ুর্বেদ বিকাশ

দ্বিতীয় বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

"প্রাণো বা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকামযমানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্ ।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥ বাগ্‌ভট ।

২য় বর্ষ } ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২১ { ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা।*

মহর্ষি মনু বলেন, "আরোগ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থা শ্চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষঃ ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥"

সত্যযুগে মানবের পরমায়ু চারিশত বৎসর ছিল এবং তাঁহারা সিদ্ধকাম ও নীরোগ ছিলেন। ত্রেতাদি যুগে ইহাদের আয়ুর এক এক পাদ হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ ত্রেতায় তিনশত বৎসর দ্বাপরে দুইশত বৎসর হইয়া কলিতে এক শতবৎসর পরমায়ু দাঁড়াইয়াছে।

"শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ, শতং জীবতু" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা ও কলিযুগে মানুষের শত বৎসর পরমায়ু প্রমাণিত হইযাছে।

মহর্ষি চরকবলেন "বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন কালে" এই কলি-কালে মানবের পরমায়ুর পরিমাণ একশত বৎসর। মাধব নিদানে "বীতরোগাঃ সমাঃ শতং" বিজয়রক্ষিত এই শ্লোকের টীকায় বরাহসংহিতার "সমাঃ ষষ্ঠি দ্বিঘ্না মনুজকরিণাং পঞ্চচ নিশাঃ" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানবের পরমায়ু একশত বিশ বৎসর পাঁচদিন। খনার বচনে আছে,
"নরা গজা বিশে শত তার অর্দ্ধ ঘোড়া রয়"

* কলিকাতা বৈদ্য সম্মেলন উপলক্ষে লিখিত।

হাতী ও মানুষের আয়ু একশত বিশ বৎসর, ঘোড়ার আয়ু তাহার অর্দ্ধ। উক্ত সমস্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে মানবের স্বাভাবিক আয়ু একশত কিম্বা একশত বিশ বৎসর।

কি কারণে আমাদের আয়ু স্বাস্থ্য বলবীর্য্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে তাহা আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিতেছিনা, চিন্তা করার প্রয়োজন ও মনে করিতেছিনা। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, পিতামহের আয়ু স্বাস্থ্য বল বীর্য্যাদি পিতা পাইতেছেন না, আবার পিতার আয়ু বল বীর্য্যাদিও পুত্র পাইতেছেন না, এইভাবে ক্রমে ক্রমে যে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, দিন দিন যে ক্ষীণকায় হীনায়ু অসার অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছি, কিছুতেই যে আমরা বর্ত্তমানে কালোক্ত আয়ু বল বীর্য্যাদি লাভ করিতে পারিতেছি না, একশত বৎসরের পরিবর্ত্তে অষ্টপ্রহর অস্বাস্থ্য, ক্ষীণতা, দুর্ব্বলতা, মলিনতার ভার অঙ্গে বহন করিয়া ঊর্দ্ধসংখ্যা পঞ্চাশ কি ষাট বৎসরেই যে মানব লীলা শেষ হইতেছে; ইহার প্রধান কারণই আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। মহর্ষি চরক সূত্রস্থানের ১১ অধ্যায়ে বলিয়াছেন "ত্রয় উপস্তম্ভা ইত্যাহারঃ স্বপ্নো ব্রহ্মচর্য্যমিতি"। আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটী শরীরের স্তম্ভ স্বরূপ, অর্থাৎ স্তম্ভ যেরূপ গৃহাদিকে ধারণ করিয়া রাখে, আহার নিদ্রার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যও সেইরূপ দেহকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। আহার নিদ্রার অভাবে মানবগণ যেরূপ সমস্ত শক্তি হারাইয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেও ঠিক ঐরূপ ফল দাঁড়ায়। চরক স্থানান্তরে বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যাণাং" জগতে আয়ুর হিতকর যত কিছু আছে ব্রহ্মচর্য্য তাহার মধ্যে সর্ব্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ স্থানান্তরে বলিয়াছেন,

আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানামবিধারণম্।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসাচ সাহসানাঞ্চ বর্জনম্॥

আহার্য্য বস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে ভোজন করা, মলমুত্রাদির বেগ ধারণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, অহিংসা ও দুঃসাহসের পরিবর্জ্জন, এগুলি আয়ু বৃদ্ধির মূল কারণ।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠায়

কায়িক মানসিক শক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য কর্ত্তব্য শুক্রধারণ, পবিত্র আহার বিহার তাহার অনুকূলক মাত্র।

শুক্র সমস্ত ধাতুর সার এবং শুক্রই দেহের মূলভিত্তি, এই শুক্রের রক্ষায় জীবন রক্ষা হয়, দেহের কান্তি পুষ্টি তেজঃ বিক্রম বৃদ্ধিপায়, মন প্রফুল্ল হয় ও বুদ্ধি স্মৃতি প্রীতির উদয় হয়, শুক্রের নাশে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য শিবসংহিতা বলেন, "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারনাৎ!" বিন্দুপাতে অর্থাৎ শুক্রক্ষরণে মৃত্যু হয়, আর শুক্রধারণে জীবন লাভ হয়।

তরুণ বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি বাহির হইবার সময় তাহাকে শত বিক্ষত করিয়া রস বাহির করিলে তখনই সে মরিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ না মরিলেও সে আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিছু দিন জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়া আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়। সেইরূপ প্রথম বয়সে, দেহ মনের পুষ্টি লাভের সময় সমস্ত ধাতুর সারভূত শুক্রের ক্ষয় হইলে সে কখনও পুষ্টিলাভ কিংবা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না। এই কারণে প্রাচীন আর্য্যগণ শিক্ষার সময়, দেহ মন চরিত্র গঠনের সময় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। তাহারা পাঠদ্দশায় শুক্রধারণ করিয়া পবিত্র আহার বিহারে কাল যাপন করিতেন। কৌপীন কিংবা সামান্য বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক এক বেলা মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। বেশ বিলাসিতার নামগন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহারা জানিতেন না, কুচিন্তা কুভাবনা কখনও তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। তাঁহারা সর্ব্বদা সংযমী হইয়া সত্যপথে শাস্ত্র চিন্তায় কাল যাপন করিতেন। আর আজকাল শিক্ষার সময়, চরিত্র গঠনের সময়, ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছচর্য্যের অভ্যাস হইতেছে। আহার বিহারে কিছুমাত্র পবিত্রতা রক্ষা হইতেছে না, বেশ বিলাসিতার মাত্রা দিন দিন শত সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে, ছেলেদের খাদ্য পোষাক পরিচ্ছদের চটকে দরিদ্র অভিভাবকের অনির্ব্বচনীয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা ছাত্রগণকে সত্য যুগের পোষাক পরিয়া স্কুলে উপস্থিত হইতে বলিতেছি। আমাদের সেরূপ অভিপ্রায় নহে, তাহা কখনও সম্ভব পরও নহে। আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি,

কোথা হইতে কোথায় পতিত হইয়াছি, তাহার একটু নমুনা প্রদর্শনের জন্যই এসকল কথা বলিতেছি।

আজ কাল শুক্রধারণ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। কারণ ছাত্রাবস্থায় অনেকেই ৫।৬টী পুত্র কন্যার মুখ দর্শন করিয়া থাকেন। যাহাদিগকে শৈশবে বিবাহ বাজারে বিক্রয় করিয়া পড়ার খরচ চালান হইয়া থাকে তাহারা প্রায়ই ছাত্রাবস্থায় পুত্র কন্যা রূপ জালে জড়িত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া থাকেন।

এদিকে ছাত্র জীবনে নীতি শিক্ষা নাই, সামাজিক শাসন নাই, ধর্ম্ম কিংবা ঈশ্বর বিষয়ের বিন্দুমাত্র চর্চ্চা আলোচনা নাই, পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণেরও এসকল বিষয়ে তত দৃষ্টি নাই, এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে মুক্তক্ষেত্রে যথেচ্ছরূপে বিচরণ করিতে থাকেন। চারি দিকে বাই খেমটা থিয়েটার প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভনের সীমা সংখ্যা নাই। এদিকে অবারিত দ্বার, সুতরাং অনেকে মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবৈধ উপায়ে কিংবা কুৎসিত স্থানে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। এই কুক্রিয়ার ফলে অনেক স্থলেই আমরা অল্পবয়সে ইন্দ্রিয় শিথিলতা, স্বপ্নদোষ, মস্তকঘূর্ণন, অগ্নিমান্দ্য, স্মরণশক্তির লোপ, দৃষ্টি হীনতা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি দেখিতেছি। ইহার সঙ্গে প্রমেহ উপদংশেরও ক্রমে ক্রমে প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুইটী রোগ স্বামীর থাকিলে স্ত্রীর, স্ত্রীর থাকিলে স্বামীর এবং উভয়ের শুক্রশোণিতের দোষ পুত্র পৌত্রাদির শরীরে সংক্রমিত হইয়া এক এক বংশকে অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত করিতেছে। উপদংশরোগীর সন্তান প্রায়ই জীবিত প্রসূত হয় না, হইলেও কেহ বিকৃতাঙ্গ, কেহ অন্ধ কেহ বা স্ফুটিতাঙ্গ হয়। এইভাবে বিকৃত সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং উহারা দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। শুক্রধারণের অভাবে আমরা নানাদিক দিয়া আয়ু স্বাস্থ্য বল বীর্য্য হারাইতেছি। অপিচ। আমাদের এই ভাবেই যে কেবল এরূপ দশা ঘটিতেছে তাহা নয়, ভিন্ন রূপেও আমরা পুত্র পৌত্রাদির সহিত হীনাবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। সুশ্রুত মুক্তকণ্ঠে বলেন,—

ঊন ষোড়শ বর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চ বিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।

পুরুষ পঁচিশ বৎসরের ন্যূনে ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীতে যদি গর্ভাধান করে তবে সেই সন্তান উদর মধ্যেই জীবন বিসর্জন করে। জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলেও সে অধিক দিন বাচে না, কিছু দিন বাচিয়া থাকিলেও সে কখনও সবলেন্দ্রিয় হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের অপালনে বাল্য-বিবাহে আমাদের নিজের জীবন নাশ এবং পুত্র পৌত্রাদির জীবন নাশ ঘটিতেছে। পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব থাকিলে কিছুতেই আমরা ঈদৃশ হীনায়ুঃ ক্ষীণকায় অসার অপদার্থ হইয়া পরিতাম না।

এখনও যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে নিরত আছেন, তাঁহারা বল বীর্য্য স্বাস্থ্য লাভ করিয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতেছেন। আমাদের দেশে আর্য্যবিধবাগণ ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ বটে। বিধবারা অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন "বিধবার মৃত্যু নাই।" বস্তুতঃও একথাটা যেন ধ্রুব সত্য, আমরা শতশত স্থানে পরীক্ষা করিয়াছি, সধবা অবস্থায় যাঁহারা নিত্য রোগিনী, নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে যাঁহাদের জীবনতরি ডুবু ডুবু, বহু চিকিৎসায় বহু স্থান পরিবর্ত্তনে ও যাঁহাদের কিছুমাত্র ফল হয় না তাঁহারা বিধবা হওয়ার অব্যবহিত পরেই যেন নব জীবন প্রাপ্তা হন। বিধবাদের সমস্ত রোগ বিদুরিত হয়, কান্তি পুষ্টি আসিয়া তাঁহাদের দেহে প্রবেশ করে এবং তাঁহারা দীর্ঘজীবন ধারণ করিয়া থাকেন। বিধবাদের আহার বিহারে কিছু মাত্র পারি পাট্য নাই, শারীরিক শ্রমও তাঁহাদের যথেষ্ট করিতে হয়, তথাপি একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের বলে তাহারা সমস্ত রোগ ও মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যকে যমও যেন ভয় করিয়া চলে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য কর্ত্তব্য শুক্রধারণ, পবিত্র আহার বিহার তাহার অনুকূলক মাত্র। সুতরাং বলিতে গেলে শুক্র ধারণের নামই ব্রহ্মচর্য্য। এই শুক্র রক্ষার জন্য মহর্ষিদিগের কত

তীব্রদৃষ্টি ছিল এবং এবিষয়ে তাঁহারা কত উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিলে প্রকাণ্ড একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে। আমরা সংক্ষেপতঃ এবিষয়ে ২।১ টি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। পূর্ব্বকালে ছাত্রাবস্থায় সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন, তৎপর উপযুক্ত বয়সে গুরুকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে দার পরিগ্রহ করিতেন। শাস্ত্র বলেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সুতরাং এই দার পরিগ্রহ পুত্রের জন্য' ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থের জন্য নহে, অবশ্য যাহারা তত সংযমী নহেন তাহাদের, স্ত্রীসহবাসের কালাকাল ও অবস্থাবিচার আছে। মহামতি সুশ্রুত বলেন,

ত্রিভি স্ত্রিভি রহোভিশ্চ রময়েৎ প্রমদাং নরঃ।
সর্ব্বেষৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎ পক্ষাৎ ব্রজেদ্বুধঃ॥

সমস্ত ঋতুতে তিন তিন দিন পরে স্ত্রী সহবাস করিবে; কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে এক এক পক্ষপরে স্ত্রীসহবাস কর্ত্তব্য। পর্ব্বদিনে সন্ধ্যাগমে দিবাভাগে প্রত্যূষে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। রজঃস্বলা, পীড়িতা, মলিনা, গর্ভিনী প্রভৃতি স্ত্রী পুরুষ সহবাসে বর্জিতা। সুশ্রুত বলেন, যাহারা উক্ত সকল স্ত্রীতে উপগত হয় তাহাদের ভ্রম, ক্লান্তি, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, বলক্ষয়, ধাতুক্ষয় ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিক্ষয় হয়, এবং অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে বহু সময় বহু অবস্থাতেই স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্ত্রী সম্ভোগ বিষয়ে যিনি যত সংযমী তিনি সেই পরিমাণ আয়ুঃস্বাস্থ্য বল বীর্য্যাদি লাভে অধিকারী। সুশ্রুত বলেন,

স্মৃতি মেধায়ুরারোগ্য পুষ্টীন্দ্রিয় যশোবলৈঃ।
অধিকা মন্দরজসো ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥

যাহারা স্ত্রী সম্ভোগে সংযত, তাহারা স্মৃতি মেধা আয়ুঃ আরোগ্য পুষ্টি ইন্দ্রিয় শক্তি যশঃ ও বল দ্বারা অধিক বলীয়ান্ হইয়া থাকেন এবং তাহাদের রজোগুণ মন্দীভূত হয়। ভাব প্রকাশ বলেন,

আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্বর্ণবলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥

যাহারা স্ত্রী সম্ভোগে সংযত তাহাদের শরীরে সহজে জরা প্রবেশ করিতে পারে না, এবং তাহারা সুন্দর বর্ণ, সুগঠিত শরীর ও বলশালী হইয়া দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া থাকে। এবং তাহাদের শরীর উপচিত ও স্থির হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যে আয়ুঃ স্বাস্থ্য বল বীর্য্য স্মৃতি মেধা কীর্ত্তি সুখ শান্তি সমস্ত রক্ষা হয়, আর তাহার অভাবে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। অপিচ, ব্রহ্মচর্য্যে সাত্ত্বিক আহার বিহার অবলম্বন করিতে হয়, আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিতে হয়, এই আহার বিহারের গুণেও মানব স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারে।

আমরা আমাদের দেহের গঠনপ্রণালী ও ব্যবহার প্রণালী অবলোকন করিলে উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের আমিষ ভোজন যেন প্রকৃতির অনুমোদিত নহে।

আমিষভোজী বিড়াল কুকুর ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ চাটিয়া জলখায়, আর নিরামিষভোজী গো, গর্দ্দভ, ঘোটক, হস্তী, মেষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুগণ চাটিয়া জল খায় না, মুখদিয়া টানিয়া জল খায়। আমিষ ভোজী ব্যাঘ্রাদি জীবের দন্ত তীক্ষ্ণাগ্র, আর নিরামিষভোজী গো গর্দ্দভাদির দন্ত স্থূলাগ্র। আমিষ ভোজী জন্তুর অন্ত্র (আঁত) খর্ব্ব, আর নিরামিষ ভোজী জীবের অন্ত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

এই হিসাবে মানুষ নিরামিষভোজীর দলে বিভক্ত। মানুষে জল চাটিয়া খায়না, মানুষের দন্ত তীক্ষ্ণাগ্রও নহে, মানুষের অন্ত্র বৃহৎ, সুতরাং মানুষের পানীয় নিয়ম ও দৈহিক গঠন ঠিক নিরামিষ ভোজী দিগের অনুরূপ।

এইজন্যই মানবের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থেয়। তথাপি মানব প্রকৃতির প্রতিকূলে আমিষ ভোজন করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সমস্ত শক্তি হারাইয়া অকালে জীবন বিসর্জন করিতেছে।

আমিষ ভোজন যে মানবের স্বাস্থ্যকর নহে, সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহর্ষি-দিগের আবিষ্কৃত এই সত্য আজ কাল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও উপলব্ধি করিয়াছেন।

তাঁহারাও আজ কাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, আমিষভোজন

অপেক্ষা দুগ্ধ ঘৃত ফল মূল প্রভৃতি নিরামিষ ভোজন শ্রেষ্ঠ। ইহাতে মানবের দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয় এবং বল বীর্য্য স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় থাকে।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত অংশই আমাদের মঙ্গলকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মচর্য্যে সাত্ত্বিক আহার বিহারের গুণে ক্রমশঃ মানবের রজস্তমোগুণ দূরীভূত হয় ও সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হইতে থাকে। যখন ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় তিনি তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের সোপানে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহার হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য্যের সোপানে আরোহণ না করিয়া অধ্যাত্ম জগতেও কেহ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মচর্য্য আমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয় জীবনেই পরম বন্ধু। এই পরম বন্ধুকে অগ্রাহ্য করাতেই আমাদের সিংহের কুল ক্রমে পিপীলিকার পালে পরিণত হইতেছে।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র সেন কবিরত্ন।
ময়মনসিংহ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ।

২। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ—

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলেও প্রথম কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। অনেকেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ গাইতে গিয়া অনেক অসম্ভব অনাবশ্যক অবান্তর বিষয়েরও সমাবেশ করিয়া গুরুকেও লঘু করিয়া ফেলেন, ইহা তাঁহারা যেন বুঝিতেই পারেন না। প্রকৃত বর্ণনায়ই বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়া উঠে। যদিও কোন লুপ্ত বস্তুকে বা অনাদৃত বস্তুকে প্রথম প্রথম দাঁড় করাইতে কিছু অত্যুক্তি ও উদ্দীপনাকারিণী ভাষার আবশ্যক হয়, তাহারও মাত্রা এবং ক্রম আছে, তাহার বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। নিজের জিনিষ সকলেই বড় দেখে এবং ভালবাসে, অন্যকেও তাহা বোধ করান যায়, যদি বুঝানের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়। একজন্যই লোকে আপনটাকেও ভাল না বাসিয়া পরের জিনিষও সময় সময় ভাল বাসিয়া থাকে, আপনাকে—আপনার দ্রব্যকে বৃথা আড়ম্বরের মধ্যে দিয়া ফেলিও না, স্বরূপে থাকিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ দুটি স্বতন্ত্র কথা, ইহাদের আবার কেহ ২ এক পর্য্যায়েও ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশেষত্ব বিশিষ্টতা অর্থাৎ উত্তম, এই জাতীয়ের মধ্যে বিশেষ অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উৎকর্ষ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এই জাতীয়ের মধ্যে ইহার উৎকর্ষ বা প্রাধান্য কাজেই ইহা বরণীয়। ইহাই একার্থবাদিগণের মত। ভিন্নার্থতা এইঃ—বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য—এই জাতীয়ের মধ্যে, যেমন সমুদয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে ইহার এইটুকু বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য সুতরাং অবৈশিষ্ট্য অস্বাতন্ত্র্যও কিছু আছে; এবম্ভূত যে পর্য্যালোচনা তাহাকেই প্রকৃত বিশেষত্ব আখ্যা দেওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব কোথায় সেটুকু দেখ এবং তুলনা কর। আর ধর উৎকর্ষের কথা— এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, দেখ ইহার উৎকর্ষ তুলনায় কি পরিমাণ? বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোন উৎকর্ষ আছে কিনা? যদি উৎকর্ষ তেমন না থাকে, উৎকর্ষ কর অথবা সেটুকুর উৎকর্ষ আছত

বেশ থাক, যে অংশে উৎকর্ষ নাই এবং হইতে পারে তাহার উৎকর্ষ সাধন কর, মনোযোগী হও, কারণ ও কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া তৎ-প্রতিকার পরায়ণ হও। ইহার দিকে না যাইয়া, আমার সোণার চাঁদ,—রূপার চাঁদ,—মাথার মণি ক্ষুধার অন্ন, মৃতের প্রাণ, আর্ত্তের অভয় ইত্যাকার চিৎকারে কি ফলোদয় হয় জানি না। আয়ুর্ব্বেদ যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মেরুদণ্ড, আয়ুর্ব্বেদের তুলনা নাই, এদেশ বাসীর ইহা ভিন্ন গতি নাই, ইহা জগদ্বিখ্যাত, সকলে ইহার আশ্রয় লও, সকল দুঃখ দূর হইবে, অমন বক্তৃতা করিলেও কেবল চলিবেনা। মূল কথা, আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষের আলোচনা করিতে হইলে দেখিতে হইবে স্বাস্থ্য তত্ত্বে রোগ প্রতিকারে ইহার বিশেষত্ব কি, আর কোথায়? তারপর দেখিতে হইবে, ইহার উৎকর্ষ কতটুকু এবং তাহাকে উৎকৃষ্টতর করা যায় কিনা, কিংবা যে অংশের অপকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহার উন্নতি বিধান সম্ভব পর কিনা, সম্ভব হইলে তাহার হেতু ও যথাযোগ্য উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সকল পন্থা যিনি প্রদর্শন করিবেন, তিনিই আয়ুর্ব্বেদের বরমাল্য পাওয়ার উপযুক্ত। এমন বরপুরুষ কোথায় আছেন, একবার কি আমরা তাহার খোঁজ করিব না? সেই অনুসন্ধানের জন্যই এই সম্মেলন-লীলা-নিকেতন। সুরপতি এই সুমনা মানবেন্দ্র সঙ্ঘের প্রতি পুনঃ প্রসূন বর্ষণ করিবেন, সে আশাও কি আমরা করিতে পারি না?

৩। আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজসমূহের নব্যপ্রণালীতে গুণ পরীক্ষা—

এই প্রবন্ধের বিষয়ে অনুকূল প্রতিকূল দুইটি মতই দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ সমূহের আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীতেই গুণ পরীক্ষা স্বতঃসিদ্ধ। নব্য প্রণালী বলিতে এখন লোকে পাশ্চাত্য প্রণালী বুঝিয়া থাকে, তবে কি পাশ্চাত্য প্রণালীতে ইহাদের গুণ পরীক্ষিত হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ গণের অগ্রে এ প্রয়াস কেন? তাঁহারা পারেন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজ ভিন্ন অন্যান্য ভেষজাদির আয়ুর্ব্বেদ মতে গুণ পরীক্ষা করিতে অথবা আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও অপর যে কোন ঔষধির নবোদ্ভাবিত প্রণালী অবলম্বনে গুণ দোষ বিচার করিতে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কোন্ নিয়মের অধীনে ঔষধির গুণ দোষ বিচার করিতেন

এবং তাহাদের উপযোগীতা, পাশ্চাত্য প্রণালী ও প্রাচীন প্রণালীর ভেদাভেদ ও উৎকর্ষাপকর্ষ। পরন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন অভিনব সরল কার্য্যকরী পন্থা মিলে কিনা? এজন্য প্রত্যেক জাতীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত আবশ্যক হইবে। তারপর কথা এই, আয়ুর্বেদীয় ভেষজ ও অভেষজ কি? কতগুলি আয়ুর্বেদীয় মৌলিক ভেষজ, কতটা অবান্তর, কতটা অন্য শাস্ত্রাগত। আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণ পরীক্ষার প্রণালীটি সর্ব্বাগ্রে আমাদের গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইবে। আমরা প্রাচীন বিষয়ে আজ যেন অন্ধ, তাই নব্য মতের দিকেই অধিক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। আমরা যদি কোন অভিনব প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারি, সে অতি গৌরবের কথা, সেদিন কবে আসিবে? ভিষকগণ ভেষজ সমূহের গুণ পরীক্ষায় কত উদাসীন। কত কত ভেষজ ভিষক্কুলের ভেরীনাদে বিহ্বলসংজ্ঞ হইয়া কোন্ কোণে লুকাইত রহিয়াছে তাহার খবর লওয়া হয় কি? আজ আমাদের বামাকের তুল্য ঔষধ নাই, গুড়্চির গুণ অতুলনীয় আমলকীর উপমা কোথায়, হরিতকীর হার নাই ইত্যাদি বাক্যে জগৎ কম্পমান। কিন্তু দেখ একবার চোখ তুলিয়া কত তোমাদের অনাদরে অভিশাপ প্রাপ্তা অহল্যার ন্যায় অসার ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। সে রাম কবে জন্মিবেন কবে তাঁদের উদ্ধার হইবে?

অভিভাষণম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সর্ব্বেষামপ্যায়ুর্ব্বেদপ্রণয়িনাং পরমাভিপ্রশস্তিস্থানং সুগৃহীতনামধেয়া যে খলু মহাভাগা মন্দায়মানাং দশামুপগতস্যায়ুর্ব্বেদস্য তদুদিতানাং চ চিকিৎসাদিবিধীনাং পুনরুন্নতয়ে যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ং প্রযতমানা গতেঽস্মিন্ বৎসরে ত্রিদশালয়-মধ্যারুহং স্তেষাং মহানুভাবানাং মনঃপাবনানি নামধেয়ানি পরিচয়ং চ পূর্ব্বতঃ প্রকাশয়ন্ হার্দ্দমূর্চ্ছাসমভিব্যঞ্জয়ামি।

(১) এতেষ্বায়ুর্ব্বেদসমুন্নতৌ পরমোৎসাহী পুনানগরনিবাসী রসায়নাচার্য্য-পণ্ডিতগুরুনাথকালেমহোদয়ো 'ভারতীয়রসায়নশাস্ত্রম্' ইত্যাদীনামুপযোগীনাং

মহারাষ্ট্রভাষাময়ানাং পুস্তকানামুপনিবন্ধা, 'সমালোচকা'খ্যমাসিকপত্রস্য প্রচা-
রকঃ, পঞ্চত্রিংশদ্ বর্ষবয়স্ক এব পরলোকপথিকোঽভূদিতি পরং নো বিষাদঃ।
বিদ্যায়ামপ্যার্থিকদশায়ামেষ মহাভাগো রসায়নগ্রন্থানামন্বেষণে তেষামালোচনা-
য়াং মন্দীকৃতান্যব্যাপারো ব্যাপৃত আসীৎ। শ্রীমতোঽস্য রসায়নশাস্ত্রে পরমাধ্যবসায়
মালোক্যাস্মিন্নেব সংবৎসরে অনেনাখিলভারতবর্ষীয় বৈদ্যসংমেলনেন বারো
মহোদয়ায় বিতীর্ণাসীদ্ "রসায়নাচার্য্য" ইতি পদবী।

(২) রাবলপিণ্ডিনগরবাস্তব্যো বৈদ্যরাজ পণ্ডিতগণপতিশাস্ত্রী আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা-
য়াং পরমাভিজ্ঞো বিদ্বানাসীৎ। বৈদ্যসম্মেলনস্যোৎসাহিষু গণনীয়োঽয়ং মহাভাগঃ
শারীরবিষয়কমেকং গ্রন্থমপি রচিতবান্ যস্য হি চতুর্দ্দশসহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ প্রথম-
মাত্রো ভাগঃ সংপূরিতোঽভবৎ। অনেন মহাভাগেন সমস্তস্য গ্রন্থস্য পরিচয়ো দত্ত
আসীদস্মিন্ মহাভাগে ভূয়সী খলু বৈদ্যানাং প্রত্যাশা।

(৩) প্রাণাচার্য্যো গোপালরামচন্দ্রবাবাজীমহোদয়ো নাসিকনগরমধ্য
বর্ত্তী আসীৎ। অয়ং মহোদয়ঃ সদ্বৈদ্যেষু গণনীয়ঃ সদাচারশীলশ্চাসীৎ। এতস্য বংশ-
শতাব্দ্যাঃ পূর্ব্বত এব মহারাষ্ট্রে বৈদ্য ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধোঽভবৎ। শ্রূয়তে অনেন
মহাশয়েন স্বকল্পিতনূতনযন্ত্রাণ্যপি চিকিৎসার্থং নির্ম্মাপিতবান্। এষ হি
প্রাচীনবৈদ্যসভায়াঃ স্নাতকবিদ্যায়াঃ সভাপতিরপি নির্ব্বাচিতোঽভূৎ।

(৪) পানীবলনগরাভিজনঃ পণ্ডিত বিষ্ণুকৃষ্ণপাণ্ডিক মহাশয়ঃ কালাকুশলো
বৈদ্য আসীৎ। এতেন মহাভাগেন শ্রীনন্দপাণ্ডুরঙ্গস্মারকসংস্থাঃ। নাম্নিকা বৈদ্য-
শালা স্থাপিতাসীৎ। এতস্যাং শালায়াং যন্ত্রাণাং সাহায্যেনায়ুর্ব্বেদীয়ানি
ভেষজানি নিরমায়ন্ত। মহাভাগস্যাস্যায়ুর্ব্বেদোদ্যোগেন দ্বিতীয়ং বৈদ্যসম্মেলন
পনবেলস্থানেঽধিষ্ঠিতমভূৎ।

(৫) অজমেরনগরনিলয়ো বৈদ্যমণিমিশ্রশর্ম্মণোঽপি বৈদ্যকশাস্ত্রাভি-
নিবিষ্ট আসীৎ। পূর্ব্বমেষ মনীষী রাজস্থানসমাচার নামকং হিন্দীভাষাময়ং পত্রং
সাপ্তাহিক দৈনিকরূপেণ প্রকাশয়ামাস। বয়সোঽন্তিমে সময়ে বৈদ্যকব্যবসায়ে
ব্যাপ্রিয়তে স্ম মনীষি মহোদয়ঃ।

(৬) প্রয়াগনিবাসী পণ্ডিত বৈদ্যনাথশর্ম্মা রাজবৈদ্যঃ প্রয়াগীয়বৈদ্যেষু
প্রসিদ্ধ আসীৎ। এষ হি সুপ্রসিদ্ধস্য রাজবৈদ্যপণ্ডিতজগন্নাথ শর্ম্মণো লঘুভ্রাতা-
সীৎ। এতেন মহোদয়েন বৈদ্যকসম্বন্ধীমাসিকমপ্যেকং প্রকাশয়িতুং প্রক্রান্ত-

মাসীৎ। পরংচতুরঙ্কপ্রকাশনামন্তরমেব তৎ ব্যরমত।

(৭) কাশীপুর খরাই নিকেতনঃ পণ্ডিত মুকুন্দরাম জোশী মহাভাগোঽপ্যায়ুর্ব্বেদ বিষয়েঽভিনিবিষ্ট আসীৎ।

এতেষাং সর্ব্বেষামেব মহাভাগানাং পরলোকযাত্রয়া নিতরাং খিদ্যতেঽস্মাদৃশাং চেতঃ। এতস্মিন্ বৎসরে প্রজারঞ্জনকারিণা রাজ্যতন্ত্রেণ নিম্নপ্রকাশিতাভ্যাং মহাভাগাভ্যাং বৈদ্যরত্নপদবী বিতীর্ণা।

(১) চিদানন্দ মুসদ অনর্গলগোদ দামোদরম্ (মালাবার)।

(২) টী, কে, পরমেশ্বর শর্ম্মা মুসদ ত্রিপুরা গোদাকডকল (মালাবার)। এতেন খলু বৈদ্যবিদ্যাপ্রোৎসাহনেন নিকামং প্রীয়তে বৈদ্যসম্মেলনম্। শ্রীমতাং রাজতন্ত্রাধিকারিণামনুগ্রহং সংমানয়ামো সর্ব্বে বয়মান্তরেণ।

অথ খলু সর্ব্ব এব ভবন্তো বিদ্বাংসো মননশীলাঃ কর্ম্মদক্ষাঃ সততাভ্যস্তচিকিৎসাকর্ম্মাণঃ সিদ্ধিমন্তঃ সদ্‌গুর্ব্বাদ্যাশ্রয়বন্তশ্চ অতএব সত্যং বৈদ্যশব্দমর্হন্তঃ পুনশ্চাপি প্রকৃতিজ্ঞাঃ প্রতিপত্তিজ্ঞা দেশকালমাত্রাবিভাগবিদশ্চ সন্তি ভূয়াংসশ্চ মহাপুরুষাঃ প্রাচীনায়ুর্ব্বেদবিশারদা নবনবাবিষ্কৃত কলাকলাপকোবিদা বৈদেশিকস্বতন্ত্রলেখকোক্তাবিতত্ত্বপর্য্যালোচনা সমুল্লসিতান্তঃকরণাঃ প্রতিভাশালিনঃ সমুদিতাঃ। তদত্রাল্পজ্ঞেন পরিচিত কতিপয় সংগ্রহগ্রন্থেন সংগ্রহমন্তরা কিমুচ্যতামিতি বলাবরুদ্ধবাগপি ভবন্নিয়োগপরবশঃ কিঞ্চিদভিধাতুং প্রসরামি।

সর্ব্বথা বিজয়তে খলু সমগ্রসর্গরচনাপ্রকটিতনৈপুণস্য ভগবতঃ স্বয়ম্ভুবো মানসজন্মা প্রজাপতিদস্রসুরপতিধন্বন্তরিপ্রভৃতিভিরাদিবৈদ্যৈরাবিষ্কৃতত্রৈকালাববোধ বিদিতবেদিতব্যৈস্তপঃসমাধিনির্জ্জিতরজস্তমঃ প্রসরণাতীশয়ৈ রুগ্নজনতাবিলোকনসঞ্জাতকরুণার্দ্রহৃদয়ৈরখিলজগদাতঙ্কোদ্ধরণকৃতপ্রতিজ্ঞৈঃ মহর্ষিভিশ্চিরমুপাসিত উদ্ভাসিতঃ প্রতিসংস্কৃতঃ পুনশ্চালৌকিক প্রভাবৈঃ সিদ্ধৈঃ প্রভাবিতঃ সংসাধিতশ্চায়ুর্ব্বেদো নাম।

স চায়মায়ুঃপ্রদত্বেনায়ুর্ব্বোধকত্বেন বায়ুষ্যানায়ুষ্যদ্রব্যগুণকর্ম্মনির্দ্দেশকত্বেন বা আয়ুঃপরিপন্থিব্যাধিসমূহস্য হেতুলক্ষণৌষধসংবেদনকারিত্বেন বা যথার্থয়তি নিজাভিখ্যাম্। দিনচর্য্যর্তুচর্য্যাসদ্বৃত্তাদ্যুপদেশদ্বারা অনাগতাবাধপ্রশমনোপদেশং রসায়নবাজীকরণদ্বারা চ উর্জ্জস্করদ্রব্যগুণকর্ম্মোপদেশং

বিদধদুপকরোতি স্বস্থান্। তথৈবচ সর্ব্বেষাং ব্যাধীনাং নিদানপূর্ব্বরূপ-রূপোপশয়সম্প্রাপ্তিমুপদিশন্নুপকরোতি ব্যাধিতান্। উভয়থা চ বৈদ্যানিতি।

ন চ প্রতিকুর্ব্বন্নু তিষ্ঠতি ম্রিয়তে চ, অপ্রতিকুর্ব্বন্নু তিষ্ঠতি ম্রিয়তে চেত্যুভয়দর্শনাদ্ধিতাহিতোপদেশোঽকিঞ্চিৎকর ইতি মন্তব্যম্। তথাচাষ্টাঙ্গ সংগ্রহে—সকলোঽপি চায়ং রোগসমূহঃ প্রতিকারবানায়ুর্ব্বেদবিহিতমুপদেশ-মপেক্ষতে যস্মান্নিয়ত হেতুকোঽপ্যাময়ঃ সম্যগ্ ভিষগাদেশানুষ্ঠানাদুপাত্তায়ুঃ-সংস্কারাপরিক্ষয়ে জাতোঽপি বা সহ্যবেদনতাং প্রতিপদ্যতে অনুপক্রম্যমাণস্তু সর্ব্ব এব প্রায়শো ভিনত্যকাণ্ডে। স্বয়মপি চ দৈবান্নিদানাল্পতয়া বা নিবর্ত্তমানঃ ষোড়শগুণসমুদিতক্রিয়োপলম্ভাদাশুতর মপরিক্লিষ্টস্য চাপ গচ্ছতি। আনিয়-তফলদায়িনিতু দৈবে হিতাভ্যাসরতস্যাবকাশমেব ন লভতে ব্যাধিঃ। তস্মান্ন কস্যাংচিদবস্থায়ামাত্মবান্ হিতাহিতয়োস্তুল্যদর্শী স্যাৎ ইতি।

এবং চাস্য গৌরবমহিমানমৌদার্য্যগাম্ভীর্য্যং চোপাদর্শয়িতুং কথং পারয়তি মাদৃশঃ। পূর্ব্বৈঃ সভাপতিভিশ্চাত্র নির্ণীয়াতে স্ম সুনিপুণতরম্। কেবলং কেষাংচিদায়ুর্ব্বেদবিষয়ানামবতারয়ামি সহৃদয়াহ্লাদনায় প্রতিকৃতিম্।

আয়ুর্ব্বেদো হি ব্যাধিপ্রতিকারব্যাখ্যানম্। ব্যাধয়শ্চ সহগর্ভজাত-পীড়াকালপ্রভাবস্বভাবজা ইতি সপ্তবিধাঃ। তে পুনঃ পৃথগ্ দ্বিবিধাঃ। তত্র শুক্রার্ত্তবদোষান্বয়াঃ কুষ্ঠার্শো মেহাদয়ঃ সহজাঃ পিতৃজা মাতৃজাশ্চ। জনন্যপচারাৎ কৌণ্ঠ্যপৈঙ্গল্য কিলাসাদয়ো গর্ভজা অন্নরসজা দৌহৃদবিমান-জাশ্চ। স্বাপাচারাস্মিথ্যাহারবিহারাদিতো জাতজাঃ সন্তর্পণজাশ্চ। ক্ষতভঙ্গপ্রহারাদয়ঃ ক্রোধশোকভয়াদশ্চ পীড়াকৃতাঃ শারীরা মানসাশ্চ। শীতাদিকালত্রয় হেতুকা জ্বরাদয় কালজা ব্যাপন্নর্ত্তুজা অসংরক্ষণজাশ্চ। দেবগুরূল্লঙ্ঘনশাপাথর্বণাদিকৃতাঃ প্রভাবজা জ্বরাদয়ঃ পিশাচাদয়শ্চ। ক্ষুৎপিপাসা জরাদয়ঃ স্বভাবজাঃ কালজা অকালজাশ্চ। তত্র কালজা রক্ষণকৃতা অরক্ষণজা অকালজাঃ। এতেষ্বেব সর্ব্বে উক্তা অনুক্তা বা নানা-বিধা ব্যাধয়োঽন্তর্ভবন্তি। তে পুনা রুক্‌সামান্যাদেকাকারাঃ প্রত্যেকং সমুত্থানস্থানবর্ণনামবেদনাপ্রভাবোপক্রমবিশেষাদসংখ্যভেদা বা ভবন্তি।

বস্তুতস্তু শারীরাণাং দ্রব্যাণাং রসরক্তমাংসাদি ধাতূনাং মূত্রস্বেদাদি মলানাং ধমনী সিরারসায়নী প্রভৃতি নানাবিধস্রোতসাং হৃদয় ফুস্‌ফুস যকৃদাদি যন্ত্রাণা-

মন্যেষাং চ শরীরোপকরণানাং সূক্ষ্মাঙ্গোপাঙ্গানাং তথা তত্তদ্দ্রব্যবর্ত্তিনাং নানাবিধানাং গৌরবলাঘবশৈত্যোষ্ণ্যশ্লাক্ষ্ণ্যকার্কশ্যবৈশদ্যপৈচ্ছিল্যসান্দ্রদ্রব-সুগন্ধ দুর্গন্ধরূপরসস্পর্শাদীনাং গুণানাং চ বিপৎ, বৃদ্ধিঃ, ক্ষয়ো বিকৃতির্ব্বা রোগঃ। সম্পচ্চ সাম্যমারোগ্যম্। তদুক্তম্—

যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সংজনয়েন্নরম্।
তেষামেব বিপদ্ ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ॥ ইতি।

তেষাং সর্ব্বেষামপি ব্যাধিনামারোগ্যস্য চ বাত পিত্তককা এব ভবন্তি মূলং কুপিতাকুপিতাঃ। যতস্তৎসাম্যবৈষম্যদ্বারৈব সর্ব্বেষাং শারীর-ভাবানাং বিকৃতাবিকৃতকার্য্যকর্ত্তৃত্বম্। ধাতুসাম্যকারণৈরাহারবিহারাদি-ভিরাসেবিতৈঃ সময়োপযুক্তৈঃ কালার্থ কর্ম্মরূপৈর্ব্বাতাদিসাম্যরক্ষণদ্বারৈব বিধীয়তেঽনবরতমান্তরং বাহ্যং চ কৃৎস্নং কার্য্যজাতম্। এবং ধাতুবৈষম্য-কারণৈরসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগপ্রজ্ঞাপরাধপরিণামাখ্যৈরপি বাতপিত্তকফানাং সঞ্চয়প্রকোপপ্রসারণস্থানসংশ্রয়াদীন্ বিধায়ৈব বিধীয়তে নানাবিধব্যাধি-জাতম্। তথাচ কার্য্যনিয়তপূর্ব্ববৃত্তিতয়া ধাতুবৈষম্যস্য ব্যাধের্ধাতুসাম্যস্য চারোগ্যস্য বাতাদিকোপাকোপাবেব কারণমিতি সিদ্ধম্।

অথবা বাতাদিসাম্যমেবারোগ্যম্, বাতাদিবৈষম্যমেব চ ব্যাধিঃ। জ্বরাদীনাং চ ব্যাধিত্বং দোষবৈষম্যরূপব্যাধিজত্বাদেব। যথা—মনুষ্যো মনুষ্য-প্রভব ইত্যাদি। তথাচ চরকঃ—

রোগস্তু দোষ বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা ইতি।

তথা তৎকোপাকোপৌচ বস্তুতস্তেষাং বৈকৃতী প্রাকৃতী গতিরেব। তদুক্তং চরকে—

গতিশ্চ দ্বিবিধা দৃষ্টা প্রাকৃতী বৈকৃতী চ যা।
পিত্তাদেবোষ্মণঃ পক্তির্নরাণামুপজায়তে॥
তচ্চ পিত্তং প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্।
প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে॥
ন চৈবৌজঃ স্মৃতঃ কায়ে স চ পাপ্মোপদিশ্যতে।
সর্ব্বা হি চেষ্টা বাতেন স প্রাণঃ প্রাণিনাং স্মৃতঃ॥
তেনৈব রোগা জায়ন্তে তেন চেবোপরুধ্যতে। ইতি।

ত্রিশোথীয়েঽপি :—

নিত্যাঃ প্রাণভৃতাং দেহে বাতপিত্ত কফাস্ত্রয়ঃ।
বিকৃতা প্রকৃতিস্থা বা তান্ বুভুৎসেত পণ্ডিতঃ॥
উৎসাহোচ্ছাস নিশ্বাস চেষ্টা ধাতুগতিঃ সমা।
সমোমোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্॥
দর্শনং পক্তিরুষ্মা চ ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভাপ্রসাদো মেধাচ পিত্তকর্ম্মাবিকারজম্॥
স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বং চ গৌরবং বৃষতা বলম্।
ক্ষমা ধৃতিরলোভশ্চ কফকর্ম্মাবিকারজম্॥ ইতি

এষাং বাতপিত্তকফানাং কুপিতাকুপিতানাং লিঙ্গানি বাতকলাকলীয়ে দ্রষ্টব্যানি।

কুপিতানাং চ তেষাং সামান্যজনানাত্মজভেদাদ্দ্বিবিধবিকারকরণং কর্ম্ম। তত্র নানাত্মজা নখভেদাদয়োঽশীতির্ব্বাতজাঃ। তেষ্বন্যেষু চ তদুদ্ভবেষু বায়োরাত্মরূপং রৌক্ষ্যাদি শরীরাবয়ব প্রবেশ নিমিত্তং স্রংসভ্রংসাদিকর্ম্ম চ নিয়তং ভবতি। ওষাদয়শ্চ চত্বারিংশৎ পিত্তজাঃ। তেষ্বন্যেষু চ তদুদ্ভবেষু পিত্তস্যাত্মরূপমৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যাদি তত্তচ্ছারীরাবয়বাবেশনিমিত্তং চ দাহৌষ্ণ্যাদি কর্ম্ম নিয়তং ভবতি। তৃপ্ত্যাদয়শ্চ বিংশতি শ্লেষ্মজাঃ। তেষ্বন্যেষু চ তদুদ্ভবেষু শ্লেষ্মণ আত্মরূপং স্নেহ শৈত্যাদি শরীরাবয়বাবেশনিমিত্তং শ্বৈত্য-শৈত্যকণ্ড্বাদিকর্ম্ম নিয়তং ভবতি। তদিদং মহারোগাধ্যায়ে বিস্তরতঃ প্রোক্তং ভগবতা তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্।

অত্রেত্থমপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যৎ হৃদয় যকৃৎপ্লীহান্ত্ররক্তাদিষু শারীর-ভাবেষু যদ্ বৈকৃত্যমুপজায়তে তদ্ বাহ্যান্নিদানাদেব। এতেষ্বেব চ ভাবেষু সঞ্চলনাদি ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ বিভজ্যমানা প্রত্যক্ষতো বানুমেয়া বা দৃশ্যন্তে, ন হি যা হৃদয়স্য ক্রিয়া সৈব যকৃতঃ, অন্ত্রস্য বা তয়োর্ব্বা তস্য। সিরাধমনীনাং যা রক্তসঞ্চরণাদিক্রিয়া ন সামাশয়স্যেতি সর্ব্বেষামেব পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধৌ ব্যাধীনাং চ তথৈব ব্যবাস্থিতৌ বাস্তবীং শারীরস্থিতিমপরিচ্ছিদ্যৈবাসৎকল্পনা মূলা কোঽয়ং বাতপিত্তকফপ্রপঞ্চঃ, কৃতমস্তগড়ুনামুনা।

তত্রেদং প্রতিবিধানম্—রক্তার্শঃ প্রদর রক্তপিত্তসিরাব্যধব্রণাদিষু রক্তে, কাসশ্বাসক্ষয় যক্ষ্মাদিষু চ কফে, স্তন্যরোগেষু স্তন্যে, মেহাদিষু মূত্রে, জ্বরাতীসারপাণ্ডূদরাদিবিবিধরোগ পরিগৃহীতেষু নানারোগেষু বিণ্মূত্র ত্বঙ্‌নখনেত্রাদিষু বৈবর্ণ্য রৌক্ষ কার্কশ্যবিবিধবর্ণত্ব পাককোথক্লেদোপলেপাদয়ো নানাবিধা বিকৃতয়ো দৃশ্যন্তে। তত্ত্বতো বিবিচ্যমানাস্তাস্ত্রিবিধা এব সম্পদ্যন্তে—আগ্নেয্যঃ সৌম্যা বায়বীয়াশ্চ। তত্র নিখিলেষপি শারীরভাবেষু রৌক্ষ্যলাঘব শৈত্যখরত্বসৌখ্যসঞ্চলনাদয়ঃ স্রংসব্যাসাদয়ো যা বিকৃতয়স্তা বায়বীয়াঃ। যাস্তু ঔষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যবিস্রতা সরক্তশুক্লারুণবর্জ্যবর্ণতা কটুকাম্লরসতাদয়ো দাহকোথাদয়স্তা আগ্নেয্যঃ। যাশ্চ স্নিগ্ধত্বগৌরবমাধুর্য্যার্মাৎস্ন্যাদয়ঃ শ্বৈত্যশৈত্যকণ্ডূ স্থৈর্য্যগৌরব স্তম্ভসুপ্তিক্লেদোপদেহ চিরকারিত্বাদয়স্তাঃ সৌম্যাঃ। এবং তাঃ সর্ব্বা বিবিধা বিকৃতয়োঽন্যাশ্চানুক্তাঃ স্বয়মূহ্যমানা অপি এতাস্বেবান্তর্ভবন্তি ত্রিবিধাসু। যতশ্চলোকে রৌক্ষ্যাদয়ো বাতস্য, ঔষ্ণ্যাদয়ঃ পিত্তস্য স্নিগ্ধত্বাদয়শ্চ শ্লেষ্মণঃ এব নির্দ্ধার্য্যন্তে। তত্রাপি শরীরে পৃথিবীজলপরিণামঃ শ্লেষ্মা, আকাশবায়্বোর্ব্বাতঃ তেজসঃ পিত্তম্। তথাচ তৎসমানগুণবহুলৈদ্রব্যগুণকর্ম্মভিরেতা উৎপদ্যন্তে বিবর্দ্ধন্তে চ; তদ্বিপরীত গুণৈশ্চ সাম্যন্তি। অর্থাৎ বাতপিত্তকফপ্রত্যনীকৈরেব ঔষধান্নবিহারৈঃ সর্ব্বা অপি বিকৃতয়ঃ প্রায়ো নিবর্ত্তন্তে। অতোঽপ্যনুমীয়তে সর্ব্বাসামাসাং বিকৃতীনাং কারণং বাতপিত্তকফা এব। আপ্তোপদেশাশ্চ নিশ্চিন্বন্তি—যদ্বাতপিত্তকফানামেবৈতাঃ ক্রিয়াঃ। তথা চ চরকে—নাস্তি রোগো বিনা দোষৈঃ ইতি।

বৃদ্ধ বাগ্‌ভটেঽপি—সর্ব্ব এব বিকারা নান্যত্র বাতপিত্ত কফেভ্যো নিবর্ত্তন্তে—ইতি দোষা এব হি সর্ব্বরোগ কারণম্ ইতি। যথা চ বিদ্যুদ্বর্ষাদয়ো নভসি ভবন্তি, তরঙ্গবুদ্বুদাদয়শ্চাম্ভসস্তথা দোষেষু রোগাঃ। ইতি চ।

ন চ কেবলং নিজেষ্বেব দোষসম্বন্ধঃ আগন্তুষ্বপি দোষসম্বন্ধেনৈব রুগনুবন্ধদর্শনাৎ। তথা চ বৃদ্ধ বাগ্‌ভটঃ।

নিজেষু পূর্ব্বং বাতাদয়ো বৈষম্যমাপাদ্যন্তে ততো ব্যথাভিবর্ত্ততে বাহ্যহেতুজাশ্চাগন্তবস্তেষু ব্যথাপূর্ব্বমুপজায়তে ততো দোষবৈষম্যম্, দোষবৈষম্যেনৈব চ বহুরূপা রুগনুবধ্যতে প্রবর্দ্ধতে চ; এবং চ কৃত্বা ন চ দোষ ব্যতিরেকেণ রোগানুবন্ধঃ কেবলং পৌর্ব্বাপর্য্যে বিশেষ ইতি।

তথাচ সর্ব্বাসাং বিকৃতীনাং প্রত্যক্ষানুমানাপ্তাগমৈর্ব্বাতপিত্তকফা এব মূলং সিদ্ধ্যন্তি। অমুমেবার্থমুররীকৃত্য ভগবানুপদিশতি ধন্বন্তরিঃ:—

সর্ব্বেষাং চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং তল্লিঙ্গত্বাদ্ দৃষ্টফলত্বাদাগমাচ্চেতি। সুঃ সুঃ ২৪অঃ

যচ্চোক্তং প্রত্যক্ষেণ (যন্ত্রসাহায্যেন) অনুমানতো বা হৃদাদিষ্বেব বৈকৃত্যং সঙ্কলনাদি ক্রিয়া চ পৃথক্ পৃথগ্বিভজ্যমানা দৃশ্যতে, তেষ্বেবচ চিকিৎসয়াঽন্যথাপাদনেন স্বাস্থ্যমুপলভ্যতে নাতো বাতাদ্যপেক্ষা লেশতোঽপীতি। তত্রোচ্যতেহৃদাদি যন্ত্রেষু যৎকিমপি সংস্করণাদি দৃশ্যতে, নৈতত্তেষাম্। তানি হি স্থানানি, ন হি স্থানে জায়মানা ক্রিয়া স্থানস্য কিন্তু তদধিষ্ঠাতুঃ। তথাহি যা কস্মিন্নপি শারীরযন্ত্রে ক্রিয়া জায়তে সা তদ্‌যন্ত্রস্য বা তদধিষ্ঠাতুর্ব্বাতপিত্তকফান্যতমস্য বেতি মীমাংসায়াম্—ন তাবত্তদ্‌যন্ত্রস্য, প্রায়স্তৎক্রিয়ায়া অন্যত্রাপি দর্শনাৎ। ন বা ধাত্বন্যতমস্য তৎক্রিয়াণাং প্রীণনং বর্জ্জনমিত্যাদিনা পরিগণিতত্বাৎ। তথা চ পারিশেষ্যাত্তদধিষ্ঠাতুর্ব্বাতপিত্তকফান্যতমস্যৈব। ন হি বাষ্পযন্ত্রপরিচালিত যন্ত্রক্রিয়া তস্য প্রত্যুত তৎপরিস্পন্দনাধায়কবাষ্পস্যেবেতি কো নাম ন স্বীকর্ত্তুমুৎসহতে। ক্বচিচ্চ তদ্‌যন্ত্রস্য তদ্বর্ত্তিধাতোর্ব্বা ক্রিয়াপি গুণান্তর দ্যোতনায় বাতাদীনামেব নির্দ্দিষ্টা, শীতত্বপাবনত্বদ্যোতনায় গঙ্গায়াংঘোষ ইত্যত্র তটেঽপি গঙ্গা-প্রয়োগবৎ। অতএব শরীরে হৃদাদি যন্ত্রাণাং ক্রিয়াপৃথক্ ন নির্দ্দিষ্টা, প্রাণাদিবায়ুসাধকাদিপিত্তাবলম্বকাদিশ্লেষ্মক্রিয়াকথনেনৈব গতার্থত্বাৎ। তেষামপি যন্ত্রবিশেষেষু ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যংতু জিজ্ঞাসুভির্ব্বিবেচনীয়ম্। অতএব স্বোপার্জ্জিতকর্ম্মফলাতঙ্কানলদহ্যমানমানসান মানুষান্ উদ্দীধীষবঃ সমাধিমাত্র সহায়াঃ কারুণ্যরস পরিপ্লুতমানসাঃ তপঃপ্রভাবাধিগতদিব্যচক্ষুররবারিতাশেষজগৎসারাসারবিশেষাঃ প্রত্যক্ষমিব পরোক্ষমপ্যধিগস্তুমীশাস্তত্রভবন্তো মহর্ষয়ঃ—'আতুরাণামবস্থান্তরেষু স্থানবিশেষেষু চ বহুবিধা ভবন্তি বিকৃতয়ো ন তা বিশেষেণ পরিচ্ছেত্তুং শক্যন্তে, তাসামেকৈকস্যা অপি বয়োবলদেশকালাদিবিশেষৈ রূপান্তরত্বেনাসংখ্যেয়ত্বাৎ, ইতি সম্যগালোচ্য সর্ব্বেঽপি রুগ্‌বিশেষা এষ্বেবান্তর্ভবন্তি ইতি চ সম্যগনুভূয় বাতপিত্তকফত্রৈবিধ্যেন সঞ্চিক্ষিপুঃ, তত্তদ্বিশেষান পরিজ্ঞাতুং চ মার্গং দর্শয়ামাসুঃ। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্তিস্বীকার ও পুস্তক পরিচয়।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা—চারিখণ্ডে সমাপ্ত, ডিমাই অষ্টাংশিত, চারি খণ্ডে ১৩৫৬ পৃষ্ঠা। প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা করিয়া। ১৭নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমরা উক্ত পুস্তকখানির প্রাপ্তিস্বীকার প্রসঙ্গে ইহার সংক্ষেপ পরিচয় পাঠকবর্গকে প্রদান করিব। এই পুস্তকখানীর প্রণেতা কলিকাতার সুপ্রণিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়। পুস্তক কয়খানীই প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় রচিত। বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গভাবায় আরও কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য কিন্তু এই গ্রন্থের একটু বিশেষত্ব আছে। কবিভূষণ মহাশয় কেবল মূলের অনুবাদের দিকেই লক্ষ্য করেন নাই, তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিতে যাইয়া যথেষ্ট গবেষণাও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা আজকাল অনেকেরই হৃদয়ে জাগিয়াছে, কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত অনেকেই উহার মর্ম্ম যথাযথ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। অনেকেই জানেন যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কেবল কতগুলি সূত্র সমষ্টি। ইহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যার তার কর্ম্ম নহে। আজকাল অনেকেই বাঙ্গালা পুস্তক দেখিয়া কবিরাজী করেন, ইহা একপক্ষে যেমন আশার কথা অপরদিকে অনভিজ্ঞতার বাহুল্যে বিষম ক্ষোভের বিষয়। হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথী চিকিৎসা যেমন বাঙ্গালার সাহায্যে এদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া বিশাল আয়ুর্ব্বেদক্ষেত্রকেও প্রচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। তেমন আয়ুর্ব্বেদকে অতি সরলভাবে সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে দিয়াও আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে। এতদর্থে যিনি যে প্রকার প্রযত্ন করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। কবিরাজ অমৃতলাল তাঁহার এই গ্রন্থচয়কে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথী চিকিৎসাগ্রন্থের ন্যায়

লাক্ষণিক চিকিৎসাগ্রন্থে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বহু প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ বিধিবদ্ধ আছে ; কিন্তু বহুদর্শী চিকিৎসক ভিন্ন কেহই তাহার প্রয়োগপ্রণালী বিদিত নহে। যাহারা পুস্তক দেখিয়া রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে উৎসুক আছেন, তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানী বিশেষ উপাদেয় হইবে। এই গ্রন্থে রোগ সমুদয়ের বিস্তৃত নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাপ্রণালী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থে যে কেবল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেরই অনুসরণ করা হইয়াছে এমন নহে, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র, দেশীয় মত প্রভৃতি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেশীয় প্রচলিত এবং খ্যাতনামা ভিষক্‌বৃন্দের পরীক্ষিত বহু ঔষধি ও মতামতও সঙ্কলিত হইয়া গ্রন্থখানীকে সমধিক প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। চিকিৎসক, অচিকিৎসক সকলের নিকটই গ্রন্থক্রয়খানী সমাদর লাভ করিবে ভরসা করা যায়।

পল্লী-চিকিৎসক।

সপ্তম অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরি—খাটি সর্ষপতৈল ।। এক পোয়া (কুড়ি তোলা) এক খানা পরিষ্কৃত লোহার কড়াতে রাখিয়া কাঠের আগুনে মৃদুজ্বালে পাক করিবেন। যখন তৈল নিস্ফেণ হইবে ও স্থির হইবে অর্থাৎ ভাজা ভাজার ন্যায় পাক আসিবে তখন তাহাতে ১২টা জীবন্ত টেংরা মাছ ছাড়িয়া দিবেন। মাছগুলি খুব মুচমুচে ভাজা হইলে নামাইয়া ছাকিবেন। এই তৈল ঘা' এ দিতেহয়। পরিষ্কার তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া তাহা ঐ তৈলে ভিজাইয়া ঘা'এ লাগাইবেন এবং মধ্যে ২ ঐ তুলাতে তৈল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন। তিন দিন এরূপ করিতে হয়। কদাচিৎ আরও ১।২ দিন প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা মহাপুরুষ প্রদত্ত ঔষধ। সন্ধব্রণ, শারিরব্রণের মহৌষধ এমন কি কুষ্ঠরোগের ক্ষত ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগজন্য দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতরোগে প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় একুকথায় ঘা' নামে পরিচিত রোগে [illegible] ঔষধ প্রয়োগ করণে অদ্বিতীয়।

[illegible]

প্রস্রাব ক্ষতস্থানে দিলে ঘা' শুকাইয়া যায়। কেহ নষ্ট করিতে পারে না।

১০৮টা জামির পাতা ও আট রকমের কাঁটা লইয়া একত্র মৃদুজ্বালে খুব জ্বাল দিতে হয়। এই জল দ্বারা ঘা' ধুইলে যদি কেহ নষ্ট করিয়া থাকে, তবে ঐ দোষ সারিয়া যায়; অত্যুৎকট বিষের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় ও ঘা' সহজে সারিয়া যায়। দিনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার ধুইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত জলদ্বারা ঘা' ধুইয়া পরে টগরফুলের পাতা ও আদা বাটিয়া প্রলেপদিলে (ক্ষতমুখ খোলা রাখিয়া) ঘা' সহজেই আরোগ্য হয়।

ঘি ও মেটে সিন্দুর একত্র মিশাইয়া ঘায়ে দিলে আরোগ্য হয়।

ননী (নবনীত) ।৵০ অর্দ্ধপোয়া পেয়াজ ।৵০ আনা, আপাং রস ১॥০ দেড় আউন্স, (৩৫০ তোলা) গাজা অর্দ্ধতোলা, একটি ডাব নারিকেল ছিদ্র করিয়া জল ফেলিয়া মধ্যে ননী ভরিয়া নারিকেলটী মাটিদ্বারা লেপিয়া চুলাতে বসাইয়া ছোবড়া দ্বারা জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিতে ২ যখন ননী মরিয়া

ঘৃত হইবে, তখন আপাং মূল খণ্ড ২ অথবা আপাং পাতার রস বাহির করিয়া ঐ রস ও পেয়াঁজের কোষ গুলি এবং গাঁজা ঐ নারিকেলমধ্যস্থ ঘৃতে মিশ্রিত করিবে। ভালরূপ জ্বাল হইলে নামাইয়া শিশিতে ভরিবে। পৃষ্ঠাঘাত হইতে বাঘী, নালীঘা ও সামান্য ফোড়া পর্য্যন্ত সকল রকমের ক্ষত বিনা অস্ত্র চিকিৎসায় নিঃসন্দেহে আরোগ্য হইবে। ইহাই "হরের মলম" নামে খ্যাত।

সু—ও ঠাকুর্দ্দা, যদি কোনও রূপ 'ঘসা' লাগিয়া চামড়া উঠিয়াযায় বা ক্ষত হয় তবে কি করিতে হইবে?

হ—রাঁধিবার জন্য যে মেটে কড়াই ব্যবহার হয় তাহা হইতে কালী উক্তস্থানে তখনই লাগাইয়া দিবে। কেবল মাত্র একটা 'কামড়' দিবে অর্থাৎ হটাৎ একটা জ্বালা অনুভূত হইবে, একটু পরেই সারিয়া যাইবে। ইহাতে উক্তক্ষত সহজেই সারে। উক্তকালী ঘা' টাকে শুকাইয়া তবে উপরের আবরণটা (বকটা) সব পড়িয়া যায়।

হ—যদি কোথাও কোন আঘাত লাগে ও বেদনা পাওয়া যায় তবে কি করিবে? মনেকর যেন হঠাৎ একটা মরাকাঠে (শুকনা কাঠে) ঘাত লাগিয়া অথবা মনেকর যদি গরু বা ঘোড়ায় লাথি দেয়।

হ—এমতাবস্থায়—শীতল জলধারা [illegible] যায়। শীতল জলের পটী করিলে ও সারে।

সু—ঘা' এর—ত অনেক ঔষধ বলিয়া ফেলিলে?

হ—দাদা ঘায়ে যে কতলোক কত কষ্ট পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাই এ স্থলে এত বলিলাম। আরও অনেক আছে, সে সম্বন্ধে আজ আর অধিক বলিবনা, তবে এই, আর দুই একটী এখানে বলিয়া যাই।

৫ তোলা পুরাতন ঘৃত কাঁচাতুতিয়ার গুড়া দিয়া মাড়িবেন। অল্প পরিমাণে দিতে দিতে যখন সবুজ রঙ্ হইবে, তখন আর দিবেননা। পরে এককড়ি প্রমাণ কালিচুণ দিয়া মাড়িবেন। চুণ বেশী দিলে জ্বাল হয় নতুবা কোনও জ্বালা হয় না। নালী হইলে পলিতায় মলম মাখিয়া ভরিয়া দিবেন। নালী ঘায়ের এরূপ মলম দুর্লভ। ইহাতে অতিউত্তম নেকড়ার পটী করিয়া দিতে হয়।

জাতিফল চূর্ণ ১ তোলা, জঙ্গীহরিতকী ১ তোলা, পাপড়ী খয়ের ২ তোলা জাতিফল ও জঙ্গীহরিতকী চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন। খয়ের উষ্ণ জলে দ্রব করিয়া চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবেন। তৎপর বাসক পাতায় ঔষধ মাখাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। অগ্নিতে বাসক পাতা উষ্ণ করিয়া ক্ষতের উপর দিয়া তাহার উপর পান গরম করতঃ দিয়া পটী বান্ধিবেন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ঘা সহজে আরোগ্য হয়। আমি যেখান হইতে ইহা পাইয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাই "ঢাকার শাখারীর" প্রচলিত "বাসক পাতা"। ঠিক উহাই কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে এপর্য্যন্ত বলিতে পারি এই ঔষধের নিয়ম ও ফল একইরূপ দেখা যায়।

সু—ঘায়ে পোকা পড়িলে তাহা দূর করিবার উপায় কি ?

হ—পুর ঘুরে ঘায়ে পোকা হইলে পচা মান কচুর ডাটা ও মাখন একত্র বাটিয়া ঘায়ে দিলে ও রৌদ্রে বসিলে পোকা বাহির হইয়া আরাম হয়।

রসোন বাটিয়া ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষতস্থ কীট বিনষ্ট হয়। পুরাতন ঘায়ে প্রায়ই পোকা হয়, কীট বিনাশার্থে রসোন অতীব ফল প্রদ।

সু—ঘায়ে পোকাত প্রায়ই মাছিতে পাড়ে; কেমন নয় কি ?

হ—আজ্ঞা হা এজন্য সর্ব্বদা ক্ষতমুখ ঢাকিয়া রাখিতে হয়, যেন ক্ষতে মাছি বসিতে না পায়। দেখুন কয়েক বৎসর হয় আমাদের গ্রামে ————র কান পাকে ও দুর্গন্ধময় পূযাদি বাহির হয়। ছেলে মানুষ সর্ব্বদাই মাছি পড়িত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল বড় বড় পোকা একবার গর্ত্তমধ্যে ডুবিয়া যায় পুনঃ ঝাক ধরিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। ছেলেটী বেদনায় অস্থির। গ্রামে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল এখন উপায় ? ডাক্তার কবিরাজত ভাবিয়া ব্যাকুল। সকলেই বলিল পিচকারী দ্বারা ধোয়াইলে হয়ত সারিবে, কিন্তু তাহা বিফল হইল। পরে উহাতে কেরোসিন তৈল দেওয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল আর পোকা ভাসেনা। কাজেই পুনঃ পিচকারী দ্বারা জল দিতেই কর্ণ মধ্য হইতে ক্রমে ১২। ১৪ টা পোকা (বিষ্ঠামধ্যস্থ পোকার ন্যায়) বাহির হইয়া পড়িল। পোকাগুলি কেরোসিন তেল দেওয়াতে মরিয়া গিয়াছিল।

সু—বিষ্ঠাতে পোকা আসে কোথা হইতে? পচাদ্রব্য মাত্রেই ওরূপ পোকা দেখা যায়।

হ—সবই ঐ মাছির কাণ্ড। ইংরেজ রাজত্বে মুন্সিপাল (Municipality কুলি রাখিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কার করায়, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে ও ঐ ব্যবস্থা আছে। এই মাছিগুলি কৃমি পাড়ে এবং সহজে ঐ গলিত শব যাহাতে নষ্ট হইয়া যায় তাহার পথ করিয়া দেয়। (?) আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।

সু আচ্ছা আজ তবে বিদায় হও, কিন্তু কথাটা কি, পোড়া ঘা প্রভৃতির ঔষধ, কিছু বলিলে না।

হ—সে কাল বলিব আজ তবে আসি।

সু—আচ্ছা, এসো তবে, আমি একবার মর্দ্দারধারে বেড়াইয়া আসি।

হ—তবে একটা কথা বলিয়া দেই, রাস্তায় অনেক সময় বড়ই দুর্গন্ধি বোধ হয়। কাপড় দ্বারা নাক বন্ধ করিলেও প্রাণান্ত কর হইয়া উঠে এমতাবস্থায় নাকের একটা ছিদ্রপথ কোনরূপ বন্ধ করিলে (অঙ্গুলি-চাপদ্বারা) অন্যটা খোলা থাকা সত্ত্বেও কোন ও গন্ধ অনুভূত হয় না জানিবেন। সংবাচর এক ছিদ্রেই শ্বাস বাহির হয়, কাজেই যেইটা দিয়া শ্বাস বাহির হয় সেইটাই খোলা রাখা বিধেয় কারণ তাহা হইলে শ্বাস ফেলিতে কোন ও কষ্ট হয় না অথচ দুর্গন্ধের হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সু—আচ্ছা দেখা যাবে, আসি তবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত

রাজাবাড়ী, ঢাকা!

বৈদ্যাবতংস কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ,এল, এম, এস, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ মহাশয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।*

জন্ম ও কুলাদি—

অদ্য আমরা যে কৃতিপুরুষের সংক্ষেপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইনি ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ১৭ই আশ্বিন দিবসে পরম পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম কবিরাজ। বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম মহোদয় কাশীর রাজ বৈদ্য এবং অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া প্রথিত ছিলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তাঁহার নৈপুণ্য এবং যশঃপ্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরি মহাশয়ের পত্নীর চিকিৎসার জন্য মাসিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বেতনে একসময় কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন।

গণনাথ সেনের জ্যেষ্ঠতাত ৺কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদও একজন অত্যুদারপ্রকৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক 'চিদ্ ঘনানন্দস্বামী' নামে পরিচিত হইয়া অবশেষে নিরুদ্দেশ হন। ইহাঁদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলা শ্রীখণ্ডগ্রাম। গণনাথ শ্রীচৈতন্য দেব কর্তৃক পুত্রীকৃত শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের দৌহিত্র বংশীয়।

শিক্ষা--

পঞ্চমবর্ষ বয়সেই মাতৃহারা হইয়া কেবল পিতার স্নেহ যত্নেই লালিত পালিত হন এবং প্রাচীন প্রথানুযায়ী পিতার নিকটেই প্রাথমিক

---

* জীবিতের জীবনী প্রকাশ নানা কারনেই নিরাপদ নহে। আমরা প্রধান প্রধান কবিরাজ মণ্ডলীর জীবনী প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আচার্য্য গঙ্গাধর কবিরাজ প্রভৃতির জীবনী প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছি। "চিত্রময়-জগৎ" "সুধানিধি" প্রভৃতি হিন্দীমাসিক পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত গণণাথ সেন-মহোদয়ের জীব[illegible]ির হইয়াছে, সুতরাং আমরাও তাঁহাদের পন্থানুসরণ ও সেই বিষয় [illegible] অবসর ক্রমে উক্ত মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করি[illegible] প্রকার ত্রুটীবিচ্যুতি ঘটিলে সংশো[illegible]। আঃ বিঃ সং

সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। নবম বর্ষে ইহার যথারীতি উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়। এই বয়সের মধ্যেই ইনি সমগ্র অষ্টাধ্যায়ী (পাণিনি ব্যাকরণ) ও অমর কোষ একবারে কণ্ঠস্থ করেন। ১০ম বর্ষে পদার্পণ করিয়া ইনি প্রথম সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। যখন ইহাঁর একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন ইহাঁকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তী করান হয়। তত্রত্য তদানীন্তন উচ্চশিক্ষা ও সমস্ত বৃত্তি গুলিই ইনি লাভ করেন। দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াই ইনি সুবিজ্ঞ পিতার নিকট অসামান্য পরিশ্রমের সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যখন ইহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ তখন পিতৃদেবও স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বর্গগামী হন। তাহার কয়েক দিন পরেই সেই বৎসর শোক দুঃখের মধ্যেই ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। সেই সময়েই আর এক ঘোর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। পিতা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া শোভাবাজারে যে বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা দেবোত্তর বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় গণনাথ সর্ব্বথা নিরাশ্রয় ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ উপর্য্যুপরি বিপৎপাতেও গণনাথ উচ্চাকাঙ্খায় এবং স্বকর্ত্তব্য পালনে কিছু মাত্র পরাঙ্‌মুখ হন্ নাই, পরন্তু অচল অটল অধ্যবসায়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন্।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইনি ১০ বৎসর বয়সেই সংস্কৃত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যে সমস্ত সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সমুদয় কবিতা সুবিখ্যাত সংস্কৃত "বিদ্যোদয়" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত তন্মধ্যে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা কুসুমাঞ্জলি" চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের অবসর লাভ" এবং অপ্রকাশিত "নিশীথ স্বপ্ন" "মেঘ সন্দেশ" প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। আশা করি, সেই সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের কোন ছাত্র প্রকাশিত করিবেন।

গণনাথের বাল্য কালেই পিতৃমাতৃ বিয়োগ ঘটে, এমন আর কোন অভিভাবক ছিলনা যে কোনরূপ সাহায্য করে। এরূপ সর্ব্বথা অর্থ ও অভিভাবক শূন্য অবস্থায় কেবল নিজ অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভা বলে কলেজের এবং য়ুনিভার্সিটি প্রভৃতির বৃত্তি সকল লাভ করিয়া

বহুকষ্টে নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতেই বিদ্যার উচ্চ মন্দিরে আরোহণ করিয়াছেন।

ইং ১৮৯৪ সনে এণ্ট্রেন্স এবং ১৮৯৬ সনে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ সালে বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু নানা কারণে কলেজে উপস্থিতির সংখ্যা কম (Percentage short) হওয়ায় সে বৎসর পরীক্ষা দিতে পারেন নাই তবে সেই বৎসরই তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তী হন এবং ১৯০৩ সালে মেডিকেল কলেজ হইতে উচ্চ ডাক্তারী উপাধি প্রাপ্ত হন। মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষ হইতেই নানা বৃত্তি। পদক (Medal) এবং উচ্চ প্রশংসা-পত্র (Certificate) পাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে Preliminary M. B. এবং first M. B পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। final M. B. পরীক্ষার সময় কোন কারণে Principal Doctor Bomford এবং Dr Kelly র অসন্তোষ-ভাজন হওয়ায় M. B. উপাধির পরিবর্ত্তে কেবল L. M. S. উপাধিই লাভ করেন। ইহার পরই ইহাঁকে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে বেশ প্রতিপত্তি লাভ হয়। ইতোমধ্যে ১৯০৮ সালে একবন্ধুর অনুরোধ ক্রমে Non Callegiate Student রূপে B. A. পরীক্ষা প্রদানের অধিকার প্রাপ্ত হন সেই একই বৎসরের মধ্যে এপ্রিল মাসে বি, এ এবং নবেম্বর মাসে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। কবিরাজ মহাশয় বাল্য কাল হইতে যেরূপ দুঃখ দুর্দ্দশা ও সহিষ্ণুতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যোন্নতি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়!

কবিরাজ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা পরিসমাপ্তি করেন। গণনাথ ইহারই মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বস্তুতই অদ্ভুত।

গত ১৯১১ সালে প্রয়াগে ভারতের সমস্ত দেশের প্রতিনিধি গণকে লইয়া যে নিখিল ভারতীয় বৈদ্যসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয় উহাতে

কবিরাজ গণনাথ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি সেই সভায় যে বহু গবেষণাপূর্ণ হিন্দীভাষায় রচিত এক অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে (উহা প্রয়াগ "সুধানিধি" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য) উহাতে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরব নিপুণ গবেষণার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।* উক্ত সম্মেলনের শেষদিন নিখিল ভারত বর্ষীয় সমাগত বৈদ্যগণ ইহাকে "বৈদ্যরত্নংস" পদবীতে ভূষিত করেন এবং পরবর্ত্তিবৎসরের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক গণের স্থায়ী সভা "আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের" সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। সেই বৎসর হইতেই প্রয়াগে "আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের" কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে *

নিখিল ভারতীয় বৈদ্যসম্মেলনের অধিবেশন ১৩১২ সালে পুনরায় কানপুরে আহূত হয়। এই সভায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ নামা বৈদ্যবংশ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ বিদ্যাভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা বিঘ্নবশতঃ এই সম্মেলনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহাতে নিখিল ভারতীয় বৈদ্যগণের নিকট হইতে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল তাহার ভাষা এইরূপ "No Conference without you" অর্থাৎ আপনি না আসিলে সম্মেলন নিতান্তই শ্রীহীন হইবে। উক্ত সম্মেলনে সমগ্র ভারত বর্ষে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রণালী স্থির করণের নিমিত্ত একটি বিশাল শিক্ষা-সভা "নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাপীঠ" নামে স্থাপিত হয় এবং কবিরাজ গণনাথই তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমান বর্ষে মথুরা নগরীতে আহূত বৈদ্যসম্মেলনে উক্ত "বিদ্যাপীঠের" প্রধান কার্য্য সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন হইয়াছে। বর্ত্তমান ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলনে কলিকাতায় উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা হইয়াছে।

মথুরানগরীর সম্মেলনে কবিরাজ মহোদয় "প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্র শস্ত্র শীর্ষক যে এক প্রবন্ধ (হিন্দীভাষায় লিখিত) পাঠ করিয়াছেন তাহাতেও ইঁহার [illegible]র পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধে

* ক[illegible]। [illegible]যব কোন ছাত্র উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিলে অনেকেই [illegible]ত হইবেন। সম্পাদক

তিনি প্রচলিত ডাক্তারী যন্ত্রসমূহ লইয়া এক একটি করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত মিশাইয়া দেখাইয়াছেন যে, এতৎ সমুদয়ই আয়ুর্ব্বেদোক্ত। প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণ করিয়া সভাপতি কর্ণেল কার্ত্তিকর মহাশয় কবিরাজ মহোদয়কে সর্ব্ব সমক্ষে "গুরুজী" বলিয়া স্বীকার করেন। বস্তুতঃ বয়সে নবীন হইলেও ইনি যে জ্ঞানবৃদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহার রচিত "প্রত্যক্ষ শারীরম্" "সিদ্ধান্ত নিদানম্" প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থরাজিও তাহার প্রমাণ। "প্রত্যক্ষ শারীর—আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থায় শারীরের (শারীর তত্ত্বের) অভাব দূর করণের জন্য অসাধারণ পরিশ্রমের সহিত যে লিখিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের শারীরে প্রযুক্ত শব্দ সমূহ পারিভাষিক অর্থ স্থির করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট নরদেহতত্ত্ব প্রাচীন আর্য প্রণালীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ গ্রন্থ রচনা করা এবং প্রাচীন শারীরের জীর্ণোদ্ধার করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সুবিজ্ঞন অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। এই মহাগ্রন্থের মাত্র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, উক্ত পুস্তকের ভূমিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ভারতের নানা-স্থান হইতে প্রায় ৩০০ শতেরও অধিক পুস্তক গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপাদেয়তা বিষয়ে ভারতের নানাস্থানের প্রধান প্রধান ভিষকবৃন্দ অতি উচ্চ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই বৎসর মঠ বৈদ্যসম্মেলনের সভাপতি আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম স্বামী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়ও নিজের সংস্কৃত বক্তৃতায় এই গ্রন্থের অসামান্য প্রশংসা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশেও এই গ্রন্থের সমালোচনা বাহির হইয়াছে।

কবিরাজ গণনাথ রোগবিনিশ্চয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিদান নামে যে আর এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন, উহা কতক মুদ্রিত হইয়াছে শীঘ্রই উহা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইবে।

কবিরাজ গণনাথের অসাধারণ অধ্যবসায়, অমায়িক স্বভাব ও কর্ম্ম-পটুতা বস্তুতই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। লোক প্রশংসার জন্য নিজের প্রাধান্য খ্যাপনের প্রবৃত্তি গণনাথের হৃদয়ে কখনও দেখি নাই। সেই জন্য আজ তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের বৈদ্যগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছেন।

বৈদ্যকগ্রন্থ বিবরণী।

১৪। রসমঞ্জরী।

গ্রন্থকারের নাম শালিনাথ, তাঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ। এই গ্রন্থে নিম্ন লিখিত ১০ দশটি অধ্যায় আছে।

১। রস শোধন। ২। রস জারণমারণাদি। ৩। রস শোধন মারণ সত্ত্ব-পাতনাদি। ৪। বিষলক্ষণ ও বিষপরিহারাদি। ৫। সুবর্ণাদি ধাতু শোধন মারণাদি। ৬। রোগের অধিকার অনুযায়ী নানারস ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ। ৭। রসায়ন। ৮। নেত্রাঞ্জন ও কেশরঞ্জন যোগ। ৯। বীর্য্যস্তম্ভ, কৌতূহল (ইন্দ্রজাল) ও বালগ্রহ নিবারণ। ১০। কালজ্ঞান।

১৫। প্রশ্নোত্তর রত্নমালা।

গ্রন্থকারের নাম শৈলনাথ। তাঁহার পিতার নাম একাম্রনাথ অবধান সরস্বতী। ইনি প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের অনুমতি অনুসারে "আয়ুর্ব্বেদসুধানিধি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অত্রিগোত্র-সম্ভূত ব্রাহ্মণ। গ্রন্থকারের মাতামহ ও গুরু কশ্যপগোত্রজ কামেশনাথ ইনি শৈবাচার্য্য ছিলেন।

১৬। কালজ্ঞান।

ইহার রচয়িতা শম্ভুনাথ। গ্রন্থে মৃত্যুবোধক অরিষ্ট লক্ষণ, রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং দোষের সঞ্চার ও প্রকোপ প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭। ভীমবিনোদ।

এই গ্রন্থ দামোদর কৃত। ইহা চিকিৎসা ও উত্তরখণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থ-কার সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা ইহাতে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্মত কর্ম্মবিপাক ও রোগ সমূহের উৎপত্তিকারণ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থে রসটিবত ও উদ্ভিজ্জাত উভয় প্রকার ঔষধ প্রয়োগই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৮। রস চন্দ্রিকা।

ইহা একখানি রসগ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম বৈদ্য শ্রীমাধব কবিচন্দ্র। গ্রন্থকার

গ্রন্থারম্ভে নিজপিতা ও শ্বশুরকে নমস্কার করিয়াছেন। শ্বশুরই তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন।

নানা রসগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক রস চন্দ্রিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মোট ৯ অধ্যায় আছে।

১ম অধ্যায়ে রস শোধন মারণাদি। দ্বিতীয়ে উপরসাদি মারণ ও শোধন। তৃতীয়ে স্বর্ণাদি শোধন মারণ, চতুর্থে জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, অর্শ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও রক্তপিত্ত চিকিৎসা। পঞ্চমে রাজযক্ষা, কাস, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি বমি, মূর্চ্ছা, পানাত্যয়, দাহ, স্বরভেদ, তৃষ্ণা, উন্মাদ, অপস্মার বাতব্যাধি, বাতরক্ত, আমবাত, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, প্রমেহ, স্থৌল্য দৌর্গন্ধ্য, উদর ও প্লীহা চিকিৎসা। ষষ্ঠে শোথ, বৃদ্ধি, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বিদ্রধি, ব্রণ নাড়ীব্রণ, ভগন্দর ও উপদংশ চিকিৎসা। সপ্তমে কুষ্ঠ শীতপিত্ত ও কোঠ চিকিৎসা। অষ্টমে অম্লপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট' মসূরি, ক্ষুদ্ররোগ, মুখরোগ, চক্ষু ও নেত্ররোগ, শিরোরোগ, স্ত্রীরোগ, বালরোগ ও বিষ চিকিৎসা। নবম অধ্যায়ে রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকার।

গ্রন্থশেষে আছে, "ইতি শ্রীসানন্দকবীন্দ্রকৃতায়াং রসচন্দ্রিকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ।" ইহাতে "সানন্দ কবীন্দ্র" গ্রন্থকারের অন্য উপাধি এরূপ বোধহয়।

১৯। ওষধি কল্প।

গ্রন্থে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় নাই। ইহাতে নিম্ন লিখিত কল্প সমূহ প্রকটিত হইয়াছে।

১। জ্যোতিষ্মতী। ২। করঞ্জ। ৩। পুনর্ণবা। ৪। রক্ত পালাশ। ৫। শ্বেত পালাশ। ৬। কৃষ্ণহরিদ্রা। ৭। কটুরোহিণী। ৮। অশ্বগন্ধা। ৯। লক্ষ্মণা। ১০। অঙ্কোল। ১১। ঈশ্বরী। ১২। শাল্মলী। ১৩। কাকজঙ্ঘা। ১৪। ক্ষীরক্ষিপ্রা (?)। ১৫। করঞ্জ। ১৬। নির্গুণ্ডী। ১৭। ইন্দ্রবারুণী। ১৮। ভৃঙ্গরাজ। ১৯। ত্রিফলা। ২০।...(?)। ২১। মুশলী। ২২। মুণ্ডী। ২৩। চিত্রক। ২৪। মণ্ডূক। ২৫। শ্রীফল। ২৬। লাঙ্গলী। ২৭। আমলকী। ২৮। শ্বেতগুঞ্জা। ২৯। মণ্ডূক ও ব্রাহ্মী। ৩০। বৃন্দা। ৩১। সোমরাজী। ৩২। বাকুচী। ৩৩। রুদন্তী। ৩৪। কটুতুম্বি। ৩৫। নিম্বপঞ্চক। ৩৬। তৃণজ্যোতিঃ। ৩৭। শ্বেতার্ক্ক। ৩৮। শুন্ঠি। ৩৯। পাঠা। ৪০।

ভূকদম্ব । ৪১ । গন্ধক । ৪২ । দেবদালী । ৪৩ । এরণ্ড । ৪৪ । ময়ুরশিখা । ৪৫ । ব্রহ্মদন্তী । ৪৬ । মহাদেবী । ৪৭ । শ্বেতাপরাজিতা । ৪৮ । বিজয়া । ৪৯ । নাগদমনী । ৫০ । বজ্রবল্লী । ৫১ । বজ্রদন্তী । ৫২ । অসিকর্ণ । ৫৩ । নীলী । ৫৪ । শৈলোদক । ৫৫ । ইন্দ্রগোপ । ৫৬ । দ্রাবণ । ৫৭ । কেশরঞ্জন । ৫৮ । ধাতুমারণ । ৫৯ । ভস্ম সূতবিধি ।

২০ । ইন্দ্রকোষ বা রাজেন্দ্র কোষ ।

প্রভাকর পুত্র ভট্ট রামচন্দ্র, এই গ্রন্থের প্রণেতা । "গৌড়োর্ব্বীশাবতংস ক্ষিতিপতিতিলক রাজা ইন্দ্র সিংহ" বাহাদুরের আদেশ অনুসারে নিঘণ্টু প্রভৃতি নানা বৈদ্যগ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই কোষ বিরচিত হইয়াছে ।

ইন্দ্রকোষে মোট ৩০ টি পরিচ্ছেদ আছে । পরিচ্ছেদ গুলি, "বর্গ" সংজ্ঞায় বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । নিম্নে অধ্যায় গুলির নাম উল্লেখ করা গেল ।

১ । অনূপাদি । ২ । ভূমি । ৩ । গুড়ূচ্যাদি । ৪ । শতাহ্বাদী । । ৫ পর্পটাদি । ৬ । পিপ্পল্যাদি । ৭ । মূলকাদি । ৮ । শাল্মল্যাদি । ৯ । প্রভদ্রাদি । ১০ । করবীরাদি । ১১ । আম্রাদি । ১২ । চন্দনাদি । ১৩ । রসায়ন বা সুবর্ণাদি । ১৪ । পানীয়াদা । ১৫ । ইক্ষু । ১৬ । মধু । ১৭ । ক্ষীরাদি । ১৮ । মূত্র । ১৯ । তৈল । ২০ । কাঞ্জিক । ২১ । শাল্যাদি । ২২ । কৃতান্ন । ২৩ । রসাদি । ২৪ । প্রমাণ নিরূপণ । ২৫ । মনুষ্যাদি । ২৬ । সিংহাদি । ২৭ । রুজাভিধান । ২৮ । হিতাহিত । ২৯ । একার্থাদি । ৩০ । দিনচর্য্যাদি ।

এই গ্রন্থ হইতে এস্থলে নিম্নে "আম্রস্তুতি" উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;

"ন তাদৃক্ কর্পূরে ন চমৃগমদে নো মলয়জে
ফলে বা পুষ্পে বা ন হি ভবতি তাদৃক্ পরিমলঃ
তথাপ্যেকো দোষস্ত্বয়ি খলু রসালে সততং
পিকে বা কাকে বা গুরুলঘুবিশেষো ন ভবতি ॥
শ্রুত্বা চম্রফলস্তুতিং জলমভূত্তন্নালিকেরান্তরে ॥
প্রায়ঃ কণ্টকটুকিতং তু পনসং চের্ব্বারুকং ভিদ্যতে ।
আস্তেঽধোমুখমেব দাড়িমফলং দ্রাক্ষাফলং ক্ষুদ্রতাং
শ্যামত্বং সমুপৈতি জম্বুবমসৌ মাৎসর্য্য রোষাদিতঃ ॥"

ক্রমশঃ

২ নং বলথানাষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ
কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি

দেশীয় পথ্য ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাতজ পিত্তজ কফজ এবং সান্নিপাতজ জ্বরের পৃথক পৃথক সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় (তরুণ, মধ্য ও জীর্ণাবস্থায়) বিলেপী, মণ্ড, যূষ ও কতিপয় তর্পণ-যোগ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সাতদিন, দশদিন, বারদিন পর বাতজ, পিত্তজ ও কফজ জ্বরের অন্নকাল উপস্থিত হয়। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে রোগীর অন্নকাল উপস্থিত হইতে এতদপেক্ষা অধিক সময় আবশ্যক হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে কোন কোন জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি ২। ৪ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া ভাত খাওয়ার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। সুতরাং জ্বরিত ব্যক্তির ভাত খাওয়া সম্বন্ধে দিনের সংখ্যাগত কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করা হয় না। যে সময়ে জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম; মলমূত্রাদির সম্যক নিঃসরণ, গাত্রের লঘুতা, উদ্গারাদিতে কোন প্রকারের দুর্গন্ধাদির অনুভূতি না হওয়া, হৃদয়ের লঘুতা, কণ্ঠের কফলিপ্ততাদি তিরোহিত হয়, মুখের বিরসত্ব দূর হইয়া যায় এবং অল্প অল্প স্বেদনির্গম হইতে থাকে; এমতাবস্থায় যথারীতি ক্ষুৎপিপাসার উদয় হইলেই রোগী অন্নপথ্যের উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চরক বলেন—

ক্ষুৎসম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষুচ।
কালে বা যদি বাঽকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥
আমপাকং গতে নৃণাং যথা ভোজনলালসা।
ভবেৎ কালেঽকালেবা সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥

পূর্ব্ব কথিত সাত, দশ, দ্বাদশ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, জ্বরিত ব্যক্তির অপক্ক রসের পরিপাক, জ্বরারম্ভক দোষের লাঘব হইয়া জ্বরের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হইলে এবং যথারীতি ক্ষুৎপিপাসার উদয় হইলেই অন্নপথ্যের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ, নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইলেও যে পর্য্যন্ত আমরসের পরিপাক এবং জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত অন্নপথ্য বিহিত নহে।

সাধারণতঃ জ্বরিত কিংবা জ্বরমুক্ত ব্যক্তি অপরাহ্ণ অর্থাৎ দুই প্রহর

পুরাতন ধান্যের অচিরকালোৎপন্ন তণ্ডুলই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

জ্বরিত বা জ্বরমুক্ত ব্যক্তির ব্যবহারোপযোগী তণ্ডুল নির্ব্বাচন উপলক্ষে মূল লক্ষ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া অনেক জল্পনা কল্পনার অবতারণা করা হইল, এবিষয়ে পাঠকগণের বিরক্তির কারণ না হইলে তৃপ্তিবোধ করিব।

অন্ন প্রস্তুত সম্বন্ধে সুস্থ কিংবা অসুস্থ সকলের অন্নই এক প্রাণালীতে প্রস্তুত করা হয়। তবে রুগ্ন ব্যক্তির অন্ন প্রস্তুত করিতে শীঘ্রপাকিতার অনুরোধে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। চাউলগুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কিছু সময় রাখিয়া দিলেই অপেক্ষাকৃত স্ফীত হয়। সেই তণ্ডুল পাঁচ গুণ জলে জ্বাল দিবে। যখন ভাত বেশ মোলায়েম হইবে অর্থাৎ ভাতের উপর অঙ্গুলীর চাপে কিছুমাত্র কাঠিন্যের অনুমান না হইবে, সেই সময়ে তাহার মাড় পরিত্যাগ করিয়া ফেলিলেই বেশ ভাত প্রস্তুত হইল। মাড় পরিত্যাগ না করিলে তাহা কফবর্দ্ধক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য ও অপেক্ষাকৃত রুচিকারক হয়। যথা—

সুধৌতান্ তণ্ডুলান্ স্ফীতান্ তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তপ্তক্তং প্রস্তুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।
অধৌতমশ্রুতং গুরু রোচ্যং শীতং কফপ্রদম্॥

সুধৌত তণ্ডুলের অন্ন আগ্নেয়, পথ্য, তৃপ্তিকারক, রুচিকারক ও লঘুপাক। অধৌত তণ্ডুলোৎপন্ন ভাতের মাড় পরিত্যাগ না করিলে তাহা অত্যন্ত গুরুপাক শীতবীর্য্য ও কফবর্দ্ধক হয়। এরূপ অন্ন জ্বরমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কদাচ্য ব্যবহার্য্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন স্থলে জ্বরমুক্ত ব্যক্তির ভাতের পরিবর্ত্তে রুটি প্রাথমিক পথ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাত ব্যবহার সম্বন্ধে শারীরিক কিংবা প্রকৃতিগত কোন বিশেষ অন্তরায় না থাকিলে জ্বরমুক্ত ব্যক্তির প্রাথমিক পথ্য রুটি অপেক্ষা অন্নই সমধিক উপযোগী। কেননা রুটি ভাত অপেক্ষা গুরুপাক কফবর্দ্ধক। কফবর্দ্ধক গুরুপাক পদার্থ রুগ্ন ব্যক্তির সর্ব্বথা পরি ত্যজ্য। যথা—

রোটিকা বলকৃদ্রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী।

বাতঘ্নী কফকৃদ্ গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি প্রাথমিক পথ্য গ্রহণ কালে জ্বরোৎপাদন কারী দোষোপশমক দ্রব্যাদি দ্বারা দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখন করিবেন। অর্থাৎ বাত-জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি অম্ল ও লবণরস, পিত্তজ্বরী মধুর তিক্তরস, কফজ্বরী কটু কষাররস বিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখন করিবেন। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধাদি তিরোহিত হইয়া অন্নে রুচি হয়। যথা—

ভৃষ্ট জীরকচূর্ণেন সিন্ধুজন্মযুতেনচ।
জিহ্বাদন্তান্ মুখস্যান্ত ঘৃষ্ট্বা কবলমাচরেৎ ॥
মুখমলং বিগন্ধত্বং বিরসত্বঞ্চ নশ্যতি।
মনঃ প্রসন্নং ভবতি ভোজনেঽভিরুচির্ভবেৎ ॥

ভাজা জীরার চূর্ণ ও সৈন্ধব একত্র মিলিত করিয়া দন্তমর্দ্দন ও জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখের মল বিদূরিত হয় ও মুখের দুর্গন্ধি, মুখের বিরসত্ব নষ্ট হইয়া মন প্রফুল্ল ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।
ধাত্রী দ্রাক্ষা সিতানাং বা কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ ॥

অরুচি দূর করিবার জন্য লেবুর কেশর ঘৃত ও সৈন্ধব যোগে মুখে ধারণ ও জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। কিস্‌মিস্ আমলকী ও চিনি একত্র মর্দ্দন করিয়া মুখে ধারণ ও জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে অরুচি নষ্ট হয়।

• জ্বরিত কিংবা জ্বরমুক্ত ব্যক্তির যূষার্থে মুগ, মসূর, বুট, কুলথকলাই ও বনমুগ প্রভৃতি ডাইল প্রশস্ত। বিশেষতঃ জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে মুগ ও মসূরের যূষের প্রতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

ক্ষীরাভাবেতু যূষঃ স্যাৎ মুদ্গমসূরয়োরের।

জ্বরিত ব্যক্তির শাকার্থে পটোলপাতা, বেগুন, পটোল করলা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কাকরোল, গোজিয়াশাক কচিমূলা ও গুড়ুচি প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্র দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিনিয়ত এক রস বিশিষ্ট দ্রব্যাদি সেবনের দ্বারা স্বভাবতঃ অরুচি জন্মিবার সম্ভাবনা। সেই অরুচি নিবারণার্থে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ডাইল তরকারী মাংসাদি দ্বারা সূদ শাস্ত্রানুযায়ী (পাকপ্রণালী বিধিতে) বিবিধ প্রকারের মশলা সংযোগে

ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া দিবেন। কিন্তু সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সংস্কার ভেদে পথ্যাদি গুরুত্বে পরিণত না হয়। যথা—

সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎপুনঃ॥

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদ-বাণী।

—"চতুষ্পাঠীর কথায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কথা মনে পড়িতেছে। ইদানীং মফঃস্বলে প্রতিভাশালী যশস্বী বৈদ্যের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কবিরাজী চিকিৎসায় মফঃস্বলবাসীর রুচিমতি বদলাইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক মফঃস্বলের কবিরাজ "জীবিকার বিপাকে" পড়িয়া,' কস্তূরী ভৈরবের" বাক্সে 'কুইনাইনের গুলি' রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ যাঁহারা পল্লীগ্রামের কবিরাজগণের ব্যবসায়ের অবস্থা ইদানীং প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাদিগের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, পল্লীগ্রামের বৈদ্যসম্প্রদায় ব্যবসায়ভ্রষ্ট সম্ভ্রমভ্রষ্ট হইয়া, দীনদশায় দিন কাটাইতেছেন। পূর্ব্বকালে, প্রত্যেক পল্লীজমিদারের "দ্বারবৈদ্য" ছিলেন। জমিদারগণের অর্থসাহায্যে তাঁহারা উৎকৃষ্ট ঔষধ, অকৃত্রিম তৈল ঘৃত অরিষ্টাদি যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। অধুনা পল্লীজমীদার-গণ কবিরাজ ছাড়িয়া ডাক্তার ধরিয়াছেন। ফলে অর্থদায়ে বৈদ্যগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা উপযুক্ত মূলধনের অভাবে যথাশাস্ত্র ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। বৈদ্যকুল ব্যবসায়ভ্রষ্ট হইলে, ভারতের এক অত্যাবশ্যক ও অতীতগৌরবের সামগ্রী আমরা হারাইব। সুরমা উপত্যকায় একটী 'বৈদ্যসঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না কি? এই অঞ্চলের অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী মনস্বিগণ যদি এই অত্যাবশ্যক বিষয়টির দিকে কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করেন, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের একটা পুরাতন 'বাণীভাণ্ডার' রক্ষা পাইতে পারে। ভারতের পুরাতন চিকিৎসাশাস্ত্র কতদূর

মূল্যবান, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের "রসায়ন" সম্পর্কিত মূল্যবান্ গ্রন্থগুলিই উহার প্রমাণ। কলিকাতার বৈদ্যকুল অদ্যাপি "স্বশক্তি"তে আত্মরক্ষা করিতেছেন। আমরা পল্লীগ্রামের বৈদ্যগণের দুরবস্থার কথাই আলোচনা করিতেছি। ঢাকা সাভারের গুরুচরণ কবিরাজ, ময়মনসিংহ আচমিতার মদন কবিরাজ, শ্রীহট্ট-তরপের গৌরচন্দ্রকবিরাজ-প্রভৃতির মত পল্লীবৈদ্য অধুনা আর দেখা যায় কি? সমাজের এই অভাবের দিকে শিক্ষিত সম্প্রায় কি লক্ষ্য করিবেন না?"

"সুরমা"

বিবিধ।

ধূম ও মেঘ।—"ভারতবর্ষের ত্রিকালদর্শী ঋষির ব্যবস্থিত অনেক অনুষ্ঠানই আধুনিক অসম্পূর্ণ জড়বিজ্ঞান ভ্রান্তবুদ্ধি মানবেরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। রাজ্যে বহুদিন অনাবৃষ্টি হইলে পুরাকালে এদেশে ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত;—রামায়ণে এবং আরও বহু বহু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। এই যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রদেব প্রসন্ন হইয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করিতেন; ফলে শস্যহীনা বসুন্ধরা শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইত। ইহা অলীক কল্পনা নহে,—সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা কথাটা উড়াইয়া দিতে পারো,—কিন্তু ঐ শুন,—কলিকাতা সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজের ফাদার ফ্রানকোট কি বলিতেছেন!—তিনি বলিতেছেন,—কলিকাতা অঞ্চলে গত কয়েকদিন যে আকাশভরা মেঘ দেখা দিয়াছিল,—বৃষ্টিপাত হইয়াছিল,—এই মেঘোৎপত্তি ইউরোপ ভূখণ্ডে—ফ্রান্স রাজ্যের রণাঙ্গণে যে শত সহস্র কামাণ বর্ষণ হইতেছে,—তাহার ফল না হউক—কেননা ফ্রান্স ভারতবর্ষ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত,—কিন্তু ধূমে আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সে একবার বিশ সহস্র লোক যুগপৎ গুলিবর্ষণ করিয়াছিল, ফলে অচিরে বায়ুবিচলিত নভোমণ্ডল মেঘপূরিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি পাত হইতে থাকিল; ইহা ব্যতীত আমেরিকায় লোকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিলাভের আশায় দূরদূরান্তরব্যাপী ঘনজঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিয়া থাকে;—ইহার

ফলে শুষ্কবৃষ্টিপাত ঘটে। যোগোজ্জ্বল-মানস আর্য্য ঋষিগণ—কঠোর তপস্যাবলে যে ভূতবিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—পশ্চাত্য বিজ্ঞানস্পর্দ্ধী বিদ্বানেরা এখনও তাহার প্রান্তদেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়েন নাই,—সমর্থ হইবার শক্তি বা অধিকারও তাঁহাদের নাই। হা ভগবান্! আমাদের আহাম্মক ঘরের ছেলেরা কতদিনে আবার তথাকথিত পরের বিদ্যা ছাড়িয়া, ঘরের বিদ্যার যত্ন করিতে শিখিবে?" বঙ্গবাসী

♣ ♣ ♣

যক্ষ্মারোগের রৌদ্রচিকিৎসা—ডাক্তারেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতে জ্ঞাত আছেন যে, সূর্য্যের কিরণের আশ্চর্য্য রোগাপনয়নের ক্ষমতা আছে। পরীক্ষা দ্বারা সম্প্রতি প্রকাশ পাইতেছে যে, যক্ষ্মারোগের ও অস্থি ও গ্রন্থির ক্ষয়রোগে এবং গ্রন্থিবাতরোগে ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ চিকিৎসা প্রণালী, কেবল দেহ নগ্ন করিয়া সূর্য্য কিরণে রাখা। বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক ডাক্তার আরমাণ্ড ডেলিলি বলেন যে এইরূপ চিকিৎসার ফল এরূপ বিস্ময়কর যে কখন কখন দৈবক্রিয়া বলিয়া ভ্রম হয়। ইউরোপের অন্যান্য অনেক ডাক্তার পরীক্ষা দ্বারা ইহার অদ্ভুত ফল দেখিয়াছেন।

♣ ♣ ♣

জর্ম্মণির অধ্যাপক ফ্রাডেনথ্যাল বেরিম্ খড় হইতে এক রকম নূতন খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। জর্ম্মণীর খবরের কাগজগুলি বলিতেছেন যে এই আবিষ্কারে প্রকৃতি পুঞ্জের খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে এক বিপ্লব আনয়ন করিবে।

♣ ♣ ♣

পৃথিবীর হাস্পাতাল সমূহে যত রোগীর মৃত্যু হয়, তাহাদের মৃত দেহ পরীক্ষান্তে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, চিকিৎসকগণ তাহাদের ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের রোগ আদৌ নির্ণয় করিতে পারেন না। মানুষের জ্ঞানের বড়াই ত এই।

ফরাসী ডাক্তারগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কর্ণরোগ পুরুষের যত বেশী, স্ত্রীলোকের তত নয়। প্রৌঢ়দের ৭ জনের মধ্যে ২ জন এক কাণে কম শুনিতে পায়। ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক হাজার বালক বালিকার মধ্যে শতকরা ৪ জনের কর্ণরোগ দেখা যায়, ৬ জন কানে কম শোনে। জন্ম হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তাহার পর এই রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়া আইসে।